আলোচনা-প্রসঙ্গে

চতুর্থ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

চতুর্থ খণ্ড

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG.

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

নিবেদন

'আলোচনা-প্রসঙ্গে' চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হ'তে চলল। এই খণ্ডে ১৯৪২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই চার মাসের অনেকগুলি দিনের কথোপকথন সঙ্কলিত হয়েছে। লেখাগুলি প্রেসে দেবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আদ্যোপান্ত শুনিয়ে দিয়েছি। এই পুস্তকের মূল প্রশ্নগুলির মধ্যে কোন বিন্যাস বা বিষয়-বস্তুর ধারাবাহিকতা নেই, কারণ, একই বৈঠকে বিভিন্ন ব্যক্তি স্ব-স্ব প্রয়োজনমত বহুবিচিত্র জীবন ও জগতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও সমস্যার অবতারণা করেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও সেগুলির সমাধান দিয়ে গেছেন—তাঁর অনন্যসাধারণ অভিনব ভঙ্গীতে। বাস্তবে যেমন-যেমন হয়েছে, আমরাও সেই ভাবে পরিবেষণ করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের ধারণা—বিষয় হিসাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতে গেলে, এই সংকলনের ঐতিহাসিক মূল্য খর্ব্ব হবে এবং এর জীবন্ত বাস্তবতা ব্যাহত হবে। তবে পরমসুন্দরের সদা-সক্রিয়, সমাহারী প্রজ্ঞাবেদীমূলে জগতের বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো ও তাল-বেতাল যা'-কিছু কেমন ক'রে ঐক্য-সুন্দর সুসঙ্গীতির মধুর রাগিণীতে উত্তরণ লাভ করে, সেইটেই দেখবার, সেইটেই বুঝবার, সেইটেই উপভোগ করবার।

আর-একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলবার আছে। অনেক জায়গায় একটা কথার জবাব দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথার অবতারণা করেছেন। আদত কথা হ'লো, মানুষের সমস্যাগুলি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাই একটা বিষয় পরিষ্কার করতে গিয়ে স্বভাবতঃই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি এসে পড়েছে। তা' ছাড়া প্রশ্নটিই বড় কথা নয়, প্রশ্নের পিছনে আছেন প্রশ্নকর্ত্তা মানুষটি। প্রত্যেকটি মানুষের একটা চিন্তা-জগৎ আছে, ভাবভূমি আছে, আছে জটিল মানস গ্রন্থি-নিচয়। সেইগুলি অনুধাবন ক'রে তিনি যখন যাকে যে অবস্থায় যা'-যা' বলা সমীচীন মনে করেন, তাই বলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে উঠে আসবার পর অনেককেই বলতে শুনেছি—'ঠাকুর অন্তর্য্যামী, আমার যা' জিজ্ঞাস্য ছিল, তার জবাব পেয়ে গেছি অমুকের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন তার ভিতর দিয়ে।' আবার অনেকের মুখে শুনেছি—'ঠাকুরের কাছে কোন জিনিস লুকোন চলে না, আমার মনে এই বিষয়ে একটা সংশয় ছিল, কিন্তু ঠাকুরের কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করছিলাম, অন্যভাবে কথাটা পাড়লাম, কিন্তু ঠাকুর আমার মনের কথা আঁচ ক'রে সমাধান দিয়ে দিয়েছেন।' তাই তাঁর এই আলোচনাগুলি নিছক অনপেক্ষ তত্ত্বালোচনামাত্র নয়কো, তার মধ্যে আছে স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশের অন্বয়ী, মনোবিজ্ঞানসম্মত বোধায়নী বিন্যাস ও উপস্থাপন। অথচ সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে একটি শাশ্বত, সাত্বত, বিশ্বজনীন

সমাধানের সুর, যা অপরোক্ষ অনুভূতির অনুরণনে ভরপুর। তাই তা' সকলের মনকেই গভীরভাবে নাড়া দেয়।

বৈশিষ্ট্যপালী, পরমপূরক, পুরুষশ্রেষ্ঠ তিনি—অযাচিত দয়ার ভাণ্ডার খুলে প্রতিনিয়ত বিলিয়ে চলেছেন বাঁচার অমৃত—প্রতিটি সত্তার ধারণ, পালন, পোষণ ও সম্বর্দ্ধনার জন্য যা'-কিছু প্রয়োজন—সবই। পরমপিতা তিনি, সবার পিতা তিনি। দুটি চোখে নিয়ত দেখছি তাঁর প্রাণান্ত পণ, অপরাজেয় প্রেম-লীলা। মানুষ মানুষের মঙ্গলের জন্য এত কষ্ট সইতে পারে, মানুষের এত অত্যাচার, অবিচার, নৃশংসতা ও কৃতঘ্নতার হলাহল অম্লানবদনে পান ক'রে অপরিসীম মমতায় এমন ক'রে মানুষকে অতন্দ্র নৈরন্তর্য্যে স্নেহপ্রীতির অমৃতধারা বিলাতে পারে—চাক্ষুষ না দেখলে তা' কোনদিন বিশ্বাস করতে পারতাম না।

এহেন মানুষের কথিত কথা কিছু-কিছু পরিবেষণ করতে পারছি লোক-সমাজে, সেজন্য ধন্য মনে করি নিজেকে। কারণ, তিনি এবং তাঁর যা'-কিছুই মঙ্গল-স্বরূপ। কিন্তু তাঁকে পরিবেষণ করব, সে সাধ্য তো আমার নাই। তাই প্রাণ আমার ব্যথায় কেঁদে মরে—এই বাণীর বক্তা যিনি, বিশ্বের পরম বেদ্য যিনি, সেই মহান মানুষটিকে আদৌ পরিবেষণ করতে পারিনি ব'লে। তাঁর এবং সবার কাছেই আমার অক্ষমতা ও ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

এই পুস্তকের যথাসম্ভব নির্ভুল প্রকাশনার ব্যাপারে অগ্রজোপম যতি-ঋত্বিক্ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র হালদার স্বেচ্ছায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। পূজনীয় বড়দা ও কেষ্টদার সাহায্য, প্রেরণা ও নির্দ্দেশ এই প্রকাশনাকে সম্ভব ক'রে তুলেছে। এই অবসরে তাঁদিগকে ও সহযোগী প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর), ৫ই আশ্বিন, ১৩৬৬ — শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলোচনা-প্রসঙ্গে চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো। বইখানি প্রেসে যাবার পূর্ব্বে দেখে দিয়েছিলাম। শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রুফ দেখে দিয়েছেন। শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সূচী প্রণয়ন করেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। দয়ালের চরণে প্রার্থনা—তাঁর কথা সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

সৎসঙ্গ, দেওঘর
বৃহস্পতিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৩
১৯।২।১৯৮৭

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২২শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৯ (ইং ৭।৯।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাঁধের ধারে একখানি তক্তপোষের উপর একাকী গম্ভীরভাবে ব'সে আছেন। উন্মুক্ত আকাশের তলে, খালি গায়ে ব'সে আছেন। কী যেন ভাবছেন। সামনে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। দূর থেকে কুষ্ঠিয়া মোহিনী মিলের চোঙটা আবছা দেখা যাচ্ছে। বিরাটের পটভূমিকায় তাঁকেও দেখাচ্ছে অনন্যসাধারণ। তিনি যেন সব-কিছুর মধ্যে থেকেও তার ঊর্দ্ধে, সবার ধরা-ছোঁয়া ও নাগালের বাইরে। এই ভঙ্গিমায় তিনি যখন ব'সে থাকেন, তখন কাছে না ডাকলে এগোতে সাহস হয় না। তাই অনেকেই দূরে অপেক্ষা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এমন সময় বললেন—'শরৎ-দা! এদিকে আসেন।'

শরৎদা ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলেন। দুই-একজন ছাড়া আর সবাই দূরে স'রে গেলেন।

শরৎদা (হালদার) কাছে যেয়ে মাটিতে বসলেন। বসার পর কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কথা উঠলো।

টাকার অভাবে খুলনার সৎসঙ্গ-ভবন উঠে গেছে, সেই সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতো লোক থাকা সত্ত্বেও যে বাড়ীটা উঠে গেল, এটা একটা disqualification (দোষ)। মানুষের জন্য যতই কর না কেন, যত সময় তাদের মধ্যে দেওয়ার একটা auto-initiative urge (স্বতঃ-স্বেচ্ছ আগ্রহ) গজিয়ে দিতে না পারছো, তাদের কাছ থেকে না নিচ্ছ, তারা না দিচ্ছে, ততসময় কিছুই হয়নি। তাদের pauperism (দারিদ্র্য-ব্যাধি) যায়নি। Pauperism (দারিদ্র্য-ব্যাধি) তাড়ানর একমাত্র পথ—তাদের দিয়ে দেওয়ানো, তাদের থেকে ইষ্টার্থে নেওয়া। ভিক্ষা ক'রে খায়, তবুও দিতে চায়, এমন হ'লে বুঝবে pauperism (দারিদ্র্য-ব্যাধি) ঘুচেছে। ঋত্বিক্‌রা যদি ইষ্টার্থে অর্জ্জনপটু হয়, তাতে সবারই মঙ্গল।

শরৎদা—অর্জ্জনপটুতা বাড়ে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জন্য যত করা যায়, মানুষকে যত আপন মনে করা যায়, ততই তাদের কাছে চাইতে আর সঙ্কোচবোধ থাকে না। নিজের ভিতর কার্পণ্যদোষ বা স্বার্থবুদ্ধি থাকলে মানুষ সহজভাবে মানুষের কাছে চাইতে পারে না।

শরৎদা—এমন মানুষও তো দেখা যায়, যাদের ভিতর কার্পণ্যদোষ ও স্বার্থবুদ্ধি দুই-ই আছে, অথচ তারা মানুষের কাছ থেকে বেশ আহরণ করতে পারে, আবার অনেকে এমন আছে যে, মানুষকে সেবা দেয় কিন্তু ইষ্ট-প্রয়োজনেও তাদের কাছে চাইতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা কৃপণ ও স্বার্থপর তারা কখনও লোক উপায় করতে পারে না, আর, যারা লোক আহরণ করতে পারে না, লোকের অর্থ তারা আহরণ করবে ক'দিন? ধীরে-ধীরে মানুষ হাত গোটাতে থাকে। Divine economy (ভাগবত অর্থনীতি) ব'লে একটা জিনিস আছে। যে দিতে চায় না, করতে চায় না, পেতে চায়, তার পাওয়া ধীরে-ধীরে বন্ধ হ'য়ে আসে। আবার মানুষের জন্য করে অথচ চাইতে পারে না, তার কারণ অষ্টপাশ। ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ আর খলতা বা ক্রূরতা এগুলিকেই বলে অষ্টপাশ। অষ্টপাশ মানুষকে সহজ হ'তে দেয় না, তার স্বাভাবিক চলনাকে নিরুদ্ধ ক'রে রাখে। নিজেদের প্রাণ খোলা নয়, তাই মানুষেরও প্রাণ খুলতে পারে না। আড়ষ্ট রকমে চলে। ওগুলিও চারিত্রিক গলদেরই পরিচয় দেয়। ওগুলি তাড়াতে না পারা মানে দুর্ব্বলতা। অমনতর দুর্ব্বলতা পুষে রাখলে সেবাও ঠিকমত দেওয়া হয় না, কারণ, সেবার প্রধান জিনিস হ'লো মানুষের মনকে চাঙ্গা করা। ভিতরবুঁদে যারা, মনখোলা নয় যারা, তারা মানুষকে স্ফূর্ত্তি দেবে কিভাবে? তাই তাদের সেবাও হয় না। আবার, অষ্টপাশের দরুন চাইতেও পারে না এমনভাবে যা'তে মানুষ উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। তাই অষ্টপাশ তাড়ানই লাগে।

শরৎদা—সামাজিক জীবনে আত্মমর্য্যাদা নিয়ে চলতে গেলে তো লজ্জা, মান কিছু-কিছু থাকাই ভাল। বহু দুশ্চরিত্র লোক দেখা যায়, যারা লজ্জা, মানের ধার ধারে না। তাদের লজ্জা, মানের বোধ থাকলে তারা বরং কিছুটা ভাল থাকতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অষ্টপাশ তাড়ান মানে তো আত্মমর্য্যাদাহীন হওয়া নয়। আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন হওয়া মানেই হ'চ্ছে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, পিতৃ-পুরুষের গৌরববোধ নিজের ভিতর জাগ্রত রাখা, তাদের গরিমা ক্ষুণ্ণ হয়—এমনতর কাজ করতে লজ্জা, ঘৃণা ও অপমান বোধ করা, এগুলি হ'লো মানুষের good instincts (সুসংস্কার)-এর লক্ষণ। অষ্টপাশ তাড়ান মানে এগুলি তাড়ান নয়। তাহ'লে আপনি দাঁড়াবেন কিসের উপর? কিন্তু আপনি এম-এ পাশ করেছেন ব'লে যদি একজন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে লজ্জা বোধ করেন, সেটা কিন্তু আপনার আত্মমর্য্যাদা বা বংশমর্য্যাদার দ্যোতক নয়। বরং দেবদ্বিজে ভক্তি, যেটা কিনা আপনার পরিবারের বৈশিষ্ট্য, তা' থেকে deviated (ব্যতিক্রান্ত) হ'লেন আপনি। মানুষের সেবা করতে সর্ব্বাগ্রে নিজের চরিত্র

গঠন করা দরকার। একটা তরতরে ইষ্টপ্রাণ সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মঠ কৃতী জীবনের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরার চাইতে বড় সেবা হয় না। একেই কয় ধার্ম্মিক চলন। এই ধার্ম্মিক চলন যেখানে, পরিবেশও সেখানে ধর্ম্ম সেজে ওঠে। অবশ্য আগাছা সবসময় সাফ করার তালে থাকাই লাগে।

শরৎদা—আগাছা সাফ করা বলতে কী বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎ যেখানেই মাথা তোলা দেয়, অসৎ সেখানেই তাকে নিকেশ ক'রে দিতে চায়। অসৎ যা'তে সৎকে পরাভূত করতে না পারে, সেজন্য হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ করা লাগে, না হয় তাকে হতবল করা লাগে। রোগের বল যদি বাড়তে দেন, জীবনের বলকে তা' ক্ষুণ্ণ করবেই। তাই খারাপের সমর্থন কিছুতেই করতে নেই। খারাপকে অঙ্কুরেই নিকেশ না করলে পরে তা' হাতের বাইরে চ'লে যায়। খারাপ মানে খারাপ প্রবৃত্তি-পরায়ণতা। নিজের খারাপ-টাকেও রেহাই দেবেন না, অন্যের খারাপকেও না। এই খবরদারী যদি না করেন, হুঁশিয়ার যদি না থাকেন, অতর্কিতে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হ'তে হবে। সৎ-এর পোষণ যেমন সক্রিয়ভাবে করতে হবে, অসৎ-এর নিরসনও তেমনি বাস্তবে করতে হবে অস্খলিতভাবে। এই দুটোর কোন একটার প্রতি উদাসীন যদি থাকেন, এবং তার প্রস্তুতি যদি শিথিল হয়, তবে তার খেসারত দিতেই হবে। ধরেন, কয়েক বৎসর পরে যুদ্ধ হয়তো থেমে যাবে, কিন্তু যুদ্ধ নেই ব'লে আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি যদি আমাদের দেশে তখন না থাকে, তাহ'লে যে-কোন মুহূর্ত্তে আমরা বিপদে প'ড়ে যেতে পারি। তবে, আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি যেমন থাকা চাই, অন্য দেশ যা'তে আমাদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন হয়, তার ব্যবস্থাও বাস্তবে করা চাই। বাঁচা-বাড়া যা'তে ব্যাহত না হয়, তার জন্য সবরকম আয়ুধই শাণিত ক'রে রাখা লাগে।

প্রফুল্ল—আপনার একটা ছড়া আছে—

এমন তাপের করবি সৃজন
অত্যাচারের হয় নিকেশ,
অনুতপ্ত অত্যাচারীর
রয় না যা'তে পাপের লেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথা ঠিকই আছে। পাপী যারা, তাদেরও কল্যাণ করা যায় না, যদি পাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান না যায়। তাই পরাক্রমে শুধু আত্মরক্ষা হয় না, পরিবেশও পরিশুদ্ধ হয়। আর, এটা করা চাই সময়মত। প্রত্যেক ব্যাপারেই যখন যেটা করবার, তখন যদি সেটা না করা যায়, তবে পরে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। আমি এই যে সব কাজের কথা আপনাদের বলছি, সেগুলি তড়িৎঘড়িত এখনই যদি না করেন, তবে সময় ফসকে গেলে এর দশগুণ করলেও বিপর্য্যয় এড়াতে পারবেন না। এখানকার জন্য লোক খুব

তাড়াতাড়ি আনেন। আর স্বস্তি-সেবকের কথা যা' বলেছি তা' কয়েক লাখ জোগাড় ক'রে ফেলেন। সেবার বান ডাকিয়ে দেন। একটা মানুষও যেন খাটো হ'য়ে না থাকে কোন দিক দিয়ে—কি অন্তরে, কি বাইরে। সবাইকে টেনে লম্বা ক'রে দেন। আপনারা এমনভাবে প্রস্তুত হন যে, দেশে যদি কোন কারণে গভর্ণমেণ্ট কিছুদিনের জন্য অচল বা বিকল হ'য়ে পড়ে, তাহ'লেও একটা লোকের গায়ে কাঁটার আচড় লাগতে না পারে। চারিদিকে যেমন অরাজকতা সুরু হয়েছে, আপনারা যদি equipped (তৈরী) না হন, তবে লোকের দুর্গতির সীমা থাকবে না।

গাইয়ে, বক্তা ইত্যাদি কর্ম্মী অনেক জোগাড় ক'রে ফেলেন। দীক্ষার সংখ্যা খুব বাড়িয়ে দেন। আর, প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ ৫০০ বিঘা ক'রে জমি সংগ্রহ করেন। খুব পাকা conviction (প্রত্যয়)-ওয়ালা লোকের দরকার।

প্যারীদা (নন্দী) একটা কাঁচের গ্লাসে ক'রে ডাবের জল নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে?

প্যারীদা—এই ডাবের জলটুকু খান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন খাব?

প্যারীদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তুমি যদি বল, তাহ'লে খাই,—এই ব'লে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিয়ে ডাবের জলটুকু খেলেন। খেয়ে মুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে মুখটা মুছে ফেললেন।

তারপর শরৎদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের দেশে খুব নারকেল হয়, তাই না?

শরৎদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, এখানকার মাটি যদি একটু তৈরী ক'রে নেওয়া যায়, এখানেও নারকেল হ'তে পারে। নারকেল ফলানর জন্য soil-এর (মাটির) যে-যে property (উপাদান) দরকার, সেটা বুঝে নিয়ে সেইভাবে যদি soil (মাটি)-কে nurture (পোষণ) দেওয়া যায়, তাহ'লে না হওয়ার কোন কারণ নেই। বিজ্ঞানের দৌলতে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেয়েছি, তা' যদি কাজে লাগান যায়, তা'তে অনেক অভাব, দুঃখ মোচন হ'তে পারে। দুঃখের বিষয়, আমাদের জাতের মধ্যে scientific inquisitiveness (বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা)-ই খুলেছে না। আমাদের university (বিশ্ববিদ্যালয়) চাকর পয়দা করতেই পটু, কিন্তু লোককে স্বাধীনভাবে করিৎকর্ম্মা ক'রে তুলতে পারে না।

শরৎদা—এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোলনলচে বদলে দেওয়া লাগে।

শরৎদা বরিশালের উৎসবে যাবেন, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসবই করেন, আর যাই করেন, তার ভিতর-দিয়ে fundamental work (মূল কাজ)-এর push (প্রেরণা) দেওয়া চাই। ৩০০ টাকার ব্যাপার খতম হয়েছে ব'লে মনে করবেন না। ওটা চালিয়ে যাওয়া চাই। লোকজন এনে বসাতে গেলে তার পিছনে অগুণতি খরচ আছে।............... আর, আপনারা তো নানান জায়গায় ঘোরেন-ফেরেন, ভেল্কু ও কল্পনার জন্য যদি দুটো ভাল ছেলে জোগাড় ক'রে দেন, তাহ'লে আমি একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও বলি—ভাল-ভাল বামুন, কায়েত ও বৈদ্য-পরিবারে দীক্ষিতের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে ফেলেন। অভিজাত পরিবারে initiate (দীক্ষিত)-এর number (সংখ্যা) যদি না বাড়ে, তবে balance (সমতা) ঠিক থাকবে না।

শরৎদা—আপনি অনেক সময় বলেন, conviction (প্রত্যয়) থাকলে সব হয়, এই conviction (প্রত্যয়) জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর আসন গেড়ে ব'সে হাঁটুর উপর একটি কোল-বালিস রেখে, তার উপর হাত দিয়ে ঝুঁকে একটু দুলতে-দুলতে বললেন—Conviction মানে প্রত্যয়, with all our passions (সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে) ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'লে অর্থাৎ ইষ্টে libido (সুরত) perfectly set (সুষ্ঠুভাবে ন্যস্ত) হ'লে বাধাবিঘ্নকে তৃণবৎ মনে হয়। ইষ্টের ইচ্ছা পূরণ করতে-করতে, ইষ্টের আদেশ পালন করতে-করতে, তাদের মানুষকে চালনা করবার শক্তি এসে হাজির হয়—ঐশ্বর্য্য, ঈশত্ব, আধিপত্য তাদের আসেই, তারা কখনো ছোট থাকে না। এদেরই বলে ঈশ্বরকোটি পুরুষ, এদের থাকে grim determination (কঠোর সংকল্প)—'করবই'—এই পণ। আর, পাওয়া মানেই ভালবাসা, তাঁর ভালতে অহরহ লেগে থাকা। কোন প্রত্যাশায় তারা এটা করে না, তাঁর স্বার্থপ্রতিষ্ঠা দেখাই তাদের স্বভাব, ইষ্ট বই তারা কিছু জানে না, তাদের সমগ্র সত্তাটুকুই প'ড়ে থাকে ওখানে। যেমন হয়েছিল হনুমানের রামচন্দ্রকে পেয়ে। সে Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপ)-এর এক পাথরের 'পরে ব'সে চোখ গোল্লা-গোল্লা ক'রে চায় আর plan (পরিকল্পনা) আঁটে, কেমন ক'রে মা জানকীকে উদ্ধার করবে। শেষটা মারলো এক লাফ, এক লাফেই সমুদ্র পার। রামচন্দ্র রাবণকে ক্ষমা করতে চান তো সে ক্ষমা করে না। ভালবাসার সঙ্গে-সঙ্গেই ফুটে ওঠে এমনতর পরাক্রম। পরাক্রম হ'লো কষ্টিপাথর। একটা গরুর বাছুরের গায় হাত দিতে যান, সেখানেও দেখবেন তার পরাক্রম।

শরৎদা—মানুষ money-centric (অর্থকেন্দ্রিক) হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা দিয়ে তার passion (প্রবৃত্তি) fed (পুষ্ট) ও

fulfilled (পরিপূরিত) হয় ব'লে। প্রকৃত পক্ষে, কেউই money-র (অর্থের) জন্য money-centric (অর্থকেন্দ্রিক) নয়। অর্থ কাউতে সার্থক হয়, যেমন স্ত্রী, পুত্র কিংবা অন্য কোন ভালবাসার পাত্র, তাই সে অর্থের জন্য বলদের মত ঘোরে, নচেৎ তার প্রচেষ্টা থেমে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে উদাস ভাবে মাঠের দিকে চেয়ে রইলেন। সূর্য্য তখনও অস্ত যায়নি, ঝিলের জলের উপর পড়ন্ত সূর্য্যের লাল আভা এসে পড়েছে। পৃথিবীও যেন এক মায়াময় রঙীন সাজে সেজেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখে ফুটে উঠেছে এক অপার্থিব ভাবব্যঞ্জনা। ললিত-মধুর ভঙ্গীতে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সুরে বলছেন—দেখেন শরৎদা! কথা আপনারা ঢের জানেন, কিন্তু সেই অনুযায়ী যদি কাজ না করেন, তাহ'লে কিছুই হবে না। কথা-কাজে, চিন্তা-চলনে যদি মিল থাকে, তাহ'লে দেখবেন, আপনি চুপ ক'রে থাকলেও আপনার ব্যক্তিত্বই কথা কবে। আপনাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব যখন এমনতর যাজন-মুখর হ'য়ে উঠবে, স্বভাবযাজী হ'য়ে উঠবে, তখন দেখবেন, আপনারা জঙ্গলে যেয়ে থাকলেও সেখানে লোকের ভিড় জমে যাবে। তবে লোকের পিছনে আপনাদের কিন্তু খুব খাটা লাগবে। যেখানেই ভাল instinct (সংস্কার)-ওয়ালা লোক দেখবেন, তাদের উপরই নজর রাখবেন। Instinct (সংস্কার) ভাল, অথচ error (ভুলত্রুটি) আছে, এমনতর অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায়। তাদের পিছনে যদি খাটা যায়, তারা কালে-কালে কাজের উপযুক্ত হ'য়ে উঠতে পারে। এতে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় লাগে। একেবারে তৈরী মাল হয়তো বেশী পাবেন না, কিন্তু তার জন্য ভাবনা নাই। আপনারা কয়েকজন যদি ঠিক হন এবং মানুষগুলির উপর শ্যেনদৃষ্টি রেখে চলেন, তাহ'লে দেখবেন, আপনাদের সান্নিধ্যে কত মানুষ, মানুষ হ'য়ে যাবে। আর, এখানে যখন থাকবেন তখনও বাড়ী-বাড়ী ঘুরবেন। সবার সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা করবেন। আপনারা বাইরে যাজন করেন, কিন্তু আশ্রমে যাজন করেন না, পারিবারিক জীবনে যাজন করেন না, তা'তে কিন্তু গোল থেকে যায়। ঘর ঠিক না থাকলে বাহির ঠিক করবেন কিভাবে? আর, তার ফলই বা হবে কী? তপোবনে মাঝে-মাঝে যাবেন, মাষ্টার ও ছেলেদের নিয়ে বসবেন। সুযোগ-সুবিধামত স্থানীয় লোকজনের সঙ্গেও মেশা লাগে। শ্রদ্ধার্হ দূরত্ব বজায় রেখে সৎসন্দীপী আড্ডা যত দেওয়া যায়, ততই ভাল। আর, যাদের সঙ্গে মিশবেন, তাদের প্রত্যেকেই যা'তে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী grow ক'রে (বেড়ে ওঠে), সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। কে কেন suffer করছে (কষ্ট পাচ্ছে), তার মূল কারণ কী, কোন্ মানুষটা কেন ফুটতে পারছে না, তার বিকাশের পথে অন্তরায় কী,—ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে তার প্রতিবিধান যা'তে হয়, তা' করা লাগবে। এর জন্য ধ্যান চাই, চিন্তা অনুযায়ী কাজ করা চাই। আবার, ধরেই

নেবেন, যাদের ভাল করতে চেষ্টা করবেন, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আপনার সর্ব্বনাশ করতে উঠে-পড়ে লাগবে। তাই, চলার পথে এমনভাবে আল বেঁধে-বেঁধে চলবেন, যা'তে ঐ অত্যাচারের স্রোত আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। স্বস্তিসেবক-বাহিনী তাই কিন্তু গঠন করা চাই-ই। এখানকার স্বস্তি-সেবকদের দিয়ে তপোবনের কৃষিস্থানটা ভাল ক'রে গঠন করা লাগে। যেখানেই একদঙ্গল সৎসঙ্গী আছে, সেখানেই একটা ক'রে আদর্শ কৃষিস্থান করতে চেষ্টা করবেন। Agriculture (কৃষি) ও agricultural industry (কৃষিজাত-শিল্প) যত grow করবে (বেড়ে উঠবে), মানুষের অন্নবস্ত্র-সমস্যার সমাধান তত সহজ হবে। তবে, প্রথম কাজ হ'লো, প্রত্যেক locality-তে (স্থানে) initiates (দীক্ষিত) বাড়ান ও local worker (স্থানীয় কর্ম্মী) সৃষ্টি করা। তারপর চাই আপনাদের repeated push (বারংবার প্রবোধনা)। Touring batch (ভ্রাম্যমাণ-দল) আরো দুটো বাড়াতে হয়। তার জন্য দুইজন মাহুত ঠিক করেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে এসে মাতৃ-মন্দিরের পিছন দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চে বসলেন। ধীরে-ধীরে অনেকেই এসে হাজির হলেন। সাধনাদির জ্বর, সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন আছেন। সরোজিনীমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—সাধনা কেমন আছে রে?

সরোজিনীমা বললেন—এখন জ্বর কমের দিকে। মাথার যন্ত্রণাও কমেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ব্যথিত কণ্ঠে)—মেয়েটা কেবল ভোগে। আমার ভাল লাগে না।

কিছুসময় চুপচাপ রইলেন।

কার একটা গরু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন গরুটা খোঁড়ায় কেন রে? কার গরু?

ইন্দুদা (মিত্র) গ্রামের কারও হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মানুষ গরু পোষে কিন্তু ভাল ক'রে যত্ন করে না। সন্ধ্যার পরেও গরুটা ছাড়া অবস্থায় আপন মনে ঘুরছে। কেউ মালিক আছে ব'লে মনে হয় না। গরুটার চেহারা দেখেও মনে হয় যেন ভাল ক'রে খেতে পায় না। ছেলেবেলায় বাড়ী-বাড়ী গরুবাছুরের যেমন যত্ন নিতে দেখতাম, এখন আর তেমন দেখতে পাই না।

অক্ষয়দা (পুততুণ্ড) আপনি যেমন ক'রে গরুর যত্ন নিতে কন, তা'তে খরচ লাগে ঢের।

শ্রীশ্রীঠাকুর খরচের চাইতে দরদ লাগে বেশী। গো-পালন গৃহস্থের একটা ধর্ম্ম। বলতে গেলে গো-মাতা। মা-ই তো, অমন হিতকারী জন্তু কমই দেখা যায়। বাড়ী-বাড়ী যদি ভাল ক'রে গরু পোষে, মানুষ নিয়মিতভাবে যদি

ভাল দুধ খেতে পারে, তাহ'লে স্বাস্থ্য, মেধা ও বুদ্ধি খুলে যায়, আয়ু বেড়ে যায়। আবার, চাষবাসের জন্যও ভাল বলদ দরকার। আমাদের দেশে প্রথম অবস্থায় তাই কৃষি ও গো-রক্ষা ছিল একান্তভাবে জড়িত। গোময়ের মত সার ও disinfectant (সংক্রমণ-নিরোধী বস্তু) আবার কমই আছে। আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাই কয় রাখালরাজ, তিনি গোষ্ঠে-গোষ্ঠে ধেনুচারণ ক'রে বেড়িয়েছেন। বলরাম নিজে হাল চাষ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের কথা আমরা যা শুনি, তার মানেও মনে হয়, তিনি গোজাতির বর্দ্ধনের ব্যবস্থাই করেছিলেন।..................শরৎদা কোথায় রে?

উমাদা (বাগচী)—বোধ হয় খেপুদার ওখানে গেছেন। ডাকবো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক।

শরৎদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনাকে আর একটা কথা কব মনে করেছিলাম, কিন্তু ভুল হ'য়ে গিছিল। পরমপিতা গরুটাকে সামনে আনে দিয়ে স্মরণ করায়ে দিলেন। যেখানে যাবেন, যাদেরই সুযোগ-সুবিধা আছে, তারা যা'তে গরু পোষে ও ভালভাবে গরুর যত্ন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এতে দেখবেন, ঘরে-ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসবে। ....আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণকে যে গোবর্দ্ধনধারী কয়, আমি যদি কই, তিনি গোজাতির বর্দ্ধনের নীতিবিধির ধারক ও পালক ছিলেন, তাহ'লে কি ভুল হবে?

শরৎদা—না, ঠিকই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Dictionary (অভিধান)-টা দেখেন তো।

শরৎদা—Dictionary (অভিধান) দেখার প্রয়োজন হবে না। Dictionary-তে (অভিধানে) ওভাবে ব্যাখ্যা না থাকাই সম্ভব, আর তা' যদি না-ও থাকে, শব্দার্থের থেকে সহজভাবে আপনার ব্যাখ্যা support (সমর্থন) করা চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেন যেন। আমি মুখ্যু মানুষ, কী কতি কী কই! শেষটা মানুষ কবে, ঠাকুরের যত উদ্‌ভট্টি কথা!

নগেনদা (বসু)—তা' কওয়ার উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে সরোজিনীমাকে বললেন—ধাত্রী-বিদ্যা কত জনেই তো শিখলো, কিন্তু তুই ছাড়া অন্য কেউ বিদ্যেটা তেমন কাজে লাগালো না। অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়। যারা শিখেছিল, তারাও ভুলে গেছে। যাহো'ক, যাদের এদিকে taste (অনুরাগ) আছে, দেখেশুনে তেমনতর কয়েকজনকে যদি তুই কাজের সময় সঙ্গে রেখে training (শিক্ষা) দিয়ে নিস, তাহ'লে ভাল হয়। তুই না যেতে পারলেও যা'তে মানুষের অসুবিধা না হয়, তেমনভাবে তৈরী ক'রে নেওয়া লাগে। আর, প্যারী যদি কয়েকজনকে first aid (প্রাথমিক চিকিৎসা)-এর training (শিক্ষা) দিয়ে রাখে, তাহ'লেও সুবিধা হয়।

কোথায় কে কী বিপদে পড়ে, তার তো ঠিক নেই। First aid (প্রাথমিক চিকিৎসা) জানা থাকলে, অনেক কাজে লাগে। তপোবনের ছেলেদের ও ঋত্বিক্‌দের যদি শেখায়, তাহ'লে খুব ভাল হয়। আমাকে মনে ক'রে দিস তো। আমি প্যারীকে কথাটা কয়ে রাখবো। জিতেন ও কালীকেও কব। আমার কওয়ায় তো কিছু হয় না, সেগুলি করা চাই।

যতীশদা (কর)—আপনি তো অনেক কিছুই করতে বলেন, সব কাজ তো করা সম্ভব হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিও আমাদের নানারকম প্ররোচনা দেয়, কিন্তু তখন এ-কথা ভাবি না, এত রকম্যারি প্ররোচনাকে বাস্তবে অভিব্যক্তি দেবো কিভাবে? নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তার অভিব্যক্তি দিয়ে ফেলি। যেখানে প্রত্যাহার করার কথা, সেখানে বরং আমরা ঝোঁকের বশে engaged (নিযুক্ত) হ'য়ে পড়ি। আর, যেখানে immediately engaged (তৎক্ষণাৎ-নিযুক্ত) হবার কথা, সেখানেই নানা consideration (বিবেচনা) নিয়ে থমকে ব'সে থাকি, বাস্তবে প্রত্যাহার করি। ঠাকুরকে যদি তোমাদের master complex (চালকপ্রবৃত্তি) ক'রে তোল, তাহ'লে কিন্তু দেখতে পাবে—তাঁর ইঙ্গিত পেয়েছ কি ক'রে ফেলেছ। ধর, রসগোল্লার উপর তোমার খুব লোভ। তোমার পেট ভরে গেছে, এমন সময় যদি কেউ রসগোল্লা নিয়ে আসে, তাহ'লে কিন্তু ঐ ভরা পেটেই তুমি রসগোল্লার জন্য জায়গা ক'রে নেবে। মানুষের সময়ও elastic (স্থিতিস্থাপক), capacity (ক্ষমতা)-ও elastic (স্থিতিস্থাপক)। সবটাই টেনে লম্বা করা যায়। আর, তা' নির্ভর করে urge-এর (আকূতির) উপর।

একজন নিয়তকর্ম্মী এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—সাংসারিক অভাব-অভিযোগের জন্য আমি কাজে মন বসাতে পারি না। সব সময়ই মন দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত থাকে। কী করবো বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এ-কাজ করতে গেলে অন্য কোনদিক চাওয়া চলবে না। নিদারুণ কষ্টের জন্য রাজী থাকতে হবে। তুমি সপরিবার অনাহারে আছ, তখনই হয়তো আমি তোমাকে বলব—যার প্রচুর আছে, তাকে বিলাসের উপকরণ জোগাতে। আর, তাই ক'রেই যদি তুমি সুখ পাও, ক্ষুধার জ্বালা হেলায় সহ্য করতে পার, তাহ'লে বোঝা যাবে, তোমার এখানে থাকার যোগ্যতা হয়েছে। মানুষ কাকে কতখানি ভালবাসে তার পরখ হ'চ্ছে, তার প্রীতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য সে কতখানি কষ্ট সহ্য করতে পারে।

উক্ত দাদা—নিজে তো কষ্ট সহ্য করতে রাজী আছি, কিন্তু ছেলেপেলেদের কষ্ট দেখলে মন ঘাবড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর ছেলেপেলেদের জন্য যেমন তোর লাগে, আমার তার থেকে

কম লাগে না, আর, এখনই আমি তার ব্যবস্থাও করতে পারি। কিন্তু তা'তে তুই মানুষ হবি না, আর, তুই যদি মানুষ না হোস, তোর ছেলেপেলেরাও মানুষ হবে না। চরিত্রের উপর দাঁড়াতে, সেবার উপর দাঁড়াতে যদি কিছুদিন struggle (সংগ্রাম) করা লাগে, suffer (কষ্ট) করা লাগে, তার একটা সার্থকতা আছে। তোর দেখাদেখি ছেলেপেলেরাও তখন ঐ ধাঁজ ধরবে। তুমি লাখ মানুষের অসুবিধা দূর করতে যাচ্ছ, নিজের অসুবিধায় মুষড়ে গেলে কার কী করবে? অসুবিধা থাকবেই—এই জেনেই কাজে নামা। আর, কেউ ঘাবড়ায় ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের থাকে অন্য inclination (ঝোঁক), fascination (মোহ), তার গায় যখন ঘা পড়ে, তখন আর ভাল লাগে না, fascination (মোহ) pursue (অনুসরণ) করতে মানুষ ঘাবড়ায় না। একমাত্র fascination (মোহ) ইষ্ট হ'লে কোন বালাই থাকে না। এইটেই mission (লক্ষ্য) ক'রে নেওয়া চাই। Luxury (বিলাসিতা) ক'রে রাখলে চলবে না। অন্যদিকে নজর থাকলে সেইটেই ভাল ক'রে দেখা ভাল। তবে, যেদিকেই যাও, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার দিকে নজর থাকলে, তার মধ্যেই তুমি বড় হ'তে পারবে।

প্রফুল্ল—বড় হওয়া বলতে কেউ-কেউ বোঝেন, অনেক টাকার মালিক হওয়া এবং টাকা না থাকলে তারা নিজেদের ছোট মনে করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ধারণা উল্টো, আমি বুঝি মানুষ-সম্পদ। টাকা থাকলেই প্রাণের উদ্বোধন হয় না বা প্রাণের উদ্বোধন ক'রে দেওয়া যায় না। কিন্তু ভালবাসায় তোমার যদি প্রাণের উদ্বোধন হ'য়ে থাকে এবং তুমি যদি অন্যের প্রাণের উদ্বোধন ক'রে দিতে পার, মানুষ তোমার আপনার জন হ'য়ে দাঁড়াবে। যীশু বলেছিলেন, "Come ye after me, and I shall make you fishers of men." (তোমরা আমার সঙ্গে আস, তোমাদের মানুষ ধরতে সেখাব)। যার মানুষ আছে, মানুষকে যে জীবনের পথ দেখিয়েছে, বাড়িয়ে তুলেছে, তার টাকার অভাব হয় না। আমি টাকা পাই কোত্থেকে? আমায় মানুষ টাকা দেয় কেন? তাই বলি, নারায়ণ বাদ দিয়ে লক্ষ্মীর উপাসনা করলে লক্ষ্মীকে পাওয়া যায় না। নারায়ণ মানে জীবনের পথ, বৃদ্ধির পথ। যিনি যত মানুষকে জীবন-বৃদ্ধির পথে চালিয়ে নিতে পারবেন, তিনি তত বড় নারায়ণ। আর, যিনি যত বড় নারায়ণ, তত বড় লক্ষ্মী তাঁর গৃহে অচলা। হিটলার, মুসোলিনী একদিন তোমার আমার মতই ছিল, খেতে পেত না, কিন্তু তারা ছিল মানুষ-স্বার্থী। আজ দেখো, তাদের অর্থের কূলকিনারা করতে পার না। আর, যতদিন তারা প্রকৃত মানুষ-স্বার্থী থাকবে, ততদিন তাদের এমনতরই চলবে- আশা করা যায়। টাকাকে মুখ্য ক'রে ভাবা একটা sign of idiocy (মূর্খতার লক্ষণ)।

২৩শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪৯ (ইং ৮।৯।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। শ্রীশদা (রায়-চৌধুরী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (বিশ্বাস), সনৎদা (ঘোষ), শরৎদা (হালদার), দেবী-ভাই (চক্রবর্ত্তী), জয়ন্ত-ভাই (বিশ্বাস), সরোজিনীমা, সুরমা-মা, ভুটুর-মা, বীণামা, লীলামা, রেণুমা প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিখুশিভাবে কথাবার্ত্তা বলছেন। তাঁর সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে যেন একটা আনন্দের স্রোত উৎসারিত হ'য়ে চলেছে।

রবীনদা নামক বহিরাগত একটি সৎসঙ্গী ভাই বললেন—ঠাকুর! আমি যতই সাবধানে থাকি ও ওষুধপত্র খাই, কিছুতেই অসুখ-বিসুখ এড়াতে পারি না। এর কারণ কী এবং কিসে এর প্রতিকার হবে আপনি যদি ব'লে দেন, তাহ'লে আমি সেইভাবে চলতে চেষ্টা করবো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর অসুখটা কী?

রবীনদা—আমার অসুখের অন্ত নেই। তবে প্রধান অসুখ হ'লো—যা' খাই, কিছুই হজম হয় না, মাঝে-মাঝে জ্বর হয়। মাথাটা প্রায়ই ধ'রে থাকে। যখন-তখন সর্দ্দি লাগে। আরো অনেক রকম উপসর্গ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরের সম্বন্ধে বেশী ভাববি না। খুঁত-খুঁতে ভাব থাকলে তা'তে শরীর আরো বেশী খারাপ করে। আর, সব সময় ক্ষিদে রেখে খাবি। ভরপেট খাবি না কখনও। কোন্ জিনিসটা পেটে সয়, নিজের মত ক'রে দেখে-শুনে ঠিক ক'রে নিতে হয়। কিছুতেই লোভের প্রশ্রয় দিবি না। যা' সহ্য হয় না, তা' খাবি না। আর, খাবার পর কয়েকটা ক'রে গোলমরিচ নুন দিয়ে জল দিয়ে চিবিয়ে খাবি। থানকুনী পাতাটা রোজ সকালে খাবি। পেট ঠিক থাকলে অনেকটা ভাল থাকবি। আর, পুদিনা বাটা যদি খাস, ওটা পেট ও সর্দ্দিকাশি দুই-ই দেখবে। সদাচারে চলবি, যার-তার হাতে খাবি না। দোকানে খাবি না। মনের balance (সমতা) যা'তে বজায় থাকে, সেইভাবে চলবি। মনের উপর চোট পড়লে, তার থেকে শরীর অনেক সময় খারাপ করে। সংসারে চলতে গেলে মনের উপর চোট আসেই। উপযুক্ত মাত্রায় নিয়মিত নামধ্যান করলে তা'তে মনের স্থৈর্য্য অনেকখানি বাড়ে, ওতে মানুষ আঘাত-ব্যাঘাতে সহসা মুষড়ে পড়ে না, মন চাঙ্গা থাকে, আর, মন চাঙ্গা থাকলে শরীরও ভাল থাকে তা'তে। আর, মন চাঙ্গা রাখার পক্ষে যাজনের মতো ওষুধ নেই। যাজনে মানুষ নিজেকে ভুলে থাকে, ওতে শরীরও চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। একটা গোলাপী নেশার মত হয়। আর, সব ব্যাপারে সংযম চাই।

রবীনদা—প্রবৃত্তির বেগ আমি রুখতে পারি কমই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু যার যত

হাতের বাইরে, তার শরীর-মন তত বেহাল হবেই কি হবে। Sex life (যৌন-জীবন) যার যত unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত), তার গোটা জীবনটাও তত বিশৃঙ্খল। অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলি আমার মনে হয়, কামেরই রকমারি offshoot (ডালপালা)। মানুষের আদর্শনিষ্ঠা ও দাম্পত্যজীবন এই দুটো দিক যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে অনেকখানি বাঁচোয়া। এর ভিতর-দিয়েই কামের সুনিয়ন্ত্রণ হয়। কাম নিয়ন্ত্রিত হ'লে অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিও পথে আসে। তাই দীক্ষা ও বিয়ে এ দুটো বিধিমাফিক হওয়া চাই। গুরু যদি আচরণ-সিদ্ধ আচার্য্য না হন, তাহ'লে মানুষের ভক্তিটা সাধারণতঃ সার্থক হ'য়ে ওঠে না। তাই যত্র-তত্র দীক্ষা না নেওয়াই ভাল। অবশ্য অনেক ভাল কুলগুরু আছেন, তাঁরা দীক্ষার সময় ব'লে থাকেন, 'তুমি আপাততঃ এই অনুশীলন কর, সদ্‌গুরু পেলে তাঁকেই গ্রহণ ক'রো।' সদ্‌গুরু-সন্ধানী হ'য়ে অমনতর দীক্ষা নিয়ে অনুশীলন করা চলে। আর, বিয়েও হিসাব ক'রে করতে হয়। ছেলেমেয়ের বংশ, ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য যদি না থাকে, তবে তেমনতর বিবাহে স্বামী বা স্ত্রী কেউই সুখী হ'তে পারে না। দাম্পত্য প্রণয় জিনিসটা যদি না গজায়, তবে শুধু কাম-সম্বন্ধে স্বামী বা স্ত্রীর জীবনে পরিতৃপ্তি জিনিসটা আসে না। বুকের মধ্যে থাকে একটা হাহাকার ও শূন্যতা। সবগুলি প্রবৃত্তিই হ'য়ে ওঠে উগ্র। তারা নিজেরাও শান্তি পায় না, কাউকে শান্তি দিতেও পারে না। নিজেরা নিস্তেজ ও হতবল হ'য়ে পড়ে, স্ফূর্ত্তি থাকে না, আনন্দ থাকে না, রুগ্ন, কুটিল ও ইন্দ্রিয়পরবশ হ'য়ে পড়ে, সন্তানাদিও ঐ ধারা ধরে। Longevity (পরমায়ু) ও efficiency (দক্ষতা)-ও সেখানে ধীরে-ধীরে কমের দিকে চলতে থাকে। গোলমেলে বিয়ের থেকে যে কত সর্ব্বনাশ হয়, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। সোনার সংসার শ্মশান হ'য়ে যায়।

রবীনদা—আপনার কথা থেকে আজ আমার শারীরিক অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে অনেকখানি বুঝতে পারলাম। কিন্তু কারও বিয়ে যদি ঠিকমত না হ'য়ে থাকে, সেখানে করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা হ'চ্ছে, এতদিনে তুমি তোমার স্ত্রীর প্রকৃতি সম্বন্ধে তো মোটামুটি বুঝতে পেরেছ, তাই সে যা', তার চাইতে অতিরিক্ত তার কাছ থেকে কিছু expectation (প্রত্যাশা) রেখো না। দুর্ব্ব্যবহারের জন্য মনকে প্রস্তুত ক'রে রেখো। অথচ ভিতরে তার প্রতি কোন আক্রোশ পোষণ ক'রো না। সহানুভূতি সহকারে বুঝে দেখো তার জন্ম, কর্ম্ম, প্রকৃতি তাকে অমনতরই ক'রে তুলেছে এবং তাই-ই তাকে অবশভাবে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং সে খারাপ ব্যবহার করলেও নিজেকে shocked (আহত) হ'তে দিও না। ফলকথা, সে যাই করুক, তা' তুমি তত গায় মেখো না। তুমি সদয় ব্যবহারই ক'রো, যদি দেখো তা'তে বেশী বাড়াবাড়ি করছে, তাহ'লে indifferent

(উদাসীন) থেকো, কিংবা প্রয়োজন হ'লে বাহ্যতঃ একটু রূঢ়ও হ'তে পার, কিন্তু সেটা অভিনয়ের ভঙ্গীতে। মনকে তার দ্বারা affected (বিচলিত) হ'তে দিও না। সব সময় মনকে আরো খারাপ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখবে, এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে যে, সে আরো খারাপ ব্যবহার করছে না। এইরকম একটা উদারতা, সহানুভূতি, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও জ্ঞানের দৃষ্টি যদি তোমার ভিতরে খুলে যায়, তাহ'লে দেখবে, তোমার মনে চোট লাগবে কম, স্বাস্থ্যও অতোখানি বিপন্ন হবে না। আর, তোমার স্ত্রীর যদি কোন পরিবর্ত্তন হবার হয়, তাহ'লেও এইভাবে হবার সম্ভাবনা বেশী। তোমার স্ত্রী খারাপ এবং তুমি ভাল, কিংবা তুমি খারাপ, তোমার স্ত্রী ভাল এ-কথা কিন্তু আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, তোমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য নেই, সেইজন্য তোমরা কেউ কাউকে বরদাস্ত করতে পার না, তাই খটাখটি বাধে। তুমি যদি অতোখানি হিসাব ক'রে চল, দেখবে, অনেকখানি সুফল ফলবে। আর একটা কথা, বিশেষভাবে solicited (অনুরুদ্ধ) না হ'লে কখনও sexually engaged (যৌন-সংশ্রবে লিপ্ত) হবে না।..............বিয়ে-থাওয়া ঠিকমত না হ'লে ছেলেপেলেও ভাল হয় না। একটা মানুষ যতই বড় হো'ক না কেন, তার বিয়ে যদি ভাল না হয়, সে যদি সুসন্তান রেখে যেতে না পারে, তাহ'লে কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তার সাধনার ধারা লোপ পেয়ে যাওয়ার মত হয়। অবশ্য গুণগ্রাহী বা ভক্তজনের ভিতর-দিয়ে অনেকের সাধনার ধারা দীর্ঘকাল বজায় যে না থাকে, তা' নয়। তবে উপযুক্ত সন্তান-সন্ততি থাকলে রক্তের ধারাটা বজায় থাকে এবং বিয়ে-থাওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষার গোলমাল না হ'লে অনেক সদগুণই বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হ'য়ে চলে। সেইটে না থাকলে কোন বিশেষ সময়ে, একটা বংশ বা জাতির যতই উন্নতি হো'ক না কেন, সে উন্নতি ধ'রে রাখা যায় না।

প্রবীনদা। আমি ইতিহাসের ছাত্র। মারাঠাদের সম্বন্ধে এ-কথা আমি ভেবে দেখেছি যে খুব ঠিক। শিবাজীই মারাঠাদের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত ক'রে তোলেন, স্বাধীন মারাঠা রাষ্ট্র গঠন করেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব শত চেষ্টা সত্ত্বেও শিবাজীকে বিধ্বস্ত করতে পারেন না। অবশ্য শিবাজীর পিছনে ছিলেন তাঁর গুরু রামদাস। শিবাজী যেভাবে আফজল খাঁকে মেরে ফেলেন, বিজাপুর-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন, শায়েস্তা খাঁকে বিতাড়িত করেন, আহম্মদনগর ও সুরাট লুণ্ঠন করেন, সেগুলি যেন রূপকথার মত লাগে। শিবাজী আগ্রায় ছেলেসহ বন্দী হ'য়ে যেভাবে কৌশলে পালিয়ে আসেন, তাও কম চাতুর্য্যের পরিচায়ক নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মোগলদের বিব্রত ক'রে তুলেছিলেন। শাসন, সৈন্য পরিচালন, জনসাধারণের সুখ, সুবিধা ও উন্নতি সব দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সকল সম্প্রদায়েরই উপর তাঁর সমদৃষ্টি ছিল,

তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। মারাঠা জাতিকে তিনি এক নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। শিবাজীর ছেলে শম্ভাজীর চরিত্রবল না থাকায়, শিবাজীর মৃত্যুর পর সে সহজেই মোগলদের হাতে পরাস্ত ও নিহত হ'লো। শম্ভাজীর ছেলে শাহু পরে রাজা হন, বালাজী বিশ্বনাথ তার পেশবা বা প্রধানমন্ত্রী হন। বিশ্বনাথই পরে মারাঠা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। তার ছেলে প্রথম বাজীরাও ছিলেন খুব কর্ম্মদক্ষ। এরপর পেশবাদের কর্তৃত্ব চলতে থাকলো। প্রথম বাজীরাওয়ের ছেলে বালাজী বাজীরাও ছিলেন অর্থলোভী। তাঁর দৃষ্টান্তে জাতীয়তার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হ'য়ে গেল, মারাঠাদের মধ্যে আদর্শবাদ ও ঐক্যের আর কোন প্রেরণা রইল না। তারপর এসে পড়ল তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ। এইসব নানা কারণে মারাঠারা হতবল হ'য়ে পড়ল, আর উঠতে পারল না। তাই উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাকলে কিছুই যে স্থায়িত্ব লাভ করে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিয়ে ঠিকমত হ'লেই যে উপযুক্ত সন্তানের অধিকারী হওয়া যাবে, তার ঠিক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে ঠিকমত হওয়া মানেই মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী লাভ করা। স্ত্রী যদি মনোবৃত্ত্যনুসারিণী হয়, তাহ'লে তার গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে স্বামীর সদ্‌গুণগুলি মূর্ত্ত হবারই সম্ভাবনা বেশী।

অন্নপূর্ণামা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্নপূর্ণামা'র হাতে একটা শিশি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তোর হাতে কী রে?

অন্নপূর্ণামা—এতে তালমিশ্রী। মেয়েটার কাশি হইছে, তাই আনান হইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধানে রাখিস। আর, একটু ক'রে তুলসীপাতার রস মধু দিয়ে খেতে দিস।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) পাশে বসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে বললেন আজকাল মেয়েরা লেখাপড়া শেখে কিন্তু ছেলেপেলে মানুষ করতে হয় কেমনভাবে তা' জানে না। কেমন ক'রে খেতে হয়, হাগতে হয়, মুততে হয়, দাঁড়াতে হয়, বসতে হয়, হাঁটতে হয়, দাঁতের যত্ন নিতে হয়, চোখের যত্ন নিতে হয়, কানের যত্ন নিতে হয়, থুতু ফেলতে হয়, জল খেতে হয়, স্নান করতে হয়, কথা বলতে হয়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, নিঃশ্বাস নিতে হয়, শরীর রক্ষা করতে হয় সবই ভাল ক'রে শিখিয়ে দেওয়া লাগে। Prevention is better than cure. (রোগের চিকিৎসার থেকে, রোগ যা'তে না হয়, তাই করা ভাল)। মায়েরা যদি ছেলে-মেয়েদের ভাল ক'রে শিক্ষা দেয়, তাহ'লে তারা অনেক কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়। আর, এই যে শিক্ষার কথা বলছি, এগুলি কিন্তু মুখে ব'লে হয় না। নিজেদের আচরণ দিয়ে শেখাতে হয়। আর, কোন্‌টা কেন করতে হবে, সঙ্গে-সঙ্গে তাও বুঝিয়ে দিতে হয়। সৎশিক্ষা

ও সদভ্যাসের অভাবে মানুষ যে কত দুঃখ পায় জীবনে তার অন্ত নেই। আবার ভিতরে যদি মাল না থাকে, তাহ'লে শিক্ষা দিলেও সে-শিক্ষা ধ'রে রাখতে পারে না। তবে, পারিবারিক আচার-আচরণ যদি ভাল হয়, তার ভিতর দিয়ে অজ্ঞাতে অনেক শিক্ষা পেয়ে যায়। এক-একটা পরিবারে দেখা যায়, বিনয় ও সদাচার যেন তাদের স্বভাবগত। ঐ রকম পরিবেশে মানুষ হ'লে, সেটা আয়ত্ত করতে দেরী হয় না। আবার অমনতর পরিবারের ছেলে-মেয়েরা জন্মসূত্রে অনেকখানি শুভ সম্পদ নিয়ে আসে। তাই তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সহজেই ভাল হয়। পরিবারগুলি গ'ড়ে তোলার দিকে আপনারা তাই বিশেষভাবে নজর দেবেন। দৈনন্দিন আচার-আচরণ সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা বলেছি, সেগুলি পরিবারে-পরিবারে এস্তামাল ক'রে দেবেন। ছড়ার বইটা তাড়াতাড়ি ছাপান হ'লে ভাল হ'তো, ওর মধ্যে চুম্বকে অনেক কাজের কথা বলা আছে। আর, যে-ভাবে বলা আছে, তা'তে মেয়েছেলেদেরও বুঝতে কষ্ট হবে না। কতকগুলি ছড়া বেছে নিয়ে ঘরে-ঘরে সেগুলি মুখস্থ করিয়ে দিতে হয়। আবার, সঙ্গে-সঙ্গে যা'তে সেগুলি পালন ক'রে চলে, সে-দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। অনেক সদভ্যাস নতুন ক'রে করান লাগবে, তাই অনেক খাটুনি আছে এর পিছনে। আপনাদের অভ্যাস যদি দুরস্ত হয়, আপনাদের দেখে আবার অনেকে শিখবে।

শ্রীশদা—আমরা তো আপনার ভিতর বহু সদভ্যাস দেখি, কিন্তু সেগুলি আমাদের ভিতর ফুটে ওঠে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে শ্রদ্ধা করেন কিনা, ভালবাসেন কিনা, তার পরখ কিন্তু ওখানে, ভালবাসলে চরিত্র বদলাবেই। তা' যদি না বদলায়, সব মেকি। একলা আমি করলে বা চললে, তা' দিয়ে সারা আশ্রমের মধ্যে কিন্তু একটা atmosphere (আবহাওয়া) সৃষ্টি হবে না, যদি অন্ততঃ আপনারা কয়েকজন না করেন। আপনারা যারা এইভাবে চলবেন, তাদের আবার একগাট্টা হ'য়ে চলা চাই। তা'তে একটা দানাবাঁধা রকমের সৃষ্টি হয়। এই cluster (দল)-এর আবার society (সমাজ)-এর উপর একটা influence (প্রভাব) হয়। তাছাড়া মানুষ নিজে থেকে যদি আপনাদের সাহচর্য্যে না আসে, আপনারাই ধরবেন বাড়ীতে-বাড়ীতে, আড্ডায়-আড্ডায়, আপনাদের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ দেবেন তাদের। আর, lovingly (ভালবেসে) mould (নিয়ন্ত্রণ) করবেন তাদের। মানুষের সঙ্গে খুব মিশতে হয়, বাড়ীতে-বাড়ীতে গিয়ে হানা দিতে হয়। আমি একসময় দেখতেন না, কেমন চরকির মত ঘুরতাম সারা আশ্রমে। কেউ কোন বাজে কথা বলতে গেলেও ভাবতো, এখনই ঠাকুর এসে পড়তে পারেন। ক্রমাগত ভাল impulse (প্রেরণা) দিতে হয় মানুষকে, তা'তে তার ভিতরকার ভালটাই পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে যখন কিছুতেই আপনার মন টলাবে না, খারাপকেও যখন আপনি ভালর দিকে মোড়

ফিরিয়ে দিতে পারবেন, তখন বোঝা যাবে, সদ্ভাবে সিদ্ধি লাভ করেছেন আপনি। আপনারা যদি এইরকম সিদ্ধপুরুষ না হন, তাহ'লে কিন্তু অসতের জাল ভেদ ক'রে সতের প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। ভিতরের সম্বল ও শক্তি খুব বাড়ান লাগবে, তা' না হ'লে অসতের সঙ্গে সংগ্রামে টিকে থাকতে পারবেন না। খুব deep conviction (গভীর প্রত্যয়) না থাকলে মানুষ sufferings (দুর্ভোগ) ও opposition (বিরুদ্ধতা)-এর মুখোমুখি নিজের মনোবল ঠিক রাখতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—পাখী এমনি কেষ্ট-কথা কয়, কিন্তু যেই বিড়ালে এসে ধরে, অমনি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে। আমাদেরও ঐ দশা হবে যদি ইষ্টকে সত্তার সঙ্গে গেঁথে না নিই। এমন হওয়া চাই যে, ইষ্টের স্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য আমার স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, বিষয়, সম্পত্তি, মান, প্রতিপত্তি, এমন-কি নিজের প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত হেলায় বিসর্জ্জন দিতে পারি। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে হবে না। স্বার্থই হবে ইষ্ট। সিদ্ধপুরুষ বলতে বুঝি এমনতর। তাদের চোখে-মুখে এক নতুন জ্যোতি ফুটে ওঠে। সে চেহারা দেখলেই, মানুষের রিপুদল স্তম্ভিত হ'য়ে ওঠে, নতজানু হ'য়ে প্রণতি জানায় তাকে। শয়তানকে কাবেজ করতে গেলে এমনতর চরিত্র চাই। সে হয় খাপখোলা তলোয়ারের মতো, এমনি দয়ামায়ার অভাব নেই, আবার প্রয়োজনমত মুহূর্ত্তে ভয়ালরূপ ধরতে পারে। এমনি সহজ-সরল, অথচ মহাচতুর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ ভাবের আবেগে আরক্তিম হ'য়ে উঠল।

সরোজিনীমা তামাক সেজে দিলেন।

মালদহ থেকে দেবেনদা (ঝা) আসলেন। তাঁর হাতে কাগজে মোড়া কি যেন একটা জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—কি দেবেনদা! কখন আসলেন? আমার জন্য কী আনিছেন,

দেবেনদা (প্রণাম ক'রে) এই আসছি, গেষ্ট হাউস থেকে স্নান সেরে আসলাম। আপনার জন্য বাড়ীর তৈরী আমসত্ত্ব কিছু এনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদের দেশের আমসত্ত্ব বড় ভাল। আমি আগেও কত খাইছি। এখনও যেন মুখে লেগে আছে। যান, বড়বৌকে দিয়ে আসেন গিয়ে। বড়বৌকে কবেন—আজই যেন আমাকে ভাতের পাতে দেয়।

দেবেনদা শুনে হাসি-হাসি মুখে আমসত্ত্ব নিয়ে চ'লে গেলেন। শ্রীশ্রীবড়মাকে দিয়ে আবার এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের দেশে যেমন সুন্দর আমসত্ত্ব হয়, এই আমসত্ত্ব যদি অন্যান্য province (প্রদেশ)-এ ও foreign (বিদেশ)-এ চালান দেওয়া যায়, তাহ'লে কেমন হয়?

দেবেনদা—তা' বোধ হয় ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকাল বিলেত, আমেরিকা, জাপান ও জার্ম্মানী থেকে কত জিনিস আমরা আমাদের দেশে আমদানি করি কিন্তু আমাদের দেশ থেকে raw-material (কাঁচা মাল) ছাড়া অন্য কোন industrial product (শিল্পজাত দ্রব্য) ওদের দেশে পাঠিয়ে অর্থাগমের ব্যবস্থার কথা ভাবি না। আমসত্ত্বকেও তো বলা যায় cottage industry-র product (কুটির শিল্প-জাত দ্রব্য)। Foreign (বিদেশ)-এ পাঠাবার জন্য যদি untouched by hand (হস্তস্পৃষ্ট নয়) এমনতরভাবে তৈরী করতে হয়, তাও সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি দিয়েই হ'তে পারে। আমরা এদিক দিয়ে ভাবিই না যে। আমাদের দেশে যে-সব জিনিস আছে, সেইসব যদি একবার ওদের দেশে চালু করা যায়, তাহ'লে দেখবে, তোমরা supply (যোগান) দিয়ে পারবে না। আমও যা'তে আরো বেশী ফলে, ভাল ফলে ও রকমারি ফলে, তার জন্য ভাল লোককে দিয়ে গবেষণা করতে হয়। গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হ'য়ে না থেকে, নিজেরাই ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের খরচপত্র নিজেরা চাঁদা ক'রে যোগাতে হয়। সৎসঙ্গীরা মিলে যদি এইসব কাজ কর, তাহ'লে তার দ্বারা সকলেই উপকৃত হবে। তোমাদের industrial move (শিল্পপ্রচেষ্টা) একঘেয়ে রকমে হবে না, যেখানে যেমনতর সুযোগ-সুবিধা সেখানে তেমনতর ভাবে হবে।

বীরেনদা—শারীরিক সদাচারের জন্য কী-কী নিয়ম আমাদের সাধারণতঃ মেনে চলা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন প্রস্রাব ক'রে জল নেওয়া, নাকে-মুখে আঙ্গুল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা, পরের ব্যবহৃত জিনিস যথা জামাকাপড়, গামছা, বিছানা ইত্যাদি ব্যবহার না করা, পায়খানা ক'রে খুব ভাল ক'রে শৌচাদি করা, ব্যবহারের জিনিসগুলি সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অসুখ-বিসুখ হ'লে রোগের সংক্রমণ যা'তে না হ'তে পারে, এমনভাবে চলা, অন্যের এ'টো না খাওয়া, এক পাতে অনেকে না খাওয়া, কোন ফল-টল খেতে গেলে ধুয়ে খাওয়া, বাসনপত্র ভাল মাটি দিয়ে ভাল ক'রে মাজা, ঋতুমতী মেয়েদের শুদ্ধাচারে চলা, বিশেষ ছোঁয়া-নাড়া না করা, রেষ্টুরেন্টে চা ইত্যাদি না খাওয়া, দোকানের খাবার যথাসম্ভব বাদ দিয়ে চলা, বাইরে থেকে এসে হাত-পা ধুয়ে ঘরে প্রবেশ করা, বাসি কাপড়ে খাদ্যদ্রব্যাদি স্পর্শ না করা, রান্নাঘরে না ঢোকা, আলগা ক'রে জল খাওয়া, আমিষ আহার ও পিঁয়াজ-রসুন, মাদকদ্রব্যাদি বর্জ্জন ক'রে চলা, কদাচারী লোকের হাতে না খাওয়া, মাঝে-মাঝে উপবাস করা, কিছু খেতে গেলেই হাত-পা-মুখ ধুয়ে খাওয়া, আলো-হাওয়া ও মাটির সংশ্রব বজায় রেখে চলা, স্নানাদি ঠিকমত করা, পরিমিত আহার, বিহার, শ্রম, নিদ্রা ও বিশ্রাম নিয়ে চলা, পারিপার্শ্বিককে সদাচারী ক'রে তোলা, সবার সঙ্গে শুভসঙ্গতি নিয়ে চলা,

নিজে স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকা, মানুষ যা'তে স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে তাই করা—মোটামুটি এইগুলি যদি ঠিক রাখা যায়, তাহ'লে অনেকখানি হয়। এ আমি মোকথা কতকগুলি বললাম। তাছাড়া বৈশিষ্ট্যানুযায়ী যার শরীর-মন যা'তে সুস্থ ও প্রসন্ন থাকে তার তা' পালন ক'রে চলা উচিত।

আশ্রমের সামনের দিকটা খানিকটা অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। সেইদিকে দৃষ্টি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সদাচার বা পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বোধ থাকলে আমরা পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখতে চেষ্টা করি। এই যে, এই জায়গাটা এমন অপরিষ্কার হ'য়ে আছে। আমরা সদাচারী, কিন্তু এই জায়গাটা পরিষ্কার ক'রে রাখার বুদ্ধি আমাদের হয় না। আপনারা হয়তো বলবেন—কে করবে? কিন্তু যাদেরই নজর আছে, তারা নিজেরাই করুক বা অন্যকে দিয়ে করাক, না ক'রে পারে না। আবার, এইসব কাজ করায় মান-অভিমানও অনেকখানি নরম পড়ে। ভক্ত যে, সে হয় তৃণের চাইতেও সুনীচ। এই দীনভাব না আসলে সদ্‌গুরু-সান্নিধ্যে মানুষ লাভবান হ'তে পারে না। আমাকে অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুর! আপনি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব খুঁটিনাটি ক'রে ভাগ ক'রে দেন না কেন? আমি অনেক সময় তাদের কথা এড়িয়ে যাই। কিন্তু আসল কথা হ'চ্ছে, out of autoinitiative urge (স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে) কে কতটা করে, সেইটেই দেখবার। কেউ যদি বিপদ-আপদে পড়ে এবং আমি যদি তার জন্য আমাদের কাউকে কিছু করতে বলি, আপনারা সাধারণতঃ তা' করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার বলার অপেক্ষা না ক'রে যদি আপনারা পরস্পরের জন্য করেন, তাহ'লে তা'তেই কিন্তু আমি সুখ পাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে পড়লেন।

দুপুরে খাবার পর মাতৃমন্দিরের ঘরের ভিতর চৌকীতে এসে বিছানার উপর বসেছেন। মায়েদের মধ্যে অনেকেই এসেছেন, যথা ছোটমাসীমা, কুমার-খালীর মা, শৈলমা (পশুপতির মা), ক্ষেত্রমা, বীণামা, চারুমা, অমূল্যদার মা, সুশীলাদি, ননীদি, বিজয়দার মা, সুধামা, সেবাদি, রাণীমা, রেণুমা, ঢাকার মা, কুমিল্লার মা, সনৎদার বাড়ীর মা, অক্ষয়দার বাড়ীর মা প্রভৃতি। কুমারখালীর মা গল্পচ্ছলে বললেন—রাজা শিবির আশ্রিত রক্ষণের গল্পটা খুব ভাল লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বালিসে ঠেস দিয়ে ব'সে সুপুরি চিবোতে-চিবোতে ঔৎসুক্য ভরে বললেন—বল তো শুনি। ওরা সকলেও শুনবে।

কুমারখালীর মা—শিবি ছিলেন এক বিরাট রাজা, তার রাজ্য ছিল বিতস্তা নদীর ধারে। রাজা শিবির সবসময় চেষ্টা, কেমন ক'রে প্রজাদের সুখী করা যায়। বিপন্ন হ'য়ে কেউ তার কাছে আসলে তখনই তিনি তার বিপদ মোচন ক'রে দিতেন। যেমন দয়ালু ছিলেন, তেমনি আবার শাসকও ছিলেন ভাল। তাই দুষ্টলোক তাঁকে খুব ভয় ক'রে চলতো। রাজা খুব ধার্ম্মিক ছিলেন, রাজ্যের

কল্যাণের জন্য যাগযজ্ঞ অনেক করতেন। একদিন শিবি রাজা যজ্ঞ করছেন, এমন সময় একটা পায়রা ভয় পেয়ে তাঁর কোলে এসে আশ্রয় নিল। তার পিছনে-পিছনে এসে হাজির হ'ল একটা ক্ষুধার্ত্ত বাজপাখী। পায়রাটা প্রাণের ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে রাজার কোলের ভিতর লুকিয়ে থাকল অর্থাৎ সে যেন রাজার আশ্রয় চাচ্ছে এমন ভাব।

রাজা পায়রাটাকে আদর ক'রে কোলের ভিতর রেখে গায় হাত বুলায়ে দিয়ে বললেন—ভয় কি বাছা! তুমি যখন আমার কাছে এসে পড়েছ, আমি তোমাকে রক্ষা করব।

এদিকে বাজপাখী এসে পায়রাটাকে দাবী করল, বলল—আমার শিকার আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

রাজা হাসতে-হাসতে বললনে—তা' কি হয় বাপু! ও যে আমার আশ্রয় নিয়েছে, আশ্রিতরক্ষণ রাজার ধর্ম্ম, আমি ওকে ছাড়ি কি ক'রে?

বাজপাখীও নির্ভয়ে জবাব দিল—মহারাজ! আপনি বিচারক, আমি আপনার কাছে সুবিচার পাবার আশা রাখি। ভগবান যেমন জীব সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাদের জন্য খাদ্যও সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, ঘাস, লতাপাতা, পশুপাখী ও মানুষ—সবই ভগবানের সৃষ্টি; কিন্তু আপনি তো জানেন, ছোট পাখীরা কীটপতঙ্গ ধ'রে খায়, বড় পাখীরা ছোট পাখীদের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে, গরু-ছাগল লতাপাতা-ঘাস খায়, আবার বাঘ-ভালুক-সিংহ ঐ গরু-ছাগল-হরিণের মাংসে প্রাণ ধারণ করে; মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, তারা লতা-পাতা-ঘাস, মাছ, পশু-পাখী কোনটাই বাদ দেয় না। যখন যা' প্রয়োজন, তখন তাই দিয়ে তারা ক্ষুধা মেটায় ও দেহ পুষ্ট করে। এটা প্রকৃতির নিয়ম, তাই ওর প্রতি দয়া করতে যেয়ে আপনি আমাকে আমার আহার হ'তে বঞ্চিত করেন কেন?

রাজা ধীরভাবে বললেন—ওকে মেরে খাওয়া যেমন তোমার দেহধর্ম্ম, ও আমার আশ্রয় নিয়েছে, ওকে বাঁচানও তেমনি আমার রাজধর্ম্ম। তাই তুমি ওকে ছেড়ে দাও। আর, তোমার ক্ষুধার শান্তির জন্য কোন্ মাংস চাও বল, আমি আনিয়ে দিই।

বাজটা হেসে বলল—অন্য মাংসে আমার রুচি নেই, তৃপ্তি হয় না। তাছাড়া অন্য মাংস জোগাড় করা সেও তো জীবহিংসা। একটাকে রক্ষা করবার জন্য আর একটাকে মেরে ফেলা, সেটা কি রাজধর্ম্ম?

রাজা ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়। এদিকে বাজপাখী তাড়া দিয়ে বলে—মহারাজ! ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়। আমি যদি আহার না পেয়ে আপনার সামনে মরে যাই, আপনার পাপ হবে, ধর্ম্মহানি হবে।

রাজা ব্যস্ত হ'য়ে জানতে চাইলেন পায়রা ছাড়া আর কোন্ মাংসে তোমার

রুচি আছে, কী পেলে তুমি পায়রাকে ছেড়ে দিতে পার, বল, আমি তাই দেব।

বাজপাখী বলল—পায়রার বদলে আপনি যদি নিজের শরীরের মাংস কেটে আমায় খেতে দিতে পারেন, তবেই আমি পায়রা ছেড়ে দিতে পারি।

রাজার শুনে আনন্দ হ'লো। হাজার হ'লেও তিনি পায়রাটাকে বাঁচাবার একটা পথ পেলেন। নিজের গায়ের মাংস কেটে দিয়ে যদি পায়রাটাকে বাঁচান যায়, সেই বা মন্দ কী?

চারিদিকে লোকে হায়-হায় করতে লাগল। রাজা কিন্তু একটুও ভয় পেলেন না। ছুরি দিয়ে নিজের ঊরুর মাংস কেটে দাঁড়িপাল্লার একদিকে দিলেন, অন্যদিকে সেই পায়রা।

কিন্তু যতই মাংস কাটছেন, পায়রার ওজনের সমান হয় না; তখন তিনি আনন্দে নিজেই পাল্লার উপর উঠে দাঁড়ালেন অর্থাৎ নিজের সমস্ত শরীরটাই বাজপাখীকে খেতে দেবেন।

সবাই আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো। রাজা, এ কী করলেন? একটা পায়রার জন্য মরতে বসলেন! আর পায়রাটাও কি বিশ্রী! আর জায়গা পেলি না। বসবি তো বসবি রাজার কোলে এসে বসলি! একটা পায়রা মরলে কি হয় রে? আর, বাজপাখীটারও বাহাদুরী। হয় পায়রা দাও, না হয় রাজার গায়ের মাংস কেটে দাও! যত সব অনাসৃষ্টি কান্ড!

এইসব জটলা হ'চ্ছে, হঠাৎ একি হ'লো! দেখা গেল বাজপাখীর বদলে দাঁড়িয়ে দেবরাজ ইন্দ্র, আর পায়রার জায়গায় স্বয়ং অগ্নিদেব—দুজনেই হাসিমুখে রাজাকে অভয় দিচ্ছেন। তাঁরাই এসেছিলেন রাজাকে পরীক্ষা করতে—রাজা শিবি শুধু নাম-যশের জন্য আশ্রিতকে রক্ষা করেন, না, প্রাণের সঙ্গে এই কর্ত্তব্য পালন করেন।

দেবতারা সন্তুষ্ট হ'য়ে রাজাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বর দিয়ে চলে গেলেন। সকলেই তাঁকে ধন্য-ধন্য করতে লাগল। জগতে তিনি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং অন্য সবাই এতসময় একমনে গল্প শুনছিলেন।

গল্প শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল। তবে কোন ভালই ভাল নয়, যদি তা' ইষ্টার্থী না হয়। ধর, একজন বিশ্বাসঘাতক তোমার আশ্রয় নিয়েছে, সে হয়তো বহুলোকের অনিষ্ট ক'রে ফিরছে। আশ্রিত রক্ষার অজুহাতে যদি তুমি তাকে ধরিয়ে না দাও, এবং সংশোধনও না করতে পার, তাতে কিন্তু তার ও পরিবেশের ক্ষতিই করা হবে, এমন-কি তোমার উপর সে যে-কোন সময় ছোবল মারতে পারে। তাই ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য বিচার করতে হয় ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে। ভীষ্ম যে দুর্য্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ অস্থিরবুদ্ধির উদ্ধাতা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে গেলেন, তাতে কিন্তু তাঁর

ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণই করা হ'লো। কারণ, ধর্ম্মের মূর্ত্তিই হলেন—পুরুষোত্তম, ইষ্ট বা আচার্য্য। তাঁকে বাদ দিয়ে ধর্ম্ম নেই। তাহ'লেই ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই—নিজেকেই হো'ক আর অন্যকেই হো'ক, সৎসংশুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে আর অস্তিত্বের অনুচর্য্যায় নিয়োজিত করতে হবে। আর, এই হ'চ্ছে ধর্ম্মদান ও ধর্ম্ম পরিপালনের গোড়ার কথা। আবার ধর্ম্মই হ'চ্ছে সবারই আশ্রয়।

২৮শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪৯ (ইং ২৩।৯।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে খেপুদার বারান্দায় দক্ষিণাস্য হ'য়ে একখানি বেঞ্চে ব'সে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হ'চ্ছে। যিনিই কাছে আসছেন, তাঁরই অন্তর এক উজ্জীবনী রসধারায় উচ্ছলিত হ'য়ে উঠছে।

প্যারীদা (নন্দী) এসে খবর দিলেন—মাঝে মনোরঞ্জনদার মেয়ে ভৈরবীর অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল। মনোরঞ্জনদা বাইরে ছিলেন, তিনি আসার সঙ্গে-সঙ্গে ভৈরবী যেন নূতন জীবন পেয়েছে। এখন কেমন হাসে, কথা কয়, heart (হৃৎপিন্ড) ও pulse (নাড়ী)-এর condition (অবস্থা)-ও অনেক ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই দেখ, মোক্ষম দাওয়াই কোনটা। Urge of libido (সুরত-সন্দীপনা) যত excite (প্রদীপ্ত) ক'রে তুলতে পারবে, ততই দেখবে, মানুষ কেমন তাজা, তরতরে হ'য়ে উঠছে। যত পার, মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার ইন্ধন জোগাও। ঐ-ই হ'লো universal tonic (সার্ব্বজনীন বলকারক ওষুধ)।

অমূল্যদা (দাস)—ঠাকুর! আমার ইচ্ছা ছিল, দীক্ষা নিলে প্রফুল্লর কাছ থেকেই নেব। আপনিও ওর নাম বলায় আমার মনে হয়েছে, আপনি আমাদের মনোজগতের সব খবর টের পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা যেমন কওয়ান তেমনি কই, যেমন করান তেমনি করি। যে যেমনতর impulse (সাড়া) দেয়, তার বেলায় কওয়া ও করাও আসে তেমনি। তোমরাও যদি পরমপিতার সঙ্গে যুক্ত থাক, তাহ'লে দেখবে, যখন ও যেখানে যেমনটি শোভন ও সমীচীন, তোমাদের চলা-বলা আপসে-আপ তেমনতর হ'তে থাকবে।

ভেলকু এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার্থিব স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে অনবদ্য কাব্যময় আদরের বোল ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো—বোটন সোণা! বোটন সোণা! বোটন সোণা! আমার সোণার টুনটুনি উড়ে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়! লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মেয়ে!

প্রসন্ন, প্রশান্ত দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ললিত মধুর ভঙ্গীতে চেয়ে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ভেলকুও খুশিতে টইটুম্বুর হ'য়ে উঠেছে।

এইবার বললেন—পড়াশুনো করছিস তো?

ভেলকু—করি একটু-একটু। পড়া আমার তেমন ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-ই তোকে পড়ায়, সে-ই তো কয়, মাথা আছে ভাল, একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই হয়।

বাইরে থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন আশ্রম দেখতে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভদ্রলোকদের দেখে প্রীত হ'য়ে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে বললেন—আপনারা কখন আইছেন? (ওদের বসবার জন্য বেঞ্চ দিতে ইঙ্গিত করলেন। দেবী-ভাই (চক্রবর্ত্তী) তাড়াতাড়ি একটা নীচু বেঞ্চ এনে দিলেন।) শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যগ্রভাবে বললেন—আপনারা বসেন।

ওরা আসন গ্রহণ ক'রে বললেন—এই আসছি। আমরা পাবনায় এসেছিলাম একটা কাজে, সেখান থেকে আসছি। আপনার আশ্রমের নাম শুনেছি কত, তাই একবার দেখতে আসলাম। আপনার সঙ্গেও দেখা হ'য়ে গেল। আমাদের ভাগ্য খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ভাগ্য ভাল, তাই পরমপিতার দয়ায় এখানে ব'সে আপনাদের দেখা পেয়ে গেলাম।

ওদের মধ্যে একজন বললেন—আমরা নগণ্য মানুষ, আমাদের দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কিছু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সশ্রদ্ধভাবে)—সে কি কথা? পরমপিতার রাজ্যে কেউ ফেলনা না, কেউ নগণ্য না। প্রত্যেকের ভিতর-দিয়ে তাঁর এক-এক বিশিষ্ট প্রকাশ, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন। তাই মানুষ দেখলেই আমার লোভ হয়, ভাল লাগে, কাছে রেখে দিতে ইচ্ছা করে।

ভদ্রলোক—এমন মধুর কথা কারও মুখে শুনিনি। আপনি মানুষকে ভালবাসেন, তাই আপনার কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বড় স্বার্থপর। কেবল নিজের স্বার্থ বাগাবার তালে থাকি। আমি দেখি, আপনাকে বাদ দিয়ে আমি নই, কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নয়। তাই নিজের সুখের জন্য সকলকে সুখী দেখতে ইচ্ছা করে, সুখী করতে ইচ্ছা করে। আপনি অসুখী থাকলে আমার সুখ সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, আবার আমি অসুখী থাকলেও আপনার সুখ সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

ভদ্রলোক—এ খুব বড় কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় কথাই হো'ক, ছোট কথাই হো'ক, এটা একটা বাস্তব কথা, যাকে বলে fact (বাস্তব তথ্য), এর মধ্যে কোন philosophy (দর্শন) নেই। এই fact (বাস্তব তথ্য)-টা আপনি যতখানি feel (বোধ) করেন ও তদনুযায়ী

actively (সক্রিয়ভাবে) চলেন যতখানি, আপনি ততখানি educated (শিক্ষিত)। আর, মানুষকে যদি educate (শিক্ষিত) করতে চান, সেও এই basis-এ (ভিত্তিতে)।

ভদ্রলোক—আপনার আশ্রমের উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আগের কথার মধ্যেই এর জবাব আছে। আমি বুঝি, আমি একলা বাঁচতে পারি না। আমার বাঁচতে গেলে, আমার পরিবেশ যা'তে বাঁচতে পারে, সে ব্যবস্থা আমার করতে হবে। পরিবেশশুদ্ধ বেঁচে থাকব, বেড়ে উঠব, সুখে থাকব, আনন্দে থাকব—এই আমার চাহিদা। শুধু আমার কেন, প্রতিটি সত্তারই বোধ হয় এই চাহিদা। তাই অনেকগুলি সমচাহিদা-ওয়ালা মানুষ জুটে গিয়ে যা' হবার তা' হ'চ্ছে। আমি আগে থাকতে কোন plan (পরিকল্পনা) ক'রে রাখিনি যে এই-এই করব। বাঁচাবাড়ার পথে যেমন-যেমন প্রয়োজন হ'চ্ছে, আশ্রম তেমন-তেমন evolve (বিবর্ত্তনলাভ) ক'রে চলেছে।

ভদ্রলোক—এ-কথা তো বোঝা যায়। তবে আপনার ভক্তরা অতো দীক্ষার কথা বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা নেওয়া মানে, দক্ষতা লাভের কৌশল জানা। সেই কৌশল জেনে নিয়ে তদনুযায়ী অনুশীলন করতে হয়। জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের প্রধান উপকরণও হ'লো প্রবৃত্তি, আবার, প্রধান অন্তরায়ও হ'লো প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিগুলি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অন্তরায় না হ'য়ে helpful (সহায়ক) হয় কিভাবে, তার কায়দা জানা যায় সদ্‌গুরুর কাছে। অস্তিত্বের ধারণ, পোষণ ও রক্ষণের তুক জানেন তিনি, তাই তাঁকে কয় সদ্‌গুরু। তাই দীক্ষা নেওয়া লাগে সদ্‌গুরু বা আচার্য্যের কাছে—যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন।

ভদ্রলোক—আপনাদের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে এত কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের আয়োজন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম যদি হয় সপরিবেশ বাঁচাবাড়া, তা'হলে বাঁচাবাড়ার জন্য যে-সব কর্ম্মের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা তো আপনাকে করতেই হবে। সকলকে দিয়ে সব কাজ হয় না, যার যেমন বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার, সে তেমনতর কাজ পারে ভাল। তাই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কাজের ব্যবস্থা রাখতে হয়। কাজগুলি যত সুষ্ঠু, দক্ষ ও ক্ষিপ্রভাবে করতে শেখে মানুষ, তত তার ability (যোগ্যতা)-ও বাড়ে, character (চরিত্র)-ও adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, আবার environment (পরিবেশ)-এরও service (সেবা) হয় তাকে দিয়ে। তাহ'লেই দেখুন এতরকমের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের কেন প্রয়োজন। আর, আমি আগেই তো বলেছি—এগুলি প্রয়োজনবশে evolve (বিবর্ত্তনলাভ) করেছে। পরে আরো কত প্রয়োজন হবে ও আরো কত জিনিস evolve (বিবর্ত্তনলাভ)

করবে, তার ঠিক কি?

ওরা বললেন—আপনার কথাগুলির মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। ধর্ম্মের আদর্শ যদি এমনতর হয়, সে ধর্ম্মকে মানতে কারও আপত্তি থাকতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচতে যদি চান, তবে ধর্ম্মকে মানতেই হবে। আর, শুধু মানা নয়, আচরণ করতে হবে।

ওদের মধ্যে একজন বললেন—আমরা একটু আশ্রমটা ঘুরে দেখব। যদি কেউ আমাদের সঙ্গে থাকতেন তাহ'লে ভাল হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর আশুকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—দাদাদের সঙ্গে যা তো। ওদের আশ্রমটা ঘুরে দেখা।

ওরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওদের পানে। বললেন—আবার এদিকে আসলে আসবেন।

একজন বললেন অবশ্য আসব, অবশ্য আসব। আজকের দিনের কথা কখনও ভুলব না। এখানে না আসলে আমরা বঞ্চিত হতাম। আমরা আশ্রমে ঢুকে কয়েকটা জায়গায় আপনার কয়েকটা বাণী দেখলাম, প্রত্যেকটি বাণীর মধ্যে একটা মৌলিকতা আছে, আছে বাস্তব জীবনের সঙ্গে একটা গভীর যোগ। তারপর আপনার মুখে কিছু উপদেশও শুনলাম, এগুলি আমাদের চলার পাথেয় হ'য়ে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিনীতভাবে) দ্যাখেন, আমি লেখাপড়া জানি না। উপদেশ দেবার মতো জ্ঞান, বিদ্যে, বুদ্ধিও আমার নেই। আর, উপদেশ হিসাবে আমি বলিও না কিছু। আমার নিজের জীবনে যা' কুড়িয়ে পেয়েছি, নিজের গরজেই তা' সবাইকে কই। আমি এক বুঝ সার বুঝে রেখেছি—পরিবেশের ভাল না করলে আমার ভাল থাকার জো নেই।..............আপনারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, আমি বসে আছি, এ কেমন ভাল লাগে না। আপনারা বরং বসেন, গল্প-টল্প করি। দুপুরে এখানে যা' হয় আনন্দবাজারে দুটো ডাল-ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে যাবেন। এর মধ্যে একবার ফাঁক মতো আশ্রম ঘুরে দেখবেন।

উক্ত ভদ্রলোক আমরা থাকতে পারলে আমাদেরই লাভ হ'তো। আপনার সঙ্গ এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু আজ দুপুরেই আমাদের যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আশুকে) তাহ'লে যা', দাদাদের সঙ্গে নিয়ে যা।

ওরা যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লোকগুলি ভাল। কতকগুলি লোক দেখলে প্রাণ খুলে যায়, আপনা থেকে কথা বেরোয়। আবার, কতকগুলি লোক দেখলে চুপ ক'রে থাকতে ইচ্ছা করে, কথা যেন জোগায় না।

বহিরাগত একটি দাদা কাতরভাবে বললেন—ঠাকুর! আমি বড় বিপদে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী বিপদ?

উক্ত দাদা—আমার শত্রুপক্ষ একটা ডাকাতি ব্যাপারে মিথ্যা ক'রে আমাকে আসামী সাব্যস্ত করেছে। আমাকে তাই arrest (গ্রেপ্তার) করেছিল। অনেক কষ্টে bail (জামিন) নিয়ে আমি এখানে চ'লে এসেছি। আমার মাথা ঠিক নেই। এখন আমার কী করতে হবে ব'লে দেন। আমার জাত, মান সব গেল। আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দার কত সুনাম ছিল, শেষটা এই মিথ্যা মামলার ফলে লোকে আমাকে জানবে ডাকাত ব'লে। আমি ভাবতে পারছি না। ঠাকুর! আপনি আমাকে বাঁচান! আমি আপনার সন্তান। পূর্ব্ব কর্ম্মফলে আমার যদি কোন শাস্তি প্রাপ্য থাকে, আপনি নিজহাতে আমাকে শাস্তি দেন। এইরকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমার সহ্য হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ওরে পাগল! ঘাবড়াস ক্যা? ঝড়ঝাপটা বড় গাছেই লাগে। আর, যত ঝড় খায়, তত তার শিকড়ও শক্ত হয়। বিপদে তোর করবি কী? তুই হলি সাচ্চা মানুষ, কোন দোষ তো করিসনি, তাই তোর ভাবনা কী? আর দুর্নামের ভয় যা' করছিস, শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পাবি, তুই যদি খাঁটি হোস, তোর দুর্নাম ধুয়েমুছে যাবে, বরং যারা মিথ্যা দুর্নাম ছড়াচ্ছে, তাদেরই দুর্নাম রটে যাবে সমাজে। বিপদ যতই আসুক, পাড়ি দিয়ে উঠবি। তাতে দেখবি, বিপদই তোকে বড় ক'রে দেবে। তবে একটা জিনিস ভেবে দেখা ভাল—তোমার শত্রুপক্ষ এমন করলো কেন? তাদের সঙ্গে ব্যবহারে নিজের যদি কোন flaw (ত্রুটি) থাকে, সেটা সম্বন্ধে পরে সাবধান হ'য়ে চলা লাগে। শুধু তাদের সম্পর্কে নয়, অন্যের সম্পর্কেও। তারা যদি খুব দুষ্টপ্রকৃতিরও হয়, তাহ'লেও এমন প্রস্তুতি নিয়ে সজাগ হ'য়ে চলতে হয়, যা'তে তারা তোমার ক্ষতি করতে না পারে। আর, পরিবেশের কাউকে ignore (উপেক্ষা) করতে নেই, মানুষগুলি যা'তে তোমার হাতে থাকে, সেবা ও সদ্ব্যবহার দিয়ে তার ব্যবস্থা করা লাগে। আবার পরাক্রমী ও কৌশলীও হওয়া চাই। নিপাট ভদ্রলোক হ'য়ে থাকলে সবরকম লোক নিয়ে চলা যায় না। যত মানুষের উপর আধিপত্য লাভ করবে, তোমার ব্যক্তিত্বও তত বড় হ'য়ে উঠবে। আধিপত্য মানে ধারণ, পালন। কিন্তু নিছক নিজের জন্য যদি এটা করতে যাও, সব ভেস্তে যাবে। ইষ্টের দিকে চেয়ে, তাঁর ইচ্ছাপূরণার্থে অর্থাৎ সকলের শুভার্থে যদি এটা কর, তাহ'লে দেখবে, মানুষ তোমার অধীন হ'য়ে সুখী হবে। এতে কেবল তুমি যে বিদ্ঘুটির হাত থেকে রেহাই পাবে, তা' নয়, এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারবে যা'তে শয়তান নিরস্ত হ'তে বাধ্য হবে, কাউকে আর তোমার মতো অযথা

suffer (কষ্ট) করতে হবে না। তাই তো কই, যাজন কর, সতের শক্তি বৃদ্ধি কর, অসৎকে আসকারা দিও না। এত কথা কচ্ছি—কিন্তু তোমার বিপদ কেটে গেলে তুমি সব ভুলে যাবে। এই বিপদ যদি তোমাকে সজাগ ক'রে তোলে যে তোমার ও তোমার পরিবেশের নিরাপত্তার জন্য তোমার কী করণীয়, আর তা' যদি তুমি কর, তাহ'লে এই বিপদই মহামঙ্গলের কারণ হ'তে পারে। আমি এইভাবেই জিনিসগুলিকে দেখি ও বুঝি। তুমিও ভেবে দেখো এবং যা' ভাল মনে লয়, ক'রো।..............পরিবেশকে যদি তুমি ঠিক ক'রে নিতে পার, তাহ'লে দেখবে, তোমার উপর কোন অত্যাচার, অবিচার হ'লে পরিবেশই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। তোমার নিজের সাফাই তোমাকে গাওয়া লাগবে না। আর, এ কত মিষ্টি। অবশ্য এর জন্য অনেকখানি করা থাকা চাই।........... আপাততঃ দেশে ফিরে গিয়ে একজন ভাল উকিল ঠিক ক'রে তার পরামর্শ মতো ব্যবস্থা কর। স্থানীয় ঋত্বিক্ ও সৎসঙ্গীদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখো। এই-সময় অনেক দুষ্টলোক দু'পয়সা বাগাবার মতলবে বন্ধু সেজে এসে নানারকম ফন্দী-ফিকির বাতলাবে। সেদিক দিয়ে সাবধান থেকো। কাকে কতটুকু বিশ্বাস করবে বা করবে না ভেবে-চিন্তে ক'রো। আর, মাঝে-মাঝে এখানে চিঠি দিও।

দাদাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন—আপনি যা' বললেন, সেইভাবে চলবার চেষ্টা করব। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যা'তে বিপদ কেটে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' করতে বললাম সেই তো আমার আশীর্ব্বাদ, এই আশীর্ব্বাদকে কাজে লাগান বা না লাগান তোমার ইচ্ছাধীন।

উক্ত দাদা—আমি জানি—আপনার দয়া ছাড়া কিছুই হবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—পরমপিতার দয়া আছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আঙ্গুলে একটা নখের কোণা লাগতেই বললেন—প্যারীকে ডাক তো। নখটা কেটে দিক। নরুণটা নিয়ে আসতে বলিস।

দেবুভাই (বাগচী) তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন প্যারীদাকে ডাকতে।

প্যারীদা ডিসপেন্সারীতে ছিলেন। তাড়াতাড়ি নরুণ নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণভাবে বললেন—আমার পেটটা তো এখনও ঠিক হ'লো না। কী করি, বল তো?

প্যারীদা—ওষুধ তো দিচ্ছি। এতে তো কাজ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যের বেলায় আমি ব্যবস্থা দিতে পারি, কিন্তু নিজের বেলায় আমার কিছুই মনে আসে না।

একটি ভাই কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে বি-এস-সি পড়েন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! কিভাবে পড়লে পড়াশুনা ভাল বোঝা যায় এবং

ভালভাবে মনে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'-কিছু পড়, তার একটার সঙ্গে আর-একটার connection (যোগসূত্র) কী, সেটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা ক'রো। যেমন Physics-এ (পদার্থবিদ্যায়) heat (তাপ), light (আলো), electricity (বিদ্যুৎ), sound (শব্দ) ইত্যাদি হয়তো পড়ছ, বুঝতে চেষ্টা ক'রো, এগুলির একটার সঙ্গে অন্য প্রত্যেকটার কী সম্পর্ক। আবার, Physics (পদার্থবিদ্যা)-এর সঙ্গে Chemistry (রসায়নশাস্ত্র)-এর কী সম্পর্ক, তা'ও ভেবে দেখো। আবার, Physics (পদার্থবিদ্যা), Chemistry (রসায়নশাস্ত্র)-এর সঙ্গে Mathematics (অঙ্ক)-এর যোগাযোগ কী, তা'ও ভেবে দেখো। বাস্তব ব্যবহারিক জীবনে এর কোন্‌টার কার্য্যকারিতা কী তা'ও খিইয়ে দেখো। যা' পড় তা' লিখবে, আর নিজে যে জিনিসটা বুঝলে তা' সাধারণ-মাথাওয়ালা একটা অশিক্ষিত লোককেও বোঝাতে পার কিনা, চেষ্টা ক'রে দেখবে। অশিক্ষিত লোকের কথা এইজন্য বলছি যে, তাকে বোঝাতে গিয়ে তুমি ঠিক পাবে, technicality (কারিকুরি) বাদ দিয়ে তোমার সহজ বুঝ কতটা হয়েছে। আর, শুধু science (বিজ্ঞান)-এর বই নিয়ে যদি থাক, তাহ'লে কিন্তু একঘেয়ে হ'য়ে যাবে। তাই মাঝে-মাঝে arts (কলা), literature (সাহিত্য) ইত্যাদিও পড়বা। তা'তে science (বিজ্ঞান)-এর একটা artistic interpretation (কলাসম্মত ব্যাখ্যা) দিতে পারবা। Science (বিজ্ঞান)-টা আরো interesting (মনোরম) লাগবে তোমার কাছে। এইভাবে যদি পড়, তবে সে পড়া মজ্জায় মিশে যাবে, কিছুতেই ভুলবা না। যেমন নিঃশ্বাস নিতে কিছুতেই ভুল হয় না। এইভাবে শিক্ষা হ'লে চলনার ধাঁচই উন্নত হ'য়ে উঠবে। অনুসন্ধিৎসা ও মননশীলতার অনুশীলন তোমার সাথের সাথী হ'য়ে থাকবে। ডিগ্রী পেয়েই মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাবে না। আমার ইচ্ছা করে, শিক্ষা কাকে বলে তার একটা model (নমুনা) দেখায়ে দিয়ে যাই। কিন্তু মানুষেরই অভাব। লেখাপড়া শিখে তোরা যদি এসে লাগিস, তাহ'লে হয়। একলা আসলে হবে না, আরো ভাল-ভাল ছেলে জোগাড় করবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বেঞ্চের উপর পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়ে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে বসেছেন, বাম হাতখানি প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন পেছন (উত্তর) দিককার হাতলের উপর দিয়ে, পিঠটা ঠেকিয়ে রেখেছেন পশ্চিম দিককার হাতলে। অপূর্ব্ব মনোমোহন ভঙ্গীতে ব'সে আছেন আপন আনন্দে মসগুল হ'য়ে। চোখে তাঁর দিব্য বিভা, মুখে বিকশিত শতদলের ফুল্লদ্যুতি। দেখে অন্তরে সুখের হিল্লোল জাগে। জ্বালা-যন্ত্রণার অনেকখানি উপশম হয়। ঝির-ঝির ক'রে শান্তির সুবাতাস বইতে থাকে প্রাণে।

ভবানীদা (সাহা) খবরের কাগজ পড়তে নিয়ে এসেছেন। কংগ্রেসের

আগষ্ট-আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে নানাস্থানে নানারকম হাঙ্গামা হ'চ্ছে, তার খবর বেরিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ভিতর-দিয়ে লাভ কতখানি হয় বুঝতে পারি না। লোকের অভ্যাস একবার খারাপ হ'য়ে গেলে পরে তাদের বাগ মানানই কঠিন হ'য়ে পড়ে। কেবল ভাঙ্গতে যদি শেখাই, গড়তে যদি না শেখাই, তবে ঘরে-বাইরে তারা গড়া জিনিসগুলি ভাঙ্গবে, কিন্তু ভাঙ্গা জিনিসগুলি জোড়া লাগাতে পারবে না। ইংরেজ এ-দেশ ছেড়ে গেলেও যেতে পারে, কিন্তু এ-স্বভাব আমাদের ছাড়বে না।

কালীদা (সেন)—কিন্তু লোকের মধ্যে যে দেশাত্মবোধের জাগরণ হয়েছে, তার প্রশংসা তো করতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও অনেক বড় কথা। পরিবারের পাঁচজনের সুখ-দুঃখকেই আমরা নিজের মতো ক'রে ভাবতে পারি না, আর, সমস্ত দেশকে, দেশের সমস্ত লোককে নিজের মতো ক'রে ভাববো, সে অনেক দূরের কথা।

প্রফুল্ল—এ বিষয়ে স্বামীজীর অতি সুন্দর কথা আছে 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইয়ের ভিতর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী বল তো।

প্রফুল্ল—বইটা নিয়ে আসবো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল।

বইটা নিয়ে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পড় দেখি।

'আমার সমরনীতি'—অধ্যায় থেকে পড়া হ'লো—

"লোকে স্বদেশহিতৈষিতার কথা বলিয়া থাকে। আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎকার্য্য করিতে হইলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ (১) হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েকপদ অগ্রসর করে মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে,—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে-প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি-কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে-প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি-কোটি ব্যক্তি শত-শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে-প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে?

এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায়-শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও, তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।..............মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে-প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দ্দশা প্রতিকারের কোন (২) উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি? কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্ন-বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ?..............তোমাদের কি এইরূপ (৩) দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্ব্বতের গুহায় যাইয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্ব্বত-প্রাচীর পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বাহির হইবে। হয়তো শত-শত বর্ষ ধরিয়া উহা কোন আশ্রয় না পাইয়া সূক্ষ্মাকারে সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু একদিন না একদিন উহা কোন না কোন মস্তিষ্ক আশ্রয় করিবেই করিবে। তখন সেই চিন্তানুযায়ী কার্য্য হইতে থাকিবে। অকপটতা, সাধু অভিসন্ধি ও চিন্তার শক্তি অসামান্য।"

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখ, দেশের কল্যাণের জন্য কতখানি তপস্যা লাগে। ....তবে আমার মনে হয়, চিন্তা যতই উদার, মহৎ ও গভীর হো'ক না কেন, চিন্তানুযায়ী সাধ্যমত কাজ না করলে, ধীরে-ধীরে একটা চিন্তার বিলাসিতা পেয়ে বসে মানুষকে। ওতে মানুষের normality (স্বাভাবিকতা) ব্যাহত হয়। পাগলাটেও হ'য়ে উঠতে পারে। করা, বলা, ভাবার সামঞ্জস্য যতখানি হয়, মানুষ ততখানি খাঁটি হয়, নির্ভরযোগ্য হয়। নচেৎ কপটতা ও কৃত্রিমতা ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়।

সোণাদা (রায়) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন কি রে! কী খবর?

সোণাদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বঙ্কিম কী করে?

সোণাদা—এইদিকে কোথায় কি করছে। বাড়ীতে তো বড় থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সারা আশ্রমই তো ওর বাড়ী। যার যেখানে অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ, দেখো গিয়ে বঙ্কিম হাজির সেখানে। আবার, কখন যে কার জামা-কাপড় টেনে নিয়ে পরবে, তার ঠিক নেই। কেউ কিছু বললে হাসতে থাকবে। বেশ আছে ভাল। আগের থেকে এখন অনেকটা হুঁশিয়ার হইছে। ভাবে, কোথায় কার কাছে কি হোক খাবে। (সকলের মৃদুহাস্য) আগের দিন তো আর নেই। যেন সকলে মিলে একটা সংসার। তখন খাবার কষ্ট ছিল, পরবার কষ্ট ছিল, শোবার কষ্ট ছিল। কিন্তু ঐ কষ্টের মধ্যে যে প্রাণের প্রাচুর্য্য ছিল, তার তুলনা হয় না। তাই রোগ, ব্যাধি, মৃত্যুও কম ছিল। কম ছিল কি, প্রথম বহুদিন পর্য্যন্ত তো কোন মানুষ মরেইনি। কানাই যখন মারা গেল, তখন মানুষের মনে রীতিমত প্রশ্ন জাগলো—আশ্রমে মৃত্যু হ'লো কেন? তখন যে আন্তরিকতা ছিল সত্যিই বড় মিষ্টি। একজনের কাপড় ময়লা হ'লে কে যে কোন ফাঁকে কেচেকুচে পরিষ্কার ক'রে রেখে যেত, তা' ঠাওর পাওয়া যেত না। আজ একজনের অসুখ-বিসুখ হ'লে সব সময় সেবা-শুশ্রূষা করবার লোক জোটে না, কিন্তু তখন কারও তেমন অসুখ-বিসুখ করলে এতলোক এসে খোঁজখবর নিত, সেবা-শুশ্রূষা করবার আগ্রহে ভীড় করত যে নোটীশ টাঙ্গিয়ে দেওয়া লাগত।

উপস্থিত সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। সোণাদাও দাঁড়িয়ে আছেন, কথা শেষ হ'লে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

মণিদা, অজয়দা ও সত্যদা এই তিনজন নব দীক্ষিত দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ভাটপাড়া থেকে এসেছেন কেশবদা (রায়)। ওরা সবাই এসে প্রণাম ক'রে মাটিতে উপবেশন করলেন। কেশবদা সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছেন সবাইকে। মুখে মৃদুমধুর হাসি।

ধীরে-ধীরে কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন লোক জোগাড় কর। দু'রকম মানুষ আছে, এক mobile man (চালালে চলতে পারে, এমন মানুষ) আর এক motile man (নিজে থেকে চলে ও অন্যকে চালাতে পারে, এমনতর মানুষ)। যেমন গাড়ী আর automatic (স্বয়ংক্রিয়) ইঞ্জিন। গাড়ীকে চালালে চলতে পারে, আর ইঞ্জিন নিজে থেকে চলতে তো পারেই, তা'ছাড়া অনেক গাড়ী চালিয়ে নিতে পারে। কর্ম্মীর জন্য তাই চাই এমনতর ইঞ্জিন ধরণের মানুষ। মানুষের মধ্যে জড়তা এসে গেছে, তাদের চালিয়ে-চালিয়ে নিয়ে চালু ক'রে দিতে হবে। গাড়ী ও ইঞ্জিনের উপমা যা' দিলাম ওটা কিন্তু মানুষের বেলায় পুরোপুরি খাটে না। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই অনেক কিছু possibiltiy (সম্ভাবনা) র'য়ে

গেছে। আজ যাকে চালিয়ে নেওয়া লাগছে, দুদিন বাদে সে হয়তো এমন সচল হ'য়ে উঠবে যে নিজে তো চলবেই, আবার অপরকেও চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে। তাই মানুষ একাধারে যেমন mobile (পরিচালনীয়), তেমনি motile (গতিশক্তি-বিশিষ্ট), যেমন ব্যাটারী, তেমনি dynamo (তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র)। তোমাদের কাজ হ'লো mobile (পরিচালনীয়) মানুষ-গুলিকে motile (গতিশক্তিবিশিষ্ট) মানুষে রূপান্তরিত করা। .... প্রত্যেকটা মানুষের ভিতর যেমন আছে ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব, তেমনি আছে সমষ্টিব্যক্তিত্ব। প্রত্যেকের মধ্যে তার মতো ক'রে সমষ্টিব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনা আছেই। সবার স্বার্থে স্বতঃই স্বার্থান্বিত এমনতর মানুষ যিনি, তাঁর মধ্যে সমষ্টি-ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে বলা চলে। তাঁর প্রতি ঠিক-ঠিক অনুরাগ হ'লে প্রত্যেকের মধ্যে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সমষ্টিব্যক্তিত্বের জাগরণ হয়। (কালীদার দিকে চেয়ে বললেন)—দেশাত্মবোধের কথা যে বলছিলে, তার জন্যও এই জিনিসটি চাই। তাই আমি বলি— আগে আদেশকর্ত্তার প্রতি আনুগত্যবোধ, তারপর দেশাত্মবোধ।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় যতীনদা (দাস) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— বসেন যতীনদা।

যতীনদা বসলেন।

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— অনুলোম অসবর্ণ বিয়ে যদি হ'তে থাকে, তবে দেশের মধ্যে বহুমুখী বিচিত্র গুণসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হ'তে থাকবে। যেমন বিপ্রের সঙ্গে যদি ক্ষত্রিয়-কন্যার বিবাহ হয়, তাহ'লে তাদের সন্তানের মধ্যে উভয় বর্ণের গুণের সুষ্ঠু সমাবেশ দেখা যাবে। এমনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে Sub-class (উপশ্রেণী) যেগুলি হবে, তাদের বিয়ে-থাওয়া যা'তে বিধিমত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অসবর্ণ, অনুলোমজাত সন্তানদের উপাধি লেখার বেলায় পিতৃবংশের উপাধির পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে নিজের শ্রেণীর পরিচায়ক কথা উল্লেখ করা দরকার, যেমন 'মূর্দ্ধাবিসিক্ত', 'অম্বষ্ঠ' ইত্যাদি। নচেৎ শুধু পিতৃ-উপাধি যদি লেখে, কালে-কালে ওর ভিতর দিয়ে প্রতিলোম ঢুকে যেতে পারে। ....অনুলোম-অসবর্ণ বিবাহ যদি হ'তে থাকে তাহ'লে বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণী আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে উঠবে।

একটি দাদা বললেন—প্রতিলোমেও তো এটা হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিলোম-সন্তান বাবা ও মায়ের কা'রও বৈশিষ্ট্য পায় না। সবই খোয়ায় সে। অপকার ছাড়া কোন উপকারে লাগে না। সবার অপকার যদি কাম্য হয়, তবে প্রতিলোম এস্তার দাও না! প্রতিলোমের ফল কী হয়,

সেটা animal breeding (পশু প্রজনন)-এর report (বিবরণ) যদি দেখ, তাহ'লেই টের পাবে।

২৯শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৯ (ইং ১৪।৯।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃ-মন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। বেশী লোকজন নেই, সেবকদের মধ্যে দুই একজন কাছে আছেন। চট্টগ্রাম থেকে একটি দাদা এসেছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বললেন—ঠাকুর! আমার বন্ধু-স্থানীয় একজন গত পৌষ মাসে আমাকে এসে বলে—'তোমার তো ৪।৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে, তা'তে সুদই বা কত পাও, আমাকে দু'হাজার টাকা দাও, আমি একটা ব্যবসা করি, মাসে শতকরা ৫৲ টাকা ক'রে সুদ দেব তোমাকে।' আমিও ভেবে দেখলাম, মাসে শতকরা ৫৲ টাকা সুদ যদি দেয়, তাহ'লে দু'হাজার টাকার সুদ বাবদ প্রতিমাসে ১০০৲ টাকা ক'রে পাব, তা' যদি পাই, এই দুর্মূল্যের বাজারে আমার বেশ ভালভাবে চ'লে যাবে। সংসার খরচের জন্য গচ্ছিত টাকা ভাঙা পড়বে না। টাকাগুলি খরচ হ'লেও মুশকিল, রেখেছি মেয়ের বিয়ের জন্য। সবদিক ভেবে বললাম—'টাকা আমি দিতে পারি, কিন্তু তারজন্য তোমাকে সোনার গহনা বন্ধক রাখতে হবে।' তা'তে সে বলল 'সোনার গহনা বন্ধক রাখার সামর্থই যদি আমার থাকবে, তাহ'লে এত সুদ দিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে যাব কেন? ব্যাঙ্ক থেকে তো অনেক কম সুদে টাকা নিতে পারতাম। আমি তোমার ছেলেবেলার বন্ধু, আমাকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পার না? তোমার এত ছোট প্রাণ কেন? না দাও, না দিলে। এটা জেনে রেখো, আমার টাকা যোগাড় করতে আটকাবে না। ভেবেছিলাম, অন্যের কাছ থেকে না নিয়ে তোমার কাছ থেকে নিলে সুদ বাবদ যা' দেব, তা'তে তোমার অনেকখানি সাশ্রয় হবে। যাক, তুমি যখন সে সুযোগ নিতে চাও না, আমি অন্য জায়গা থেকেই টাকা নেব। তোমার যখন এত সন্দেহ, তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া ঠিক হবে না।' তার কাছে ঐ কথা শুনে আমার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। ভাবলাম সত্যিই তো! বাল্যবন্ধুকে দু'হাজার টাকা দিয়ে বিশ্বাস করতে পারব না! আমার মন তো আগে এত সন্দিগ্ধ ছিল না! আবার একশ' ক'রে টাকা প্রতিমাসে পাব, লোভও হ'তে লাগল। প্রকাশ্যে ব'লে ফেললাম 'তোমার কাছে বন্ধক রাখার কথা বলা আমার ঠিক হয়নি। যাহো'ক টাকা আমি দেব। তুমি কিন্তু প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহেই আমাকে সুদের টাকা দিয়ে দিও।' সে বলল 'যুদ্ধের বাজার, কন্ট্রাক্টরদের কাঠ সাপ্লাই (সরবরাহ) করব, ভগবান মুখ তুলে চাইলে, একশ' টাকা তোমাকে তো দিতে পারবই, কিন্তু বেশী দিতেও আটকাবে না।..............যাহো'ক টাকা যদি দাও,

তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই দিও।' আমি বললাম—'আচ্ছা!' বাড়ীতে এসে আমার স্ত্রীকে সব কথা বললাম। সে বলল—'গয়না যদি বন্ধক না রাখে, তবে জমি বন্ধক রাখুক। কিছু বন্ধক না রেখে অত টাকা দিও না। পরে পস্তাতে হবে।' ভেবে দেখলাম—কথাটা ঠিক, কিন্তু পরক্ষণে মনে হ'লো—ওকে যে কথা দিয়ে ফেলেছি। এরপর জমি বন্ধকের কথাই বা বলব কি ক'রে? বা টাকা দেব না, সে কথাই বা বলব কি ক'রে? স্ত্রীকে বললাম—'সব লোকের সম্পর্কে সব কথা খাটে না। হরপ্রসাদ খুব সৎলোক। সে আমাকে কখনও ফাঁকি দেবে না।' স্ত্রী বলল, 'তা' বুঝলাম, তবু সাবধানের মার নেই।' রেগে গিয়ে স্ত্রীকে বললাম—'তুমি আমার চেয়ে বেশী বোঝ নাকি?' সে নরমভাবে বলল—'আমাদের সকলের বুঝেই ভুল থাকতে পারে। তাই ঠাকুরের কাছে চিঠি লিখে জান না, তিনি কী করতে বলেন!' আপনার কথা বলায় একটুখানি ভাবিত হলাম, পরক্ষণেই নিজের ভুল সমর্থনের তাগিদে বললাম—'ঠাকুর কথা খেলাপ করতে বারণ করেছেন, আমি হরপ্রসাদকে টাকা দেব ব'লে কথা দিয়েছি, তাকে টাকা না দিলে ঠাকুরের নির্দেশ লঙ্ঘন করা হবে। টাকা আমি দেবই। তুমি এ নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রো না।' স্ত্রী অগত্যা চুপ ক'রে গেল। আমি টাকা দিয়ে দিলাম। উদারতা দেখাবার উদ্দেশ্যে কোন লেখাপড়ার মধ্যে পর্য্যন্ত গেলাম না। টাকা নিয়ে সে প্রথম মাসে ১০৫৲ টাকা দিয়েছিল, ৫ টাকা বেশী দিয়ে বলেছিল, 'ছেলেপিলেদের মিষ্টি কিনে দিও।' ৫ টাকার মিষ্টি ও একশ' টাকার করকরে নোট স্ত্রীকে দিয়ে বলেছিলাম—'তুমি তো কত সন্দেহ করেছিলে! এখন দেখলে তো? আমার বন্ধু অবিশ্বাসের পাত্র নয়। আর, আমিও তাকে টাকা দিয়ে ভুল করিনি।' স্ত্রী বিরসভাবে বলল—'আমি কি বলেছি—ভুল করেছ?'..............সেই একবার যা' দিয়েছে, তারপর আর উপুড়হস্ত করেনি। যখনই যাই, নানা অজুহাত দেয়। এখন সে অনেক টাকার মালিক। মেজাজ বদলে গেছে। আজকাল দেখাই করতে চায় না।.................আমি এখন কী করব ঠাকুর? স্ত্রী ঠাট্টা ক'রে বলে—'তুমি তো ভুল করনি, বিশ্বাসী বন্ধু তোমায় হয়তো একদিন পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক লিখে দেবে। একসঙ্গে টাকাগুলি পেলে ভালই হবে।' আমি এখন বেকুব বনে গেছি।.............. এই ব'লে দাদাটি হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দাদাটির দিকে চেয়ে কেবলই হাসতে লাগলেন। নির্ম্মল-উজ্জ্বল সে হাসি। হাসির পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে স্নেহ, প্রীতি ও জ্ঞানের সঞ্জীবনী লীলালাস্য। হাসির তরঙ্গে তাঁর সারা শরীর অনুপম ভঙ্গীতে দুলে-দুলে, ফুলে-ফুলে উঠছে। তাই দেখে দাদাটির মুখখানিও তার অজ্ঞাতে হাস্যসরস হ'য়ে উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বললেন—তুই যদি টাকাটা দান ক'রে দিতিস, তাহ'লে আমার কোন দুঃখ ছিল না। তুই যে বোকার মতো ঠকে গেলি, তা'তেই আমার আপসোস হয়। ধ'রে রাখ, টাকা আর পাবি না। এর ভিতর-থেকে তোর শিক্ষা যদি হয় ও ভবিষ্যতে যদি সাবধান হোস, সেইটেই মন্দের ভাল। যে-যে প্রবৃত্তির ফলে এই ব্যাপারটা ঘটলো, সেই প্রবৃত্তিগুলির রূপ যদি ধরা প'ড়ে থাকে তোর কাছে, সেগুলি যদি তোকে আর ফাঁকি দিতে না পারে, তাহ'লে বিপুল লাভেরও অধিকারী হ'তে পার কালে-কালে। এই টাকার ক্ষতি হয়তো পূরণ হবে না, কিন্তু টাকার চাইতে অনেক মহার্ঘ বস্তু যা' হয়তো খোয়া যেতে পারতো, তা' হয়তো রক্ষা পাবে। তাই হুঁশিয়ার হ'লে হতাশ হবার কিছুই নেই। তোমার কথা থেকে মনে হ'লো, কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে তোমার ভুল ভাঙ্গেনি। তুমি গহনা বন্ধক রাখার কথা বলায় তোমার বন্ধু বলেছিল, "আমাকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পার না? তোমার এত ছোট প্রাণ কেন?" এতে তুমি দমে গিয়েছিলে, ভেবেছিলে, বন্ধক রাখার কথা প্রস্তাব করা সমীচীন হয়নি। সেটা তোমার meanmindedness (ছোটমন)-এর পরিচায়ক। ওকথা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। যেখানে তুমি দান করছ না, টাকা ফেরত চাও, সেখানে এমন ব্যবস্থা করাই উচিত যা'তে টাকাটা মারা না পড়ে। সোনার গহনা বন্ধক রাখার কথায় ভদ্রলোক যখন অতো চটে গেল এবং বিশ্বাসের দোহাই পাড়তে লাগলো, তখনই তোমার ধ'রে নেওয়া উচিত ছিল, লোকটা সন্দেহযোগ্য। অমনতর বিশ্বাসের দাবী ও দোহাই দুইটিই সন্দেহযোগ্য। কোন লোককে যদি বাজার করতে দাও এবং সে যদি নিজে থেকে হিসাব না দেয় কিংবা হিসাব চাইলে চটে যায়, তখন সাধারণতঃ বুঝে নিতে পার—কোন গোলমাল আছে। এককথায় টাকা-পয়সা লেন-দেনের ব্যাপারে যেখানে যেটা করণীয়, তা' করতে যে নারাজ, ধ'রে নিও—তার মধ্যে চৌর্য্যবুদ্ধি বা অকৃতজ্ঞতা হামাগুড়ি দিয়ে আছে। অনেকে আছে, এখান থেকে সাহায্য নেবে, কিন্তু খাতায় নাম সই করতে বললে অপমানিত বোধ করবে। এ-সব লক্ষণ ভাল নয়। চৌর্য্যবুদ্ধির বহু সূক্ষ্ম রকমারি থাকে। তোমার কাছে কলকাতা থেকে একজন কুড়িটা টাকা পাঠিয়ে হয়তো কুপনে লিখে দিল, তোমার প্রাপ্য দশ টাকা নিও ও বাকী দশ টাকা অমুককে যথাসত্বর দিও। তুমি তাকে বললেও না বা টাকাটা দিলেও না, নিজের প্রয়োজনে খরচ করলে, একমাস পরে দশটা টাকা দিয়ে বললে—এই নাও, তোমার টাকা, কিছুদিন আগে এসেছিল, দিতে ভুলে গেছি। সে ভদ্রতা ক'রে বলবে—তাতে আর কি হয়েছে? কিন্তু এ-ও চৌর্য্যবুদ্ধির এক নমুনা। কোন-কোন কর্ম্মচারী আছে—মনিবকে ফাঁকি দেয় না, কিন্তু মনিবের কিছু-কিছু টাকা কায়দা ক'রে নিজের কাছে গচ্ছিত রেখে দেয়, নিজের কাজে খাটায়, সব হিসাব পরিষ্কার ক'রে দেয় না, কিন্তু হালখাতার আগে হয়তো

সব জিনিসের বুঝ ঠিকমত দিয়ে দেয়। কিন্তু এটাও তহবিল তছরূপের পূর্ব্বরাগবিশেষ। মানুষকে এক আঁচড়েই চেনা যায়। প্রত্যেক জিনিসের একটা ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্ম যদি পালন না কর, তাহ'লে তোমার ধৃতি ক্ষুণ্ণ হবে। তুমি দিচ্ছ ধার, out of sentimentality (ভাবালুতাবশে) যদি টাকা আদায়ের safe-guard (রক্ষা-কবচ) হাতে না রাখ, তাহ'লে ঋণদানের ধর্ম্মপালন করলে না, তাই তোমাকে মার খাবার জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। তাই আমি সাধারণতঃ কই, ঋণ দিতে গেলে, সেই পরিমাণ দিও, যা' ফেরত না পেলেও তুমি বিপন্ন না হও। এ-সব কথা তো তোমরা মেনে চল না। ফলকথা, লোভ প্রবল হ'লে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। তোমার স্ত্রী যখন তোমাকে সাবধান করেছিল, তখনও তো তুমি বিবেচনা ক'রে দেখতে পারতে!

উক্ত দাদা—তার আগেই যে আমি কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। আর বৌয়ের পরামর্শমত চলাটা আমার কাছে বড় insulting (অপমানজনক) লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ফিক ক'রে হেসে ফেললেন। বললেন—কথা দেবার আগে ভেবে কথা দিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তখন-তখনই পাকা কথা না দিয়ে বলতে হয়—ভেবে দেখি, পরে বলব। তারপর intelligent, well-wisher (বুদ্ধিমান, হিতাকাঙ্খী) কা'রও সঙ্গে ব্যাপারটার সবদিক আলোচনা ও বিচার ক'রে বিহিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে, সেই কথা সুকৌশলে বলতে হয়। সুকৌশলে বলছি এই জন্য যে, তোমার কাছে যদি কেউ কিছু প্রত্যাশা করে এবং তোমার অক্ষমতার জন্যও যদি তাকে বিমুখ কর, তাহ'লেও কিন্তু সে খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়। তাই গত্যন্তরবিহীন হ'য়ে কাউকে বিমুখ করতে হ'লে, কথাটা এমনভাবে বলা প্রয়োজন, যা'তে ভুল বোঝার সুযোগ কম থাকে। আমার কথা হ'লো, নিজেকে বিপন্ন না ক'রে মানুষের বাঁচাবাড়ার প্রয়োজন যত বেশী পূরণ করা যায়, ততই ভাল।..............বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা দিতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভুল কমই হয়। আর, ভুল ক'রে বেফাঁসভাবে কাউকে যদি তুমি কোন কথা দিয়ে ফেল এবং যদি বোঝ, সে-কথা রক্ষা করতে গেলে তোমার অস্তিত্ব বিপন্ন হ'তে পারে, তাহ'লে সবিনয়ে তার কাছে গিয়ে তোমার অক্ষমতা জ্ঞাপন ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে এসো। এতে go-between (কথা-খেলাপ)-এর অপরাধ স্পর্শে না জানবে। তবে এইরকম প্রয়োজন যত কম হয়, ততই ভাল। হামেশা এইরকম করতে থাকলে সমাজে খেলো হ'য়ে পড়তে হয়।..............আর, বৌ কোন সৎ-পরামর্শ দিলেও তা' অগ্রাহ্য ক'রে, তার উল্টোটা ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ করতে হবে, এই বা তোমার কি বুদ্ধি? বৌ-ই হো'ক, আর যেই-ই হোক, যে যা' বলে—দেখবে তা' ইষ্টানুকূল কি-না। যদি ইষ্টানুকূল হয়, সে-কথা শুনতে বাধা কি? সেইজন্য

কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই, কাউকে ছোট ভাবতে নেই। আমার তো মনে হয়, ক্ষুদ্র পোকা-মাকড়টা পর্য্যন্তও মানুষের পূজা পাবার যোগ্য। ইষ্টনিষ্ঠ যারা, শ্রদ্ধাবান যারা, তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হয় এমনতর। তাই স্ত্রীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কিন্তু ধর্ম্মের লক্ষণ নয়। স্ত্রৈণ হওয়া যেমন অপরাধ, স্ত্রীকে অবজ্ঞা করাও একরকমের অপরাধ। কোনটাই ইষ্টনিষ্ঠার সঙ্গে compatible (সঙ্গতিশীল) নয়।

ইতিমধ্যে গোসাঁইদা, মনোহরদা (বসু), বিশু (মুখোপাধ্যায়), আশুদা (দত্ত), ভবানীদা (সাহা), শশধরদা (সরকার) প্রভৃতি অনেকে সমবেত হয়েছেন।

সকলেই আগ্রহ সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহরদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কাজকাম কেমন চলছে?

মনোহরদা—গতানুগতিকভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জোর লাগান। ঢিলে হ'য়ে চললে life (জীবন)-টাই enjoy (উপভোগ) করা যায় না।

মনোহরদা—সে-কথা ঠিক। অত্যন্ত খাটুনির ভিতরও আরাম পাওয়া যায়, যদি ভিতরে keen urge (তীব্র আকূতি) থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা সব বুঝে-সুঝেও স্থবির হ'য়ে আছেন। জ্ঞানস্থবির নয়, তমঃস্থবির। জ্ঞানস্থবির যারা তারা ঠায় ব'সে হাজার মানুষের কাজ করে, কত মানুষকে দিয়ে কাজ করায়। আপনারাও ইচ্ছা করলে তা' পারেন, কিন্তু mental paralysis (মানসিক পক্ষাঘাত)-এ তা' করতে দেয় না।

মনোহরদা—এর ওষুধ কী

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ হ'লো আলিস্যি ত্যাগ ক'রে, যা' করণীয় ব'লে বোঝেন, তা' জোর ক'রে করা ও অন্যকে দিয়েও করিয়ে নেওয়া। পরিবেশকে যদি কর্ম্মমুখর ক'রে না তোলেন, তবে তাদের অদৃশ্য প্রভাবে নিজে কখন স্থবির হ'য়ে পড়বেন, তা' ঠিকই পাবেন না। তবে ভিতরে metal (জন্মগত সম্ভাব্যতা) না থাকলে, টানাহ্যাঁচড়া ক'রে হয় না।

চট্টগ্রামের দাদাটি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার টাকাটা কি তাহ'লে পাব না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইনতঃ আদায় করার কোন পথ তো তুমি হাতে রাখনি। এখন তার দয়া। তবে অন্যরকম চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।

উক্ত দাদা—কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, যার কথা শোনে, কিংবা যার কাছে সে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ, যার কথা সে ফেলতে পারে না, তেমন কাউকে

ধ'রে, তার কাছে সব ঘটনা ব'লে যদি তার সহানুভূতির উদ্রেক করতে পার, তবে তার মাধ্যমে হয়তো কোন সুরাহা হ'লেও হ'তে পারে। তবে প্রথমে গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা ক'রে চটাচটি না ক'রে বলা ভাল—ভাই! তোমার কোন দোষ নেই। দোষ সব আমারই। আমি এমন কোন পথ আমার হাতে রাখিনি, যা'তে টাকাটা পেতে পারি। তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে বাঁচাতেও পার আবার মারতেও পার। কী করা তুমি সমীচীন মনে কর, দয়া ক'রে আমাকে নির্দ্দিষ্টভাবে বল। আমার অবস্থাটা আমাকে বুঝতে দাও। আমাকে আর অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখো না। এইভাবে appeal (আবেদন) ক'রে দেখ। মানুষ ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করে, কাচ্চাবাচ্চার কথা ভেবেও দিনে-দুপুরে মানুষের গলায় ছুরি দিতে ভয় পায়।..............এতে যদি ফল না ফলে, তবে গোড়ায় যা' বললাম তাই করবে। সবটাই যদি নিষ্ফল হয়, তা'তেও ঘাবড়ে যেও না। জীবন-বিদ্যালয়ে অনেক সময় মোটা অঙ্কে fine (জরিমানা) দিয়ে শিক্ষালাভ করতে হয়।

মনোহরদা—সংসারে তো ভাল লোকদেরই fine (জরিমানা) দিতে হয় বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল মানুষ মানে কিন্তু বেকুব নয়। বেকুবী করলে কিন্তু তার ফল ভোগ করতেই হবে। ও যদি কিছু বন্ধক রেখে টাকা দিত, তাহ'লে তো আজ এমন ফ্যা-ফ্যা ক'রে বেড়াতে হ'ত না।

মনোহরদা—বেকুব ভালমানুষগুলি যেমন শাস্তি পায়, চালাক-শয়তান-গুলিকে তো তেমন শাস্তি পেতে দেখা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মের ফল ফলেই, তা' অনিবার্য্য। কিন্তু সবসময় নগদা-নগদি বোঝা যায় না। বিবেকীলোক যারা, তারা সামান্য অন্যায় করলে বিবেকের দংশন অনুভব করে, অনুতাপের আগুনে জ্বলতে থাকে। এটা তো পরমপিতার আশীর্ব্বাদ। কারণ, তার ফলে তারা তাড়াতাড়ি খারাপ কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়। গলদ বেশী জমতে পারে না। কিন্তু যারা অবিবেকী, তারা callous (অসাড়) হ'য়ে পড়ে। বহু অন্যায় ক'রেও তাদের অনুতাপ জাগে না। তাই আস্তে-আস্তে কম্বল ভারী হ'তে থাকে। কিন্তু অকাম যেগুলি করে, তার ফলের হাত থেকে রেহাই পায় না। সুতরাং দুর্ভোগ বাড়ে বই কমে না। যে-ভাবে ফল ফলবে ব'লে ভাবি, সে-ভাবে হয়তো ফলে না। বাইরে থেকে লোকে হয়তো সবটা বুঝতেও পারে না। কিন্তু এমন কষ্ট হয়তো তার কপালে জোটে যা' সে কইতেও পারে না, সইতেও পারে না। ধর, একজন হয়তো যেখানে-সেখানে যথেচ্ছভাবে বদমাইসি ক'রে বেড়ায়, তার বাড়ীতেই হয়তো সে দেখতে পেল, তার আদরের মেয়েটা উচ্ছৃঙ্খল চলনায় চলছে। তাকে বিয়ে দিল। উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের দরুন সে স্বামীর ঘর করতে পারলো না। সেখান

থেকে এসে বাপের বাড়ীতে উঠলো। স্বভাব তার বদলালো না। অশোভন চলনায় পারিবারিক আবহাওয়াটা পঙ্কিল ক'রে তুলতে লাগলো। অথচ মেয়েকে ফেলতেও পারে না। এইরকম একটা বেকায়দার মধ্যে মানুষ যদি পড়ে, তার গাড়ী-বাড়ী, ঠাট-বাট যতই যা' থাক, মনে কি তার শান্তি থাকে? অথচ এ অশান্তি কিন্তু তার নিজেরই কর্ম্মফল-সঞ্জাত। একজন হয়তো ভাইকে ফাঁকি দিয়ে মেলা টাকা জমালো, আর, সেই টাকা নিয়েই হয়তো তার ছেলে রেস খেলে দেউলে হ'য়ে গেল। হামেশা এমন হয় না?

মনোহরদা—অনেক সময় হয়, অনেক সময় হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটা হয়তো ধরা পড়ে না আমাদের কাছে। তা' ছাড়া সব ব্যাপারের একটা পর্য্যায় আছে। রাবণ বা কংস কিন্তু দীর্ঘকাল অক্ষতভাবে যথেচ্ছাচার চালিয়েছে, শুধু ঐ অধ্যায়টুকু যারা দেখেছে, পরবর্ত্তী অধ্যায় যারা দেখেনি, তারা হয়তো এই দুঃখই ক'রে গেছে—শয়তান চিরকাল অক্ষতভাবেই রাজত্ব চালিয়ে যায়, আর, সৎলোক তার হাতে কেবলই নির্য্যাতিত হয়। আমরা তেমনি বহুলোকের, বহু ব্যাপারের একটা অধ্যায় দেখে impatiently (অসহিষ্ণুভাবে) conclude (সিদ্ধান্ত) করি—শয়তানেরই জয় জয়কার। আবার দেখা যায়, অসৎলোকগুলি যেমন active (সক্রিয়) ও vigorous (তেজস্বী), তথাকথিত সৎলোকগুলি কিন্তু তেমন নয়। তাই অসৎ হ'য়েও ওদের যতখানি প্রভাব হয়, সৎ হ'য়েও এদের ততখানি প্রভাব হয় না। আবার, আমাদের বিচারেও ভুল থাকে, যাদের অসৎ বলি, তারা হয়তো প্রকৃত অসৎ নয়। হনুমান পুরোহিত সেজে গিয়ে রাবণের মৃত্যুবাণ চুরি করেছিল, লংকা পুড়িয়ে দিয়েছিল, আরো কত তথাকথিত গর্হিত কাজ করেছিল। কিন্তু হনুমানের মতো পুণ্যবান কয়জন? কারণ, সে যা' করেছিল, তা' করেছিল প্রভু রামচন্দ্রের জন্য। সেইজন্য কোন্ উদ্দেশ্যে কে কী করে, তা' যদি আমরা না বুঝি, না জানি, তাহ'লে ভালকেও মন্দ বলতে পারি, আবার মন্দকেও ভাল বলতে পারি। তাই বিচার করতে গেলে, সব দিক দেখেশুনে বিচার করতে হয়। Superficially (উপর-উপর) দেখতে গেলে জগৎটাকে মনে হয় একটা chaos (বিশৃঙ্খলা), কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও পরিচয় যত বাড়ে, ততই দেখতে পায়—বিধির বিধানে সবই cosmos (শৃঙ্খলা)। ভিতরে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা না হ'লে, মানুষ বাইরের জগতেও কেবল অসামঞ্জস্য দেখতে পায়। তাই ব'লে মানুষের সমাজে অসামঞ্জস্য যে বাস্তবে কিছু নেই, তা' নয়; তা' আছে, কিন্তু তা'তে উৎক্ষিপ্ত বা হতাশ না হ'য়ে তাকে সুসমঞ্জস ক'রে তুলতে হবে আমাদের অন্তরের সামঞ্জস্যসম্পদে।

পাগলুভাই (খেপুদার জ্যেষ্ঠপুত্র) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বললেন—জ্যাঠামশাই! আজ কলকাতায় যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুরও জোড় করে পরমপিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন ক'রে বললেন—সাবধানে যেও। রাস্তাঘাট পার হওয়ার সময় দেখে-শুনে পার হ'য়ো। চলতি ট্রামবাসে উঠবাও না, চলতি অবস্থায় নামবাও না, থামলে তারপর নেমো। পারলে রোজ একখানা ক'রে চিঠি দিও।..............তোমরা চোখের আড়াল হ'লে আমার দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহার্দ্র কণ্ঠ আবেগে একটু কেঁপে উঠলো, চোখ দুটো ছলছল করতে লাগলো। পাগলুভাইয়েরও চোখে জল এসে গেল। মাথা নীচু ক'রে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

একটু পরে আহেদ ব'লে গ্রামের একটি মুসলমান ভাই যা'চ্ছে আশ্রমের সামনে দিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে বললেন—কি রে আহেদ। কেমন আছিস?

আহেদ—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল তো বুঝলাম, তা' চুল কাটিস না ক্যান কেমন পাগল-পাগল চেহারা হইছে। ভূতের মতো থাকতে ভাল লাগে, তাই না?

আহেদ—না ঠাকুর! কাজ-কামে সময় পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল! চুল কাটাতি কতটুক সময় লাগে? যে কাজে যাচ্ছিস যা, তাড়াতাড়ি ঘুরে আসে নাবার আগেই চুল কাটে ফেলবি। পয়সা আছে তো কাছে?

আহেদ—সে আটকাবি না। পয়সা পরে দিলিও চলবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দরকার বুঝলি হরিপদর কাছ থেকে চায়ে নিস আমার নাম ক'রে।

আহেদ—'আচ্ছা!' ব'লে দক্ষিণমুখে রওনা হ'লো।

সুবোধের মা এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাঁচশটা টাকা দিবি? একজন এসে গোপনে চেয়ে গেছে, আমি কইছি, 'দেখি তো!'........... আবার হয়তো এসে পড়বে।

সুবোধের মা খুশি হ'য়ে বললেন—আপনারই তো সব, দেব না কেন? এখনই নিয়ে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখ! আমি তো যখন-তখন চাই, আমার জন্য আলাদা একটা তহবিল করবি। যখন যেমন পারিস, তা'তে কিছু-কিছু ফেলে রাখবি। এতে কষ্ট হবে না। আর, সংসারের জন্যও আলাদা কিছু-কিছু সঞ্চয় করবি। পারতপক্ষে তা'তে হাত দিবি না। অসময়ে তা'তে দেখবি, খুব কাজ দেবে। সংসারী মাত্রেরই কিছু-কিছু সঞ্চয় করা দরকার, বিশেষতঃ মেয়েদের।

সুবোধের মা—আপনার মুখে আগেও এ-কথা শুনেছিলাম, আমি একটু-একটু চেষ্টা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল!

সরোজিনীমা—যাদের সংসারের খরচ চালিয়ে বেশী থাকে, তারা না হয় সঞ্চয় করতে পারে, কিন্তু যাদের সংসারই চলে কষ্টে, তারা কিভাবে সঞ্চয় করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা হ'লো অভ্যাসের ব্যাপার। বেশী পেয়েও একজন সুশৃঙ্খলভাবে সংসার চালাতে পারে না, আরো দেনা করে। আবার, কেউ কমের ভিতর সুষ্ঠুভাবে সংসার চালিয়ে তার ভিতর থেকে জমাতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, টাকা জীবনের জন্য, টাকার জন্য জীবন নয়। তোমার কাছে টাকা থাকা সত্ত্বেও তোমার সংসার বা নিকট পরিবেশের কা'রও প্রাণান্তিক প্রয়োজনে তা' যদি খরচ করতে কুণ্ঠিত হও, তবে বুঝতে হবে, অর্থাসক্তি তোমার জীবনাসক্তির উপর দিয়ে উঠেছে। অমনতর আসক্তি কিন্তু অনর্থেরই মূল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার ওখান থেকে উঠে খেপুদার বারান্দায় এসে বসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে আসলেন। ওখানে আসার পর যতীনদা (দাস), কেশবদা (রায়), মণিদা, অজয়দা ও সত্যদাও আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কতকগুলি ছড়া প'ড়ে দাদাদের শোনান হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলি ঠিক আছে তো?

কেশবদা—অতি সুন্দর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখাপড়া তো জানি না। তাই তোমাদের মুখে শুনতে ইচ্ছা করে। মনের সন্দেহ যায় না।

কেশবদা—এগুলির তুলনা হয় না। লেখাপড়া জানা লোক এমন পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা শুধু মুখে তারিফ করলে আমার কিন্তু সুখ হয় না। তখনই বুঝব তোমাদের এগুলি সত্যি ভাল লেগেছে, যখন দেখব তোমরা এইমত চলছ। আমি তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই। গুরুগোবিন্দের মতো বলতে ইচ্ছা করে—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ'। এটা অহঙ্কার কিনা বলতে পারি না, কিন্তু মন আমার এমনই বলে। প্রত্যেকের জন্যই আমার ভাবনা হয়, ভাবি, আমি না দেখলে কে দেখবে তাদের? যুদ্ধে এতলোক মারা যাচ্ছে যখন শুনি, তখনই মন খারাপ হ'য়ে যায়। মনে হয় আমি অক্ষম, তা' না হ'লে এদের বোধ হয় বাঁচাতে পারতাম। যুদ্ধবিগ্রহের কোন প্রয়োজন হ'তো না।..............মমতার তুলনায় ক্ষমতা এত কম যে আপসোস আর ছাড়ে না। কিন্তু ক্ষমতা কমই বা বলি কি ক'রে? আপনারা এতজন আছেন, আপনাদের ভিতরকার ভালবাসাই আমার ক্ষমতা। একা হনুমান কী কাণ্ড করেছিল?..............আপনারাও তেমনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। কার প্রাণ কখন নেচে ওঠে, তা' কি বলা যায়? তাই ভরসা আমি হারাই না।

তাঁর কথাগুলি দিয়ে যেন মধু ঝ'রে পড়ছে। অন্তরের সমস্ত কাঠিন্য,

মালিন্য গ'লে জল হ'য়ে যেতে চায়। ভাল, বড় ভাল লাগে প্রাণে। স্বর্গসুখ হার মানে তার কাছে।

যতীনদা—আদর্শপ্রাণ জীবনে এত আনন্দ, তবু কেন মানুষ তা' ছেড়ে বাজে ভোগসুখে মত্ত হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট না থাকলে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিও weak (দুর্ব্বল) ও ও sub-normal (স্বাভাবিক অপেক্ষা ন্যূন) হ'য়ে পড়ে, তাই খাওয়া-দাওয়াই হো'ক বা sexual life (যৌনজীবন)-ই হো'ক—কোনটাই properly (যথাযথভাবে) enjoy (উপভোগ) করতে পারে না। তাই সেদিক দিয়েও বঞ্চিত হয়। যার self-control (আত্মসংযম) নেই, সে ভোগের বস্তু পেয়ে নিজেকে তার মধ্যে হারিয়ে ফেলে। যার নিজত্ব বজায় নেই, যে নিজেই 'নেই' হ'য়ে গেছে, সে আর ভোগ করবে কি?..............দেখেন, সুখের ধারণা আমাদের কত বিকৃত হ'য়ে গেছে। মেয়ের বিয়ে যদি দিতে চাই—বরের বংশ ও ব্যক্তিত্বের মেকদারের কথা বড় ক'রে না ভেবে খুঁজি, কোথায় গেলে মেয়ে আমার রাজার হালে থাকবে, বামুন-চাকর, দাস-দাসী তার ফরমাশ খাটবে, মাটিতে পা-টুকু ফেলতে হবে না, খাট-পালঙ্কে ব'সে হুকুম চালাবে। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগর লেশমাত্র থাকবে না। কিন্তু এ-কথা ভাবি না—দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয় করুক, ভিক্ষা ক'রে স্বামীকে খাওয়াতে হয়, তা' খাওয়াক, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-পরিজনের সেবায় একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম না পায়, তা না পাক, তার উপর দিয়ে অগ্নি-পরীক্ষা চলে, তা' চলুক, কিন্তু সে যেন অটুট ইষ্টপ্রাণ সদ্বংশজাত উপযুক্ত ছেলের হাতে পড়ে।.............. তপস্যার ভিতর-দিয়ে ছাড়া মানুষ বড়ও হয় না, সুখীও হয় না। অনেকদিন পরাধীন থেকে-থেকে এই ধারণাটাই আমাদের উবে গেছে। আমরা যে সুখ চাই, সে মানুষের সুখ নয়, পশুর সুখ। বাধাকে নিরোধ ক'রে জয়ের নিশানা গাড়ায় যে সুখ, সেই সুখই মানুষের কাম্য।

"হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে ল'য়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"

অজয়দা—মানুষ এই সত্যটা বোঝে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষার অভাব। সবই মানুষকে ধরিয়ে দিতে হয়। ধরিয়ে দেবার মানুষ যদি না থাকে, আচরণশীল লোকশিক্ষক যদি না থাকে, তাদের

সান্নিধ্য যদি মানুষ না পায়, তবে তারা শিখবে কি ক'রে? তাই তো আমি ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজক সংগ্রহের কথা অত ক'রে কই। মানুষের ঘরে-ঘরে গিয়ে তারা হানা দিক। তাদের আচার, আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা থেকে মানুষ জীবনের পাঠ গ্রহণ করুক। বুঝে নিক—কিভাবে বাঁচতে হয়, বাড়তে হয়, সুখী ও সার্থক হ'তে হয় জীবনে।..............Inferior beloved (নিকৃষ্টপ্রিয়) নিয়ে যারা চলে, তাদের libido (সুরত) dull (ভোঁতা) ও dusky (মলিন) হ'য়ে পড়ে। এমন কোন uphill enthusiastic thrill (ঊর্দ্ধগামী, উৎসাহদীপ্ত স্পন্দন) থাকে না, যাকে বলা যায় elixir of life (জীবনের অমৃত)। জীবনের দুই দিক যারা দেখেছে অর্থাৎ ইষ্টমুখীন ও প্রবৃত্তিমুখীন উভয় জীবনের স্বাদ যারা পেয়েছে, তারাই compare (তুলনা) ক'রে বলতে পারে—কোন্‌টা মানুষের আসল জীবন।..............ইষ্টহীন জীবন প্রেতজীবনের সামিল, তফাৎ এই, প্রেতলোকে কারও উন্নতি হয় না, অবনতিও হয় না, কিন্তু ইহলোকে ইষ্টহীন জীবন যারা যাপন করে তাদের কেবল অবনতিই হয়, উন্নতি আর হয় না, উন্নতির রকম-সকম যা' দেখা যায়, তা'ও অবনতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। চুষিকাঠি নিয়ে ভুলে থাকে, মায়ের বুকের দুধের কথা আর মনে পড়ে না। ফলে আসল সুখ, আসল পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়।

মঙ্গলমধুর আলোচনার স্রোত ব'য়ে চলেছে।

যতীনদা আগ্রহভরে প্রশ্ন করলেন—কী করলে ইষ্টের প্রতি মানুষের টানটা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না, অত্যন্ত সোজা ব্যাপার। বলতে হয়, ঠাকুর! তোমা বই আমি জানি না। আর, যা'-কিছু করতে হয় তাঁর জন্য। তাঁকে দিতে-থুতে হয়। তিনি যা'তে খুশি হন, সেইসব কাজ করতে হয়। যা' তিনি পছন্দ করেন না, তেমনতর চলনের ধারকাছ দিয়েও যেতে নেই। এইসব করতে-করতে টান বেড়ে ওঠে। দ্যাখেন না! পরের মেয়েগুলি স্বামীর ঘর করতে এসে কেমন হয়! বিয়ের পর বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় কাঁদতে-কাঁদতে যায়। ভাবে, কোথায় কোন্ অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে, তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। ভয়-ভাবনার অন্ত থাকে না। কিছুদিন যেতে-না-যেতে স্বামীর ঘর তার আপন জায়গা হ'য়ে ওঠে। তখন বাপের বাড়ী এসে আবার বেশীদিন থাকতে চায় না। বলে, 'আমি ওখানে না থাকলে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-যত্ন ঠিকমত হয় না। আমি আর বেশীদিন থাকব না, তাড়াতাড়িই চ'লে যাব।' বাপের বাড়ীর আরাম-বিরাম ফেলে এই যে শ্বশুর-বাড়ীতে ছুটে যেতে চায়, কেন চায়? চায়, কারণ সেই বাড়ী ও বাড়ীর লোক-জনকে সে আপন ক'রে নিয়েছে। এই যে পর সব আপন হ'লো, তা' হ'লো কী ক'রে? এর গোড়ার ইতিহাস হ'লো স্বামীকে ও স্বামীর আপন জনকে

নিজের ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। শুধু স্বীকার ক'রে নিয়ে যদি ব'সে থাকত, তাহ'লে কিন্তু হ'তো না। আপন ব'লে ভাবলে যা'-যা' করে দিনের পর দিন অজস্র রকমে তা' করেছে। এই ভাবা, বলা, করার ভিতর-দিয়ে অজ্ঞাতসারে মমতার শিকড় মোটা ও লম্বা হ'য়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ী হয়তো রাজসাহীর কোন গ্রামে। বাপের বাড়ীতে ব'সে একটা খবরের কাগজের হেডলাইনে যদি দেখে রাজসাহীতে ভীষণ অগ্নিকান্ড, অমনি বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করতে থাকে। ভয়ে-ভয়ে কাগজখানা হাতে নেয়, ভাবে কি খবর দেখে যেন! যখন দেখে, রাজসাহী শহরে অগ্নিকান্ড, তার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে কিছু হয়নি, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। এই যে মমতার বিস্তার, সে কিন্তু সম্ভব হয় স্বামীভক্তিকে সূত্র ক'রে। ইষ্টের প্রতি টান বা ভক্তি হ'লেও কিন্তু তা' প্রসার লাভ করতে থাকে। ইষ্টের সঙ্গে জড়িত যারা, তাদের সকলের উপর গিয়েই টান পড়ে। আমাকে ভালবাসেন, বড়বৌকে ভালবাসেন না, বড়খোকাকে ভালবাসেন না, এ হতে পারে না। আমাকে ভালবাসলে আমার কুত্তেটাকেও আপনার ভালবাসতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু এই ভালবাসার বিস্তার যতই হোক না কেন, তার মূলে থাকে কিন্তু নিষ্ঠা। আমার যথাসর্ব্বস্ব যিনি, তাঁকে ছাপিয়ে কিন্তু কেউ নয়, কিছু নয়। কার সঙ্গে আমার ভাবসাব কতখানি হবে, তার মাপকাঠি কিন্তু হ'লো—আমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কিরকম। যে আমাকে ভালবাসে, আমার জন্য ঢের করে, যাকে পেলে আমি খুশি হই, তেমন কেউ যদি রাগ ক'রে আপনার কান মলেও দেয়, তাহ'লেও আপনি তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইবেন না, যদি আপনি আমাকে ভালবাসেন। কারণ, আপনি তখন ভাববেন—আমার কান মলে দিলেও আমার ঠাকুরের সুখসোয়াস্তির জন্য ও কিন্তু যথেষ্ট করে। যে গরুটা দুধ দেয়, তার চাঁটটাও সহ্য হয়। আপনার কোন সুখ-সুবিধা হয় না তাকে দিয়ে, বরং সে আপনার অসুবিধারই কারণ হ'য়ে থাকে, কিন্তু ঠাকুরকেই যদি আপনার স্বার্থ ব'লে বোধ থাকে, তাহ'লে ঠাকুরের জন্যে তার করাটার ভিতর-দিয়ে আপনি নিজেকেই লাভবান মনে করবেন। এইরকম হয়। তার কানমলা দেওয়াটা যে সমর্থনযোগ্য ব্যবহার, তা' আমি কই না। কিন্তু ঐ ব্যাপারে, আপনার যে attitude (মনোভাব) হবে, আপনি যেভাবে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারবেন, সেই কথাই কচ্ছি এখানে। ভালবাসায় সহ্য, ধৈর্য্য, সংযম সবই বেড়ে যায়। আপনারা যে consolidation (সংহতি), consolidation (সংহতি) করেন, মূলে টান থাকলে consolidation (সংহতি) আপনি আসে। শুধু নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যে ভালবাসা আসে, তা' নয়, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত ভালবাসা ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। তার বৃদ্ধি হয়, বচন হয়, চেষ্টা হয়—'আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।' ধীরে-ধীরে 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে'র—মতো হয়।

যতীনদা—সত্যই কি সর্ব্বত্র ইষ্টের দর্শন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা আছে স্ফুরণ। আর, এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই হয়। ধরেন, সতী-স্ত্রী বাড়ীতে আছে ছেলেপেলে নিয়ে, স্বামী আছে বিদেশে। ছেলেপেলেকে দেখে, তাদের আদর-যত্ন করে। কিন্তু ঐ দেখা ও আদর-যত্নের ভিতর-দিয়ে স্বামীর কথাই বারবার ক'রে মনে পড়ে। ছেলের চাউনি, চলন, কথাবার্ত্তা—সবই তার বাপের স্মৃতি জাগ্রত ক'রে দেয়। মনের মতো কাউকে পেলে হয়তো গল্প করে—'ও ব্যাটা হইছে ঠিক বাপের মতো। সবে তো পাঁচ বছরে পা দিছে, দাপট কী?' সংসারের জিনিসপত্র যা' দেখে, তা' দেখেও কত সুখস্মৃতির উদ্দীপন হয়। সেবার এই কুলোটা নিয়ে এসেছিলেন রথের মেলা থেকে। আহা, কুলোটা ছেঁড়ার উপক্রম হয়েছে। দুটো বেতের বাঁধন দিয়ে ঠিক ক'রে রাখি। কত ঝড়জলের মধ্যে ভিজেপুড়ে নিয়ে এসেছিলেন। জিনিসটা নষ্ট হ'তে দেওয়া হবে না। ঐ ধবলী গাইটার গায় হাড় বেরিয়ে গেছে। কত আদরের গরু ওঁর। উনি থাকলে এ দশা হ'তো না। কচি ঘাস এনে খাওয়াতেন। আমি কি পারি ওঁর মতো ক'রে গরুর যত্ন করতে? দু-চার পয়সা যায় যাক—কিছু ঘাস কিনে খাওয়ালেও গরুটাকে খাওয়াতে হবে। শুধু খড়-কুটোয় ওর পেট ভরে না। আমগাছে এত আম হইছে। বাড়ীতে খাবে কে? উনি থাকলে কত আগ্রহ ক'রে খেতেন। কিছু যে পার্শ্বেল ক'রে পাঠাব ওনাকে, সে সুবিধেও নেই। পাঠালেও, দূরের রাস্তা, পচে-গলে যাবে। যাক, বরং ভাল ক'রে আমসত্ত্ব দিয়ে রাখি, উনি আস্‌লে খাবেন। আমসত্ত্ব দিতে ব'সে ফৎ ক'রে নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। আপনা থেকে চোখের কোণে জল এসে পড়ে। ছেলে এসে ধ'রে ফেলে, বলে—'মা! তুমি কাঁদছ কেন?' মা এড়িয়ে যায়, বলে—'ও কিছু না, চোখের মধ্যে ছোট এক টুকরো কুটো পড়েছিল। বের ক'রে ফেলেছি।' স্বামীর সংসারকে কেন্দ্র ক'রে প্রতিনিয়তই এমনিভাবে তার অন্তরে স্বামীর স্ফুরণ হ'তে থাকে। ইষ্টকে যে গভীরভাবে ভালবাসে, তার কাছেও নানাভাবে ইষ্টের স্ফুরণ হ'তে থাকে। আপনি হয়তো খবরের কাগজ পড়ছেন। তা'তে একটা নূতন ধরণের ইঞ্জিনের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। দেখামাত্রই আপনার মনে হ'লো—ঠাকুরকে এর একটা জোগাড় ক'রে দিতে পারলে ভাল হ'তো। সুরু হ'লো আপনার ধ্যান ও চেষ্টা। কোথায়-কোথায় গেলেন, কার-কার কাছে কী বললেন, টাকা যোগাড় করলেন। কোম্পানি থেকে ব'লে-ক'য়ে কিছু দাম কমালেন। তারপর জিনিসটা এনে আমাকে দিলেন। স্ফুরণের মধ্যে এতখানি বাস্তবকরণ আছে। নইলে গাছের দিকে চাচ্ছি, গাছ দেখতে পাচ্ছি না, গাছের মধ্যে ঠাকুর দেখতে পাচ্ছি—এমনতর ব্যাপার নয় কিন্তু। বাস্তবতার বোধের সঙ্গে একটা ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামূলক চিন্তা ও চেষ্টা লেগেই থাকে। আর প্রত্যেকটি,

বিশেষের মধ্যেই নির্ব্বিশেষ বিশেষকে বোধ করার একটা ঝোঁক হয়। ইষ্ট হলেন নির্ব্বিশেষ বিশেষ, তিনি বিশেষ ব্যক্তি হ'য়েও সব বিশেষত্বের ঊর্দ্ধে। অর্থাৎ বহু আপাত-বিরুদ্ধ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সার্থক সমাবেশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। তিনি মূলতঃ যা', তত্ত্বতঃ যা', তা' বুঝতে গেলে নরবপুরূপে তাঁর যে বিশিষ্ট আবির্ভাব, তাঁকে বাদ দিলে চলবে না। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।"

তাঁর এই মানুষী লীলার মধ্যে অনুরাগমুখর অনুপ্রবেশ না ঘটলে সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন জ্ঞান ও বোধের উন্মেষ হয় না। অনেক ফাঁক থেকে যায়। আর, প্রকৃত রসানুভূতিও হয় না। বোধটা বুদ্ধিগত থেকে যায়, সত্তাগত হয় না। আবার, নিছক তাঁকে নিয়ে আছি, পরিবেশের ধার ধারি না, তা'তে কিন্তু তাঁকেও অনুভব করতে পারব না। সেই নির্ব্বিশেষ বিশেষ প্রতিটি বিশেষের মধ্যে আছেন বিশেষ রকমে। তাই প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যে তাঁকে যদি বিশিষ্ট রকমে অনুভব করতে না পারি, তাহ'লে কিন্তু আমাদের বোধই পাকা হবে না। কেষ্টদা কয় নৈরন্তর্য্যের কথা, আমাদের ব্রাহ্মীস্থিতি নৈরন্তর্য্য লাভ করবে না। বোধগুলি কাটা-কাটা হ'য়ে যাবে। সেইজন্য প্রতিটি যা'-কিছুকে ঐ ভাবে দেখা চাই। ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক ভাবা, বলা, করা, নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের ভিতর-দিয়েই এটা সহজ হ'য়ে আসে জীবনে। খুব করতে হয়। নইলে সড়গড় হয় না। যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ তো অনেক ছেলেই জানে। কিন্তু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের প্রয়োগ কোথায় কেমনতর হয়েছে বা হবে, সেটা লাখো রকমের আঁক কষার মধ্য-দিয়ে যারা নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করেছে, তাদেরই বলে গণিতজ্ঞ। সোমেশ বোস তো শুনেছি, কত বিরাট গুণ নিমেষে ক'রে ফেলে। লোকে বলে যোগবলে করে, কথাটা ঠিক। কিন্তু কথাটা তারা যেভাবে বোঝে, আমি ও-ভাবে বুঝি না। আমি বুঝি অঙ্কের ব্যাপারে সোমেশ বসু এতখানি actively attached ও interested (সক্রিয়ভাবে যুক্ত ও অনুরক্ত) যে করতে-করতে তার intuition (অন্তর্দৃষ্টি) খুলে গেছে। বিরাট গুণ সংক্ষেপে অল্প সময়ে করা, তার পক্ষে প্রায় instinctive (সহজাত) হ'য়ে উঠেছে। উপযুক্ত বিয়ে-থাওয়া ও কুল-কৃষ্টি অনুসরণের ভিতর-দিয়ে এইসব গুণ আবার বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত ও বিকশিত ক'রে তোলা যায়। তাই আমার মনে হয়—এমন ভক্ত যদি কেউ থাকে, যার বোধে স্বাভাবিকভাবে যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে ইষ্টের রকমারি স্ফুরণ হ'য়ে চলে এবং তার বংশে যদি বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন, প্রজনন, সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষা বিধিমাফিক

নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে, তাহ'লে পরে ঐ বংশে আরো অনেকে অমনতর হ'য়ে উঠতে পারে।

বগুড়া থেকে একটি দাদা এসেছেন। তিনি প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আমাকে অনেকে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারশিপের জন্য দাঁড়াতে বলছে, আমি কি দাঁড়াব? স্থানীয় অবস্থা যেমন, তা'তে আমি হয়তো শেষ পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে যেতে পারি। অনেকেই বলছে—আপনি সৎসঙ্গী, আপনি ওর ভিতর গেলে কাজ হবে। প্রত্যেকবার কতকগুলি দুষ্টলোক ঢুকে দল পাকায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকে যদি তোমাকে চায়, তুমি দাঁড়াতে পার, অবশ্য তোমার যদি অন্য কোন অসুবিধা না থাকে। দাঁড়ালে এমনভাবে দাঁড়ান চাই, যা'তে returned (নির্ব্বাচিত) হবেই কি হবে। দাঁড়িয়ে হেরে যাওয়া—ও কিন্তু আমার কাছে বড় insulting (অপমানজনক) লাগে। সৎসঙ্গী ব'লে মানুষ যে তোমাদের চায়, তোমাদের সততায় বিশ্বাস করে, এ শুনে আমার খুব আত্মপ্রসাদ হয়। ওর ভিতর ঢুকলে তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ করা চাই। শুধু খাতির-যশের আশায় যদি ঢোক, সে ঢোকার কোন দাম নাই। ঢুকলে এমন কাজ করা চাই যে, সেইটেই যেন একটা নজির হ'য়ে থাকে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে লোকের সেবা কতখানি করা যায়। তোমাদের ইউনিয়নের চেহারাই পালটে দেওয়া চাই। চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাপি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবা। শুধু চৌকিদার দিয়ে পাহারা দিয়েও কিন্তু তা' বন্ধ হবে না। তোমার বাড়ী-বাড়ী ঘোরা লাগবে, মানুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করা লাগবে, কারও দিন চলে না, এমন অবস্থা হ'লে তার জন্য প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করা লাগবে, কারণ, অনেক সময় মানুষ অভাবে প'ড়ে হীন কাজ করতে বাধ্য হয়। তা'ছাড়া মানুষ মামলা-মোকদ্দমায় বহু টাকা খরচ ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়। সালিশী ক'রে বেশীর ভাগ মামলা যদি আপোষে মিটিয়ে ফেলতে পার, পারস্পরিক শত্রুতা যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের মধ্যে যদি সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করতে পার, তাহ'লে একটা কাজের কাজ হবে।..............তোমার কথার মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের পূর্ব্বতনদের সম্বন্ধে একটা নিন্দার ঢেকুর টের পেলাম, ওটা কিন্তু আমার ভাল লাগলো না। পূর্ব্বগামীদের নিন্দা ক'রে, তাদের অপ্রতিষ্ঠা ক'রে যদি নিজের প্রতিষ্ঠা চাও, সে চেষ্টা সফল হবে না। তাদের সম্বন্ধে ভাল যা' জান, তাই বলাই ভাল। আমাদের দেশে ইদানীং একটা রেওয়াজ হয়েছে ভোটাভুটির ব্যাপারে নামলেই একে অপরের নিন্দা করে, পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি করে—এসব ইতরেমি আমার পছন্দ হয় না। সমাজের মাথা যারা, তারা যদি এই করে, তাহ'লে সর্ব্বসাধারণও ঐ দেখাদেখি অমনি করতে থাকে। ওতে শত্রুতা বাড়ে, বিদ্বেষ বাড়ে, প্রীতি আর বাড়ে না।

হ্যাঁ! তবে বিভিন্ন দল যদি থাকে এবং দলগত নীতির ভিতর ত্রুটি যদি থাকে, আবার তা' যদি বিশেষ ক'রে ধর্ম্ম, ইষ্ট, সাত্বত কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও কল্যাণ-বিরোধী হয় এবং নীতি ঠিক থেকেও নির্ব্বাচন-প্রার্থীর চলন-চরিত্র যদি তার উল্টো হয়, সেটা জনকল্যাণের দিকে চেয়ে শোভনভাবে উদ্‌ঘাটিত করা যায়। এটা করতে গেলে বিপক্ষের সঙ্গে যে শত্রুতা করতে হবে, তার কোন মানে নেই।

প্রভাতদা (চন্দ)—এ-সব করতে গেলে politics (রাজনীতি) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, politics (রাজনীতি) আরো ভাল ক'রে হয়। Politics (রাজনীতি)-এর কাজ হ'লো মানুষের পূরণ-পোষণ। Political platform (রাজনৈতিক মঞ্চ)-টাকে যদি আত্মপুষ্টির উপকরণ ক'রে তোলা হয়, তা'তে politics (রাজনীতি) বা politician (রাজনীতিব্রতী)—কা'রও মর্য্যাদা বাড়ে না। তাই তো আজ এত নোংরামির ছড়াছড়ি। সৎসঙ্গী হিসাবে তোমরা এই আবহাওয়া পরিশুদ্ধ না ক'রে যদি ওর ভিতরই গা ঢেলে দাও, তাহ'লে তোমাদেরই বা লাভ কী আর দেশেরই বা লাভ কী?

বগুড়ার দাদাটি বললেন—ইউনিয়ন বোর্ডের ভিতর ঢুকলে, আপনি আমাকে যে-ভাবে কাজ করতে নির্দ্দেশ দিলেন, আমি সেই ভাবেই কাজ করতে চেষ্টা করব। তবে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা অতি স্বল্প ও সীমাবদ্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পদের ক্ষমতা স্বল্প ও সীমাবদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু পরমপিতার সন্তান হিসাবে, সেবক হিসাবে তোমার যে ক্ষমতা, তা' কিন্তু স্বল্প ও সীমাবদ্ধ নয়। সেটাকে যত টানবে, ততই লম্বা হবে। ঐ ক্ষমতা তোমার দেহ-মনের গঠন অনুপাতিক সীমাবদ্ধ হ'লেও ঐ সসীমতার মধ্যে একটা অসীমতা গোঁজা আছে। তাই ঠিকভাবে যদি চল, এগোনর পথ তোমার নিঃশেষ হ'য়ে গেছে—এমনটি দেখতে পাবে না।............... তুমি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হ'তে পার বা না পার, তোমার কাছে কিন্তু আমার একটা নালিশ (আবেদন অর্থে) থাকলো। যুদ্ধবিগ্রহের অবস্থা ভাল নয়, কতদিনে মিটবে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। আমাদের দেশের খাদ্য পরিস্থিতিও দিন-দিন জটিল হ'য়ে উঠছে। দেশে টাকা আজকাল সস্তা হ'য়ে গেছে, কিন্তু টাকা খেয়ে তো মানুষের প্রাণ বাঁচবে না। বাঁচতে গেলে দানাপানি পেটে দেওয়া চাই। কিন্তু যুদ্ধের কল্যাণে এমন দিন আসছে সামনে, যখন একমুঠো টাকার বদলেও একমুঠো চাল পাওয়া যাবে না। তাই আমি কই—প্রত্যেকে যাতে কৃষির দিকে নজর দেয় তার ব্যবস্থা কর। এক ফালি জমিও যেন প'ড়ে না থাকে। অনাবাদী চাষযোগ্য পতিত জমি যেগুলি আছে, সেগুলি যা'তে উদ্ধার হয়, সেখানে যাতে চাষ হয়, তার ব্যবস্থা কর। এর পেছনে প্রথমটা বেশী টাকা খরচ হ'লেও পরে দেখা যাবে, এই খরচে আয় দেবে। তোমার এলাকায় এটা করবাই লাগবি! আমি এক বছর ধ'রে সকলের কাছে

পচাল পাড়তিছি। আমার হাতে তো আর কিছু নেই। যাকে কাছে পাই তাকেই কই। (সকলের দিকে চেয়ে)—তোমাদের সকলকেই কচ্ছি। তোমরা এ-ব্যাপারে গাফিলতি ক'রো না। আমাদের এখানে আশে-পাশে দাশুড়ে, গাতি ইত্যাদি জায়গায় ভাল ও পতিত জমি কেনা হইছে ও হ'চ্ছে। কিন্তু সেগুলি চালু করতে গেলে অনেকগুলি কৃষক দরকার। নিবারণ তো কইছে, সেরপুর থেকে হৈহয় ক্ষত্রিয় পাঠাবে। লোকজন আসে গেলি বিলি-ব্যবস্থা ক'রে কাজ-কাম সুরু করা যায়। এর পেছনে খাটুনি আছে, টাকাও লাগবে মেলা। এতগুলি পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করা কম কথা নয়। ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি, অন্ন-বস্ত্র, চিকিৎসা—না কী?- শুধু পুরুষছেলেগুলিকে নিয়ে আসলি ব্যাপার অনেক সোজা ছিল। কিন্তু বৌ-ছাওয়াল বাড়ীতে রাখে আসলি মন প'ড়ে থাকবি বাড়ীতে। ফাঁক পালিই ঐ দিক পানে ছুট দিবি। কাম আর হবি নানে। (সহাস্যে)..............আমার ঋত্বিক্‌দের দেখি, যাদের বৌ-ছাওয়াল এখানে থাকে, তাদের কনফারেন্স কামাই যায় কমই। কামাই যাওয়া তো দূরের কথা, কয়েকজন আছে, তারা কনফারেন্স আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে আসে হাজির হয়, আর কনফারেন্স মিটেমাটে যাবার অনেক পরেও বারাতি চায় না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে, অফিস থেকে Istavrity defaulter's list (ইষ্টভৃতি লঙ্ঘনকারীদের তালিকা)-টা তৈরী ক'রে নিচ্ছি। ওটা নিজের কাছে থাকলে কাজের সুবিধা হয়। তাই এখানে একটু দেরী হ'লেও পরে পোয়ায়ে যাবে। এইভাবে গড়িমসি করে। তারপর বৌ যখন চাপ দেয়—'এখানে ব'সে রইছ। অভাবের সংসার, বাইরে গেলে দু'চার টাকা জোগাড় ক'রেও তো পাঠাতে পারতে আমাকে', তখন আস্তে-আস্তে মোট-গাঁটরি বান্ধে (অনিচ্ছাগমনের উদ্যোগ-পর্ব্ব অভিনয় ক'রে দেখালেন)।

সকলে হেসে কুটিপাটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—হাসলে কি হয়? ব্যাপার এমনতরই। আর দ্যাখ, আর একটা কাজ করতে পার, কৃষিকাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যদি মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট এলাকার মধ্যে agricultural exhibition-এর (কৃষি-প্রদর্শনীর) ব্যবস্থা করতে পার, তাহ'লে ভাল হয়। ছোট-ছোট এলাকা নিয়ে exhibition (প্রদর্শনী) করার কথা বলছি এইজন্য যে, সেখানে মানুষগুলি পরস্পর পরস্পরকে চেনে। হিমায়েতপুরের একজন কৃষক যদি দেখে ও শোনে যে ভাতনের অমুকে অমুক জিনিসটা ফলাইছে, তা'তে তার মনে একটা আশা ও বিশ্বাস হয় যে সে-ও চেষ্টা করলে অমনটা পারবে। কৃষি বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় যারা দেবে, তাদের আবার পুরস্কার দিতে হয়। কৃতিত্ব বলতে শুধু দেখনাইতে তাক লাগান জিনিস উৎপাদনে হবে না। একজন হয়তো অনেক সার দিয়ে, অনেক যত্ন ক'রে আধমণ একটা কুমড়ো করলো।

সেইটেকেই যদি কৃতিত্বের মানদণ্ড ক'রে ধর, তাহ'লে কিন্তু সাধারণ লোকে উপকৃত হবে না। জিনিস কত বড় করা যায়, কত ভাল করা যায়, সে চেষ্টা তো করতে হবেই, সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে হবে, সব দিককার সঙ্গতি নিয়ে কে কতখানি লাভজনক কৃষি করলো, কত কম খরচে, কত কম জমিতে, কত কম সময়ে, কত বেশী-পরিমাণে, কত রকমারি জিনিস ফলালো। ঐ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে স্থানীয় সব লোকের সভা ক'রে ভাল কৃষক যারা, তারা কিভাবে কি করলো সে সম্বন্ধে তাদের দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে সকলকে শোনাতে হয়। এ-সব ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যদি সহযোগিতা করে, সে তো খুব ভাল কথা। তা' না হ'লেও নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে স্থানীয় ও আশপাশের মোড়ল, প্রধান ও বিশিষ্টদের নিয়ে করতে হয়। Appreciation (তারিফ) সবাই চায়, কৃতিত্বশীল কৃষক যারা, তারা যদি সমাদৃত হয়, তবে তারা তো উৎসাহিত হবেই, তা'ছাড়া তাদের ঐ খাতির-খুরোদ দেখে আরো দশজন কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে চেষ্টা করবে। মানুষকে পুরস্কৃত করার বেলায় আর একটা দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সেটা হ'চ্ছে পরিবেশকে নিয়ে কে কতখানি কৃষিতে উন্নতি দেখাতে পারলো। তা'তে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর প্রতিযোগিতার বদলে সপরিবেশ সমবায়ী প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হবে। সব ব্যাপারেই এই ভাবটা নিয়ে আসতে হবে। তা'তে Social run (সামাজিক গতি)-টাই চলবে towards evolution (বিবর্ত্তনের দিকে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার জিজ্ঞাসা করলেন—কটা বাজে?

ঘড়ি দেখে বলা হ'লো—দশটা পাঁচ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তাহ'লে এখনও খোয়াড়ি ভাঙ্গার যথেষ্ট সময় আছে। এক-একদিন যেন আমায় কথায় পায়। কথা আর ফুরোয় না। যখন যে idea (চিন্তাগুলি) মাথায় আসে, সেগুলি যদি খালাস ক'রে দিতে না পারি তাহ'লে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করি। আমার আবার ভাল লাগে যদি দেখি, তোমরা সাগ্রহে ঐগুলি workout (নিষ্পাদন) করছ ও সবার মধ্যে সঞ্চারিত করছ। আমি যেমন-যেমন বলি, তেমন-তেমন যদি চলতে থাক, তাহ'লে দেখবে দেবতারাও স্বর্গপুরী ছেড়ে তোমাদের মধ্যে বসবাস করবার জন্য লালায়িত হ'য়ে উঠবেন। এ-সব গল্পকথা নয়। বাস্তবেই এমনতর হ'তে পারে। কৃষির কথা বলছিলাম—কৃষি দিয়ে মানুষের পেট ভরাবে আর যাজন দিয়ে মানুষের মন ভরিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করবে. চরিত্রের ও অন্তরের দৈন্য ঘুচিয়ে দেবে।

পূজনীয় বাদলদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে বাদল!! কোনে যাস?

বাদলদা—একবার উমাদা-দের বাড়ীতে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আয় গিয়ে। রোদের মধ্যে একটা ছাতা নিয়ে গেলি পারতিস। আজকালকার রোদ ভাল না।

বাদলদা—আমি তেমন অসুবিধে বোধ করি না। তা' তুমি যখন ক'চ্ছ, নিয়েই যাই।

—এই ব'লে বাদলদা বাড়ীতে গেলেন ছাতা আনতে। ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), নিরুদা (রায়), অরুণ (জোয়ার্দ্দার), কালুদা (আইচ), পূণে ভাই, অক্ষয়দা (পুতুতুন্ড), মঙ্গলদা (বসু), অমূল্যদার মা, সুকুমারী মা, সুশীলাদি (সেন), ক্ষেত্রমা প্রভৃতি অনেকে আসলেন। এখন রীতিমত ভিড় জমে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে উচ্ছ্বসিতভাবে বলতে লাগলেন—আমাদের সমাজে উন্নতির পথ এস্তার খোলা ছিল, আর, অবনতির পথ রুদ্ধ করার জন্য যতরকমের clutch (গোঁজা) দিয়ে রাখা যায়, তা'ও রাখা হ'তো। প্রধান জিনিস ছিল Ideal (আদর্শ) ও eugenics (সুপ্রজনন)। উন্নতির ধারাটা বজায় রাখবার জন্য বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের ভিতর-দিয়ে good souls-এর (ভাল আত্মার) advent-এর (আগমনের) ব্যবস্থা ছিল। Future-এর (ভবিষ্যতের) দিকে চেয়ে eugenic reform-এর (প্রজননগত সংস্কারের) ব্যবস্থা চাই-ই। নচেৎ continuity (ক্রমাগতি) থাকে না, আজ যেখানে বিপুল উন্নতি, কাল সেখানে শ্মশান—এমনতর হয়। বহু সভ্যতা, বহু জাতি যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে ও হ'য়ে যাবার পথে, তার মূল কারণ আমার মনে হয় এখানে। সেইজন্য প্রতিলোম রূঢ় হস্তে বন্ধ করা লাগে। জাতির অস্তিত্ব যারা চায়, তারা কখনও প্রতিলোম সমর্থন করতে পারে না। অজ্ঞতা বা জিদ বশতঃ যদি কেউ তা' করে, সে কিন্তু বাস্তবে জাতির বিনাশের পথই উন্মুক্ত ক'রে থাকে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়েও যদি কেউ এটা প্রবর্ত্তন করতে চায়, তাহ'লেও আমি বলব, সে বিজ্ঞানের মধ্যেও অজ্ঞান ভরা, thorough observation-এর (পূর্ণাঙ্গ পর্য্যবেক্ষণের) অভাব আছে তার মধ্যে। Complex-এর (বৃত্তির) bias (পক্ষপাত) নিয়ে research (গবেষণা) করতে গেলে, তার মধ্যে অনেক error (ভ্রান্তি) এসে পড়ে।

ব্রজেনদা—বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গণ্যমান্য লোক প্রতিলোম সমর্থন করেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে সমর্থন করে এর কুফল সম্বন্ধে জানে না ব'লে, আবার, অনেকে জেনেশুনেও করে, তাদের মতলবই খারাপ।..............একদল যেমন class war (শ্রেণী-সংগ্রাম) করে, আমাদের তেমনি সংগ্রাম করা উচিত—সত্তাবিরোধী যারা, কল্যাণবিরোধী যারা তাদের সঙ্গে। তাদেরই বলে heathen (বিধর্ম্মী), মোনাফেক বা কাফের। অসৎ আচরণের কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই। দিলেই সর্ব্বনাশ। আমার class war (শ্রেণী-সংগ্রাম) হ'লো

এই। সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৎ যারা, তাদের আমরা সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তুলব এবং অসৎশক্তি মাথা তোলা দিয়ে যা'তে সত্তায় অপঘাত আনতে না পারে, সে চেষ্টা আমরা করব। ধর্ম্ম ও কৃষ্টির পরিবেষণের ভিতর-দিয়ে অসৎ-বুদ্ধির পরিবর্ত্তন যা'তে হ'তে পারে, সে চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। সবার পরিবর্ত্তন হবে না। কিছু লোক থাকবে, যারা ভয়ে ছাড়া অনুগত হবে না। বাস্তবে তাদের ক্ষতি না ক'রে, তারা যা'তে অন্যের ক্ষতি না করতে পারে, তেমনতর প্রস্তুতি রাখাই লাগবে। তাই আমি স্বস্তিসেবক বাহিনীর কথা এত ক'রে কচ্ছি আপনাদের। এদের কাজ হবে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি ও নিরাপত্তাকেই priority (অগ্রাধিকার) দিয়ে শিল্প ও স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতে হবে।

আমাদের বর্ণাশ্রমিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনই ছিল যে, সেই রাষ্ট্রে প্রত্যেক বর্ণের প্রধানরাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যাঁরা, তাঁরা স্থান পেতেন। তাই প্রকৃত সৎ ও মহৎ যাঁরা, তাঁদের একটা সংহত সমাবেশ ঘটতো। আজকালকার তথাকথিত গণতান্ত্রিক যুগে যে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত, তা'তে যে শ্রেষ্ঠ, দক্ষ, সৎ ও মহৎ ব্যক্তিরাই নির্ব্বাচিত হবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।.............. সে যা' হোক, যা আছে, তার ভিতর-দিয়েই অনেকখানি ভাল পাওয়া যেতে পারে, যদি মানুষগুলিকে ইষ্টপ্রাণ ক'রে তোলা যায়। ইষ্টপ্রাণতায় মানুষের সব powers (শক্তি) concentric (একমুখী) হ'য়ে effulge (চকচক) ক'রে বের হয়, alert inquisitiveness (জাগ্রত অনুসন্ধিৎসা) জাগে। সর্ব্বদা তার চোখ দেখে, নাক শোঁকে, কান শোনে, মাথা চিন্তা করে, শরীর কাজ করে—মানুষের মঙ্গলে সদাজাগ্রত সে।

ব্রজেনদা—আমরা সব বুঝেশুনেও ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বিব্রত আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লাসের সঙ্গে ডান হাতখানি উত্তোলন ক'রে)—Let the dead past bury their dead, take up the cross and follow me. (মৃতেরা মৃতের সৎকার করুক, তোমরা ক্রুশ হাতে নিয়ে আমাকে অনুসরণ কর।)—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর ঝম ক'রে উঠে কাজল ভাইয়ের ঘরের দিকে রওনা দিলেন। সকলেই মন্ত্রবৎ পিছনে-পিছনে তাঁর সঙ্গে গেলেন।

ওখানে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি মোড়ার ওপর পূর্ব্বাস্য হ'য়ে বসলেন। পূজনীয়া ছোটমা ও কাজল কাছে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ আপন মনে গান ধরলেন—

'ও! প্রাণে মধু ঢেলে দিল রে,
মধু ঢেলে দিল!'

মাথা দুলিয়ে গাইতে-গাইতে সকলের দিকে চেয়ে ফিক ক'রে হেসে দিলেন। মধুস্মৃতি বুকে ভরে আনন্দে ডগমগ হ'য়ে বাড়ী ফিরলেন সবাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। কিশোরীদা (দাস), প্যারীদা (নন্দী), প্রকাশদা (বসু), ডাক্তার কালীদা (সেন), জিতেনদা (চট্টোপাধ্যায়), ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী), লোচনাদা (ঘোষ), কালিদাসীমা, তরুমা, রেণুমা, রাণীমা, মঙ্গলামা, গৌরীমা প্রভৃতি অনেকেই কাছে আছেন।

একজন মিস্ত্রী কারখানায় একটি ছোট কাঠের আলমারি তৈরী করেছে। জিনিসটি কেমন হ'লো তা দেখাতে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ইন্দু মিস্ত্রী-দা (সরকার) আছেন। আলমারিটি মাটিতে রাখার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দরজা খোল তো।

দরজা খোলার পর বললেন—ভিতরে যে তাকগুলি করেছিস, আর একটু বড় ক'রে করলে ভাল হ'তো। একটু বড় কৌটো বা বয়েম যদি কেউ এর ভিতর রাখতে চায়, তা' রাখতে পারবে না।

ইন্দুদা—এগুলি খুলে ফেলে এখনও তা' করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার খোলাখুলি করতে গেলে জিনিসটার সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে যাবে। তাই খুলে আর দরকার নেই। কাজ করার সময় এমন হিসেব ক'রে করবি, যা'তে তার ব্যবহারিক উপযোগিতা বেশী হয়, অর্থাৎ তা' সম্ভবমত নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। এই আলমারিটা বেশী উ'চু নয়, এর মাথার উপরের কাঠটা যদি সামনের দিকে কিছুটা বাড়িয়ে দাও, তাহ'লে তা'দিয়ে একটা টেবিলের কাজ চলতে পারে। আমাদের গরীব দেশ, বেশী আসবাবপত্র করবার মতো সামর্থ্য সবার থাকে না, আবার করলেও সেগুলি রাখবার মতো জায়গা সবার জোটে না। তাই একই জিনিসের যা'তে রকমারি ব্যবহার হ'তে পারে, বুদ্ধি ক'রে তাই করবে। শরীর যেমন খাটাও, মাথাটাকেও তেমনি খাটাবে। যে যেখানে যে কাজ নিয়ে আছে, সেইখানেই সে সেই কাজের ভিতর-দিয়ে বাড়তির পথে চলছে এবং অন্যকে বাড়তির খোরাক জোগাচ্ছে—এমনটা দেখলে মনে হয়, কাজকর্ম্মের আয়োজন ও ব্যবস্থা যা' করা হয়েছে, সেগুলি সার্থক হ'য়ে উঠছে। বাড়তির একটা আবহাওয়া আছে। নিজের ভিতরে ও বাইরে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তুলতে হয়। তখন বড় আমেজ লাগে কাজে। বোঝা যায়, কাজ-কাম কত সুখের জিনিস।

কালীদা—কাজের প্রতি এত আসক্ত হ'য়ে লাভ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কাজের প্রতি আসক্তি বাড়লে, অন্ততঃ আলস্যের প্রতি আসক্তি ততটুকু কমবে। সেইটেই তো মস্ত লাভ। আলস্যের মতো শত্রু নেই। ওকে কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই। তারপর বাস্তব কাজের ভিতর-দিয়ে

ছাড়া মানুষের বাঁচা-বাড়ার কোন পোষণ জোগান যায় না। আর, তুমি যদি মানুষকে কোন পোষণ না দাও, মানুষ তোমাকে পোষণ দেবে কেন? আবার, অন্যের পোষণ ছাড়া তুমি কি বাঁচতে পার? তাহ'লে দেখ, কাজের প্রতি টান কতখানি প্রয়োজন। কাজের প্রতি টান কিছু খারাপ নয়, কিন্তু এটা কারও জন্য হওয়া দরকার। নইলে শুধু কর্ম্মপ্রিয়তা একটা রোগবিশেষ হ'য়ে দাঁড়ায়। তবু তা' মন্দের ভাল। যারা কাজ ভালবাসে না, কাজে যুক্ত হয় না মনপ্রাণ দিয়ে, নজর কেবল ফলের দিকে, তারা achieve (লাভ)-ও করতে পারে না কিছু। তাই বলে, 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্', আবার বলে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করার কথা। গীতার মতো practical philosophy of life (বাস্তব জীবন-দর্শন) কমই আছে।

কালীদা—আবার গীতার মধ্যে নৈষ্কর্ম্মের কথাও তো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকর্ম্মের প্রতি অর্থাৎ লোকমঙ্গল কর্ম্মের প্রতি মানুষের যখন একটা তীব্র ঝোঁকের সৃষ্টি হয়, তখন প্রবৃত্তিতাড়িত অনর্থপ্রসূ কর্ম্ম তার নিভে যেতে থাকে। এবং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, সেদিকে নজর দেবার ফুরসুত কোথায় তার? তাই আমার মনে হয়, তাকেই বলা যায় নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধ, যে ইষ্টকর্ম্মে চির অতন্দ্র। গীতার আগাগোড়া সবটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করতে গেলে, এর অন্য কোন অর্থ হ'তে পারে ব'লে আমার মনে হয় না।

এমন সময় একটি মা একটা এলুমিনিয়ামের পাত্র হাতে ক'রে এসে হাজির হলেন। মা'টি এসেছেন দিনাজপুর থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—তোর হাতে কী রে?

উক্ত মা—নাটোরের কাঁচাগোল্লা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি? কো'স কি? নাটোরের কাঁচাগোল্লা।............... দেখা তো দেখি।

মা'টি ঢাকনা খুলে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে-হাসতে)—বেশী সময় খুলে রাখিস না, খোসবয় বারায়ে যাবি। যা, বড়বৌয়ের কাছে দিয়ে আয় গিয়ে। একে বারিন্দির বামুন, তায় নাটোরের কাঁচাগোল্লা। বেশী সময় দেখলি কি আর রক্ষে আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের বালসুলভ আনন্দ দেখে সকলেই হাসছেন। এদিকে মা'টি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে মিষ্টি দিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেঞ্চের সামনে মাটিতে বসলেন। ব'সে বললেন—ঠাকুর! আমার একটা দুঃখ যে ছেলেদের মধ্যে কেউ ঠাকুর-মুখী হ'লো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর জন্য ভাবিস কেন? তারা তোকে ভালবাসে তো?

উক্ত মা—তা' বাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোকে যদি ভালবাসে, তবে তুই যাকে ভালবাসিস, তাকেও ভালবাসবে। জোর ক'রে ঠাকুর ভজাতে যাস না, তা'তে দূরে স'রে যাবে। বরং তোর ব্যবহার যেন এমন হয়, যা'তে তোর খুশির জন্য যা' করণীয়, তা' না ক'রেই পারে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ছড়া সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—ছড়াগুলি যখন পড়ে, তখন মনে হয় না যে আমার মুখ দিয়ে ঐগুলি বারাইছে। পরমপিতার দয়ায় মালগুলি উতরাইছে খুব। কেষ্টদা প্রথম যখন ক'লো, তখন যেন ফাঁপরে প'ড়ে গেলাম। কেষ্টদাও নাছোড়বান্দা। তারপর যা' মনে আসে কইতে লাগলাম। কেষ্টদা ক'লো, বেশ হচ্ছে, আমিও ভাবলাম, হয় তো হো'ক। 'Message'-এর লেখাও যে কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো, এখনও ভেবে পাই না। কেষ্টদা যেন কি কায়দা জানে, আমার কাছ থেকে মাল বের ক'রে নিতে পারে। নইলে আমি কখনও বুঝি না যে, আমি কিছু জানি এবং আমার কিছু কওয়া সম্ভব। সেইজন্য কেউ যদি এসে কয়—আমাকে কিছু উপদেশ দেন, আমি তখন যেন বোবার মতো হ'য়ে যাই, কোন কথা বেরোতে চায় না মুখ দিয়ে। কিন্তু প্রসঙ্গ উঠে গেলে কত কথাই হয়তো কওয়া হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—কিছু ছড়া পড়ে শুনোবি নাকি এ'দের?

প্রফুল্ল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এরপর ছড়ার খাতা আনা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরোণোগুলি না প'ড়ে, এই বছরে যেগুলি দিছি, তার থেকে কতগুলি পড়।

প্রফুল্ল—আচ্ছা। ১৯৪২ সালের গোড়া থেকে কিছু পড়ছি।

পড়া চলতে লাগলো—

স্বতঃস্বেচ্ছ অভিধ্যানে
　　ছুটলে আবেগ কাজের পথে
শিক্ষা তখন সহজ পায়ে
　　গজিয়ে ওঠে মনোরথে।

* * * * *

বৈশিষ্ট্যকে করলে হত
　　দেশের-দশের-জাতির ধুয়োয়
জ্ঞানের আলোক যায়ই নিভে
　　জীবন পড়ে মরণ-কুয়োয়।

* * * * *

যে-মনীষী জন্মেন যখন
সময় কালের গর্ত্ত ফুঁড়ে
সার্থকতায় অর্থ দিয়ে
বিরোধবার্ত্তা হটান দূরে।
* * *

গুণগরিমায় আঘাত দিয়ে
ক'সনে কথা সম্ভবমত
অনুরোধী আবেদনের
সুরে কথা ক'স নিয়ত।
* * *

ইষ্টানুগ সংহতিকে
বজায় রেখে সর্ব্বথা
সব ব্যাপারেই সকল কাজে
হিসাব ক'রে ক'স কথা।
* * *

বাক্যে আর কায়মনে
বস্তু কিংবা বিষয়ের
ইষ্টোচ্ছল নিয়ন্ত্রণই
সারমর্ম্ম ধেয়ানের।
* * *

সূক্ষ্ম সার্থক বিভেদ বিচার
সফল অনুভব
ক্ষিপ্র চিন্তা স্মৃতি কর্ম্ম
ধ্যানেরই বিভব।
* * *

বলা হ'লো—ধ্যান সম্বন্ধে আপনি ঐ ছড়া দুটো দিয়েছিলেন, এ বছরের ১০ই ফেব্রুয়ারী, তার পরের দিন ওর একটা ইংরেজীও ক'রে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সেটাও পড়।

পড়া হ'লো—

The psycho-physical moulding of objects and affairs to fulfil the interest of the Love-Lord, unfurling the faculties of perception, conception, distinction, sharp division and remembrance with a shortening of the

reaction-time is the fundamental of concentration and meditation.

এরপর আরো অনেকগুলি ছড়া পড়া হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর কিশোরীদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ডাক্তার! এগুলি বোঝা যায়?

কিশোরীদা—আমি তো লেখাপড়া জানি না, কিন্তু আমার তো অসুবিধা লাগলো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তো বুঝবাই, আমার সঙ্গে তোমার সা'ত আছে, কিন্তু বাইরের লোক বোঝে তাহ'লে সে হয়!

কিশোরীদা—বাইরের লোকেরও না বোঝার কোন কারণ দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত দাদা ও মায়েদের প্রায় প্রত্যেকের কাছে জনে-জনে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কি মনে হয়?

সকলেই একবাক্যে বললেন—কারও বোঝবার পক্ষে অসুবিধা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই হয়। লোকশিক্ষার প্রয়োজন আজ বড় বেশী। জীবনের পথে কিভাবে চলতে হয়, তাই-ই মানুষ জানে না। যারা যত লেখাপড়া করে, তারা আবার তত বেহেডের মতো চলে। লেখাপড়া শিখে সঙ্গতির বদলে অসঙ্গতিই বেড়ে যায়। তাই টোটকা কথার ভিতর-দিয়ে মেয়ে-পুরুষ সবাই যা'তে জীবন-চলনার রীতি-নীতি সম্বন্ধে অবহিত হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ছড়াগুলি যা'তে ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করা লাগে। Minimum (ন্যূনতম) এতটুকু conception (ধারণা) (ছড়াগুলির ভিতর-দিয়ে যতটুকু সম্ভব, অন্ততঃ ততটুকু) যদি থাকে, তাহ'লে মানুষ আর বেঘোরে পড়বে না। মায়েরা যদি ঘরে-ঘরে ছেলেপিলেদের নিয়ে সুরু করে, এগুলি রোজ আবৃত্তি করে, তাহ'লে অজান্তে অনেক ছড়া মুখস্থ হ'য়ে যায়। "আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।" আবৃত্তি মানে সম্যকভাবে থাকা, করা, স্বভাবের সাথে গেঁথে ফেলা। ছেলেপেলেরা তখন-তখন হয়তো সব জিনিসের মানে বোঝে না, কিন্তু জীবনের পথে নানা সংঘাতের মধ্যে প'ড়ে ঐগুলির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে থাকে।

ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী)—সে-কথা খুব ঠিক। ছেলেবেলায় যখন চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করা যায়, তখন ঐসব অমূল্য উপদেশের মর্য্যাদা ভাল ক'রে বোঝা যায় না, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা যত বাড়ে ততই বোঝা যায়, ওগুলি কি অমূল্য জিনিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছড়াগুলি যা'তে ঐভাবে চারিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করেন।

প্রভাসদা (চৌধুরী)—ওগুলি তাড়াতাড়ি বই আকারে ছাপিয়ে ফেলা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো কেষ্টদারা চেষ্টায় আছেই। আপাততঃ যদি আর কিছু

না-ও পার, অনুস্মৃতির মধ্যে যে slogan (আহ্বান)-গুলি আছে, ঘরে-ঘরে তার আবৃত্তি ও অনুশীলনের ব্যবস্থা কর। ঐটুকের মধ্যেও কম মাল নেই। পারিবারিক সৎসঙ্গের পর প্রত্যেক পরিবারে রোজ যদি ওগুলির আবৃত্তি হয়, তাহ'লে খুব ভাল হয়। সৎসঙ্গী-পরিবারের ছেলেপেলেদের ভিতর-দিয়ে তখন ওগুলি তাদের পরিবেশেও চারিয়ে যাবে। সব লাল হো জায়গা, শুধু লাল কেন সফেদ হো জায়গা—যা' শ্রদ্ধোষিত জ্ঞান আস্‌লে হয়। এ যদি শিকড় গাড়ে, আজেবাজে ism (বাদ) পাত্তা পাবে না। আর, এ শিকড় গাড়তে বাধ্য, কারণ, এ তোমাদের রক্তের জিনিস। ধার করা জিনিস নয় বা পরগাছা নয় যে গজিয়ে তুলতে হিমসিম খেয়ে যেতে হবে। একবার ঢেউ তুলে দিতে পারলে হয়, তখন দেখবে—

"পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান,
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে ঊর্জ্জী উদ্দীপনায় গর্জ্জে উঠলেন। চোখ-মুখের চেহারা তাঁর পালটে গেল। মধুর ওজস্বিতার মনোহর ভঙ্গী ফুটে উঠলো সারা দেহে।

কিছুক্ষণ নীরব গাম্ভীর্য্যে ব'সে রইলেন। কালিদাসীমা তামাক সেজে দিলেন। তামাক খেলেন। তামাক খাওয়ার পর কালিদাসীমার হাতে গড়গড়ার নলটি দিতে-দিতে সহজভাবে বললেন—আজ দুপুরে ঘুম হয়নি।

কালিদাসীমা—ঘুমের আর দোষ কী? দুর্ব্বল শরীরে সকাল থেকে কথাই তো থামছে না। অতো কথা বললে তো ভাল মানুষেরই মাথা গরম হ'য়ে যায়, ঘুম আসতে চায় না, আর আপনার তো শরীর ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত কথা আমার বলতে হয় কেন জানিস?

কালিদাসীমা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোদের অবাধ্যতার জন্য।

কালিদাসীমা—সে কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা কথামত চলিস না, তাই আমার শরীরকে কষ্ট দিয়েও বার-বার বলতে হয়। নইলে আমি কোন কথা বলতে তো বাকি রাখিনি। আবার, যদি দেখতাম, তোরা যা' শুনিছিস, সেগুলি নিজেরা স্বতঃ-দায়িত্বে অন্যকে শোনাচ্ছিস, তাহ'লেও এত বকার প্রয়োজন হ'তো না। কিন্তু তোরা যে পাথরের মতো অচল থাকিস, কথামত কাজ তো করিসই না, আবার কথাগুলি যে অন্যের কাছে পৌঁছে দিবি, তাও দিস না। লোকজন আস্‌লে দেখি, তোরা যেন বোবা হ'য়ে যাস। তাই শরীর ভাল থাকুক না থাকুক,

আমাকে একলাকেই বগবগ করতে হয়। তবে সাধারণতঃ আলাপ-আলোচনা করতে আমার ভালই লাগে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকতো তাঁর ভাগ্নে হৃদয়। হৃদয় মাঝে-মাঝে মামাকে তিরস্কার ক'রে বলতো—মামা! তুমি রোজ-রোজ এক কথা অতোবার কি বল? তা'তে নাকি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—বলবো তো, তা'তে শালা তোর কী? আমি এক কথা হাজারবার বলবো।

এই কথা শুনে সবাই হাসতে লাগলেন।

কালিদাসীমা যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। তাই লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সহাস্যে বললেন—আমি ও-কথা বললাম গল্পচ্ছলে, তোর কথা স্বতন্ত্র। কারও উপর দরদ বা সহানুভূতি থাকলে, তুই যেমনটা বলেছিস, অমনটাই বলা আসে।.....................লোকজনের সাথে যাদের আলাপ-সালাপ করবার, তারাই করে কত? আর তুই তো মেয়েছেলে! তবে মায়েরা যারা আসে, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও আলোচনা করাই ভাল—অনুকম্পী দ্যোতনা নিয়ে। বাইরে থেকে যারা আসে, তারা তোমাদের কাছ থেকে অনেকখানি আশা করে। আর আজেবাজে গল্প না ক'রে নিজেদের মধ্যে এই সব প্রসঙ্গ যত করতে পারবে ততই ভাল। তোমার দেখাদেখি আর পাঁচজনেও এটা সুরু করবে।

কালিদাসীমার মুখখানি প্রসন্নতায় ভরে উঠলো।

শ্রীযুত প্রমথনাথ সিংহ (গ্রামের এক ভদ্রলোক, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিবেশী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আত্মীয়তার সুরে)—কতদিন পরে দেখছি তোমাকে। ভাল আছ তো? ছেলেপেলে ভাল আছে তো?

প্রমথদা—ভাল আর কই? মাঝে-মাঝে এটা-সেটা লেগে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধানে থেকো। সদাচারে চ'লো। সদাচারে চললে রোগ-বালাই অনেক ক'মে যায়।

একটু পরে প্রমথদা চ'লে গেলেন।

প্যারীদা (নন্দী)—দেশের মধ্যে যে এত মানুষের অভাব, তার মূল কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল কারণ হ'চ্ছে বর্ণাশ্রম ও বিবাহে গোলমাল। প্রতিলোমের সূত্রপাত হয় শুনেছি প্রথম বেণের সময়। সে তো পৌরাণিক যুগের কথা। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে প্রতিলোম প্রশ্রয় পায় অশোকের প্রব্রজ্যা বিধানের থেকে। সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা, তারা তখন বিয়ে-থাওয়া না ক'রে হাজারে-হাজারে, কাতারে-কাতারে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে থাকে। ফলে অনেক ভাল-ভাল মেয়ে নিকৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'তে বাধ্য হয়। এ থেকেই আসে প্রতিলোম। প্রতিলোমে যে সর্ব্বনাশ হবার তা' হ'তে থাকে। তার রেশ এখনও চলছে। অনেকে মনে করে, প্রতিলোম সম্বন্ধে আর্য্যঋষিদের যে ঘোরতর

আপত্তি তা' কুসংস্কার ও গোঁড়ামির ফল। কিন্তু মানুষ জানে না ব'লেই এমনতর মনে করে। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহ যে, sperm (শুক্র) যদি ova-র (ডিম্বকোষের) তুলনায় less evolved (স্বল্প-বিবর্ত্তিত) হয়, এবং সেই less evolved sperm (স্বল্প-বিবর্ত্তিত শুক্র)-কে যদি ঐ more evolved ova (অপেক্ষাকৃত বেশী বিবর্ত্তিত ডিম্বকোষ)-কে fertilize (উদ্ভিন্ন) করতে হয়, সেখানে natural law-এর (স্বাভাবিক বিধির) বিরুদ্ধে যেন একটা outrage (বলাৎকার) করা হয়। এতবড় প্রকৃতিবিরুদ্ধ অপচেষ্টা অনাসৃষ্টিরই কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই প্রতিলোম সন্তানের জেহাদই হয় সত্তার বিরুদ্ধে, উৎসের বিরুদ্ধে, কৃষ্টির বিরুদ্ধে। ভাল যা', তা' খতম করতে না পারলে সে যেন মনে করে তার জীবন নিষ্ফল। এই ধ্বংসের ব্যাপারে তার উগ্র আগ্রহ, অসম্ভব জেল্লা। প্রতিলোম সন্তানদের তাই শাস্ত্রে বাহ্যজাতি ক'রে রেখেছে। ওদের এমন সর্ব্বনাশা বুদ্ধি যে, ওদের যদি সমাজের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়, তবে সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষগুলিকে contaminate (সংক্রামিত) ক'রে সারা সমাজকে ছয়লাপ ক'রে দিতে পারে। তাই আমাদের সমাজের একটা তীব্র দৃষ্টি ছিল যা'তে প্রতিলোম কিছুতেই না ঘটতে পারে। আমাদের সমাজ কোনদিন ব্যভিচারকে বরদাস্ত করেনি। তবু সবর্ণ ও অনুলোম ব্যভিচারকে বরং পরিশুদ্ধ ক'রে তোলবার উপায় বাতলিয়েছে, কিন্তু প্রতিলোমকে পরিশুদ্ধ ক'রে তোলার কোন পন্থা বাতলাতে পারেনি। প্রতিলোম বিবাহের সম্ভাবনা যা'তে ক'মে যায়, সেইজন্য আশ্রম-পারম্পর্য্যহীন সন্ন্যাস গ্রহণে আপত্তি ছিল। কারণ, নির্ব্বিচারে আশ্রম-পারম্পর্য্যহীন সন্ন্যাসগ্রহণের বিধান থাকলে, মেয়েদের উপযুক্ত পাত্র জোটার অসুবিধা হয়।.................শাস্ত্রে একটা কথা আছে —

"বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
স্বকর্ম্মচ্যুতৌ হি তৌ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ।"

কিন্তু সমাজ-শাসন শিথিল হওয়ায় বৈশ্যরা ধীরে-ধীরে ইষ্ট-কৃষ্টি ব্যতিক্রমী হ'য়ে উঠলো, কাম-কাঞ্চন-বশ হ'য়ে উঠলো, ধর্ম্মার্থে দান বন্ধ ক'রে দিলো। তার ভিতর-দিয়েও কিন্তু বর্ণাশ্রমের কম ক্ষতি হয়নি। একে অনিয়ন্ত্রিত জীবন, তায় হাতে বহু টাকা, সর্ব্বোপরি তাদের মন্ত্রণাদাতা হ'লো সুন্দরী বউরা। তারা ঘাড় বেঁকিয়ে বলতো—ওসব ভিখিরী বামুনদের প্রশ্রয় দিও না। আর কি বাবুদের তা' মান্য না ক'রে রেহাই আছে? এইভাবে বিপ্রদের সম্মান ক'মে গেল, জীবিকার উপায় যে স্বতঃস্বেচ্ছ শ্রদ্ধার অবদান, তাও ক'মে গেল। তখন তারা পেট ও প্রবৃত্তির দায়ে অন্য কাজ করতে বাধ্য হ'লো, সমাজের জন্য তাদের যা' করবার তা' আর করতে পারলো না। এতে সমস্ত সমাজই বঞ্চিত হ'লো। বৈশ্যের সহযোগিতা না পেয়ে ক্ষত্রিয়রাও হীনবল হ'য়ে পড়লো। বৈশ্যের

বাড়াবাড়ি দেখে এখন আবার শূদ্রশক্তি জেগে উঠছে তাদের বিরুদ্ধে। তাই আজ labour caiptalist problem (ধনিক-শ্রমিক সমস্যা) এত উগ্র। কিন্তু বৈশ্য-প্রাধান্যে বা শূদ্র-প্রাধান্যে সমাজে কল্যাণ নেই। কল্যাণ নিহিত আছে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রাধান্যে। তাঁর অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে প্রত্যেকটি বর্ণ যদি বৈশিষ্ট্যানুগ চলন, বিবাহ ও পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে চলে, তাহ'লে দেখবে, দেশে আর মানুষের অভাব তো থাকবেই না বরং সারা দেশ সবদিক দিয়ে এত উন্নত হ'য়ে উঠবে যে দুনিয়ার তাক লেগে যাবে।..............তাই তোমরা আর ব'সে থেকো না। তীব্র সম্বেগে লোক-সংগ্রহে লেগে যাও।

প্যারীদা—সৃষ্টির পিছনে পরমপিতার উদ্দেশ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লীলা—আলিঙ্গন ও গ্রহণ। তোমার যদি পরিবেশ ব'লে কিছু না থাকে, কোন জায়গা থেকে কোন impulse (সাড়া) যদি না পাও, তাহ'লে কি তুমি নিজেকে বোধ বা উপভোগ করতে পার? তোমার বুকখানা হয়তো কাউকে ভালবাসতে চায়, কিন্তু যাকে ভালবাসবে, তেমন কারও অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহ'লে বুক-চাপড়ান ছাড়া আর কি পথ থাকে? আত্মোপভোগের জন্যই তাঁর এতরূপে আত্মপ্রকাশ। সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহরূপে তিনি যখন নরলীলায় অবতীর্ণ হন, এবং তাঁর সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ ক'রে মানুষ যখন তাঁরই ছন্দানুবর্ত্তী হ'য়ে চলে, দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম সত্ত্বেও মানুষ তখন বুঝতে পারে—জীবন কত মধুর, সৃষ্টি কত সুন্দর।

প্রকাশদা (বসু)—সন্ন্যাসের প্রশংসা তো ধর্ম্মগ্রন্থে খুব দেখা যায়। কিন্তু আপনি সন্ন্যাসকে অনুমোদন করেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাসকে অনুমোদন করব না কেন? কিন্তু সেটা বিধিমাফিক হওয়া চাই। প্রকৃত সন্ন্যাসী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীচৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, রসুল, যীশুখ্রীষ্ট ইত্যাদি। শিবাজী রাজ্য জয় ক'রে রামদাসকে দিয়ে ফকির হলেন, আবার রামদাসেরই আদেশমত তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য-পরিচালনায় রত হলেন—লোককল্যাণার্থে এই যে আচার্য্যনিষ্ঠ কর্ম্মমত্ততা, আমি একেই বলি সন্ন্যাস। সতী স্ত্রীরা কম সন্ন্যাসী না। সতী স্ত্রীর সতীত্বের সার্থকতা আবার স্বামীকে ইষ্টপ্রাণ ক'রে তোলায়। তা'তে আবার তারই লাভ। ইষ্টপ্রাণ স্বামীর স্ত্রী পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য স্বামীকে পেয়েও মনে করে যেন গঙ্গাস্নান ক'রে উঠলাম। সেই পাঁচ সেকেণ্ডের মধুময় স্মৃতি বর্ণনা করতে, সে একখানা 'মহাভারত' রচনা ক'রে ফেলতে পারে। ভালবাসা চিরকালই অন্তহীন, তার কোন ইতি নেই। ভালবাসাই ব'লে দেয় যে আমরা অমর, আমরা অনন্ত। তাই অনুরাগী ভক্ত যে, যাজন তার কাছে মদের নেশার মতো, তা' ছেড়ে সে থাকতেই পারে না। কথাও তার ফুরোয় না, প্রেষ্ঠের কথা কত রকম ক'রে বলে,

তবু মনে হয়, কিছুই বলা হ'লো না। ব্যাকুল আবেগে কত সময় ঝর-ঝর ক'রে কেঁদেই ফেলে। তার সে বোবা কান্না শক্তিশালী ভাষার থেকেও শক্তিমান হ'য়ে ক্রিয়া করে মানুষের মধ্যে। এই যাজন-উন্মাদনা স্বাস্থ্যকেও ভাল ক'রে তোলে ....যাজন যেমন করতে হবে, সঙ্গে-সঙ্গে সংহতি যা'তে আসে তা'ও করতে হবে। চিনি জ্বাল দিয়ে ঢেলে রাখলেই মিছরি হয় না, কতকগুলি সুতো লাগে, পরস্পর সঙ্গতিসম্পন্ন ইষ্টপ্রাণ কর্ম্মীরাই সেই সুতো। Cell (কোষ)-গুলির পরস্পরের মধ্যে টান আছে ব'লেই system (বিধান) গ'ড়ে ওঠে। ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে কর্ম্মীদের পরস্পরের মধ্যেও তেমনি টান দরকার, নইলে organization (সংগঠন)-এর ভিতর cohesive force (সংযোজক শক্তি) থাকে না।

প্রকাশদা—আমরা বুঝি সব, জানি সব, কিন্তু করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোঝা একটা জিনিস, জানা অন্য জিনিস, বুঝগুলি apply (প্রয়োগ) ক'রে জানতে হয়। কঠিন কিছু না, 'হ্যাঁ' আর 'না'-এ যতটুকু তফাৎ, পারা আর না-পারায় ততটুকু তফাৎ।..............যতই শোন, শুনে যতই উদ্দীপ্ত হও, কাজে যদি না কর, সব উদ্দীপনা সার্থকতা হারিয়ে লয় পেয়ে যাবে, তা' তোমাকে দিন-দিন আরো স্থবির ক'রে তুলবে।..............সব কথার শেষে আবার তাই স্মরণ করিয়ে দিই—আমাদের আশু প্রয়োজন হ'লো—মানুষ, কয়লা, টাকা, মাটি।

৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৯ (ইং ২৪।৯।৪২)

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আজ সকালে বরিশালের উৎসব-অন্তে আশ্রমে ফিরেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের দক্ষিণ দিককার বারান্দায় তক্তপোষে ব'সে আছেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে এসে বসেছেন। অনেকে এসে প্রণাম করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কাছে খবরাখবর নিচ্ছেন। আগেই খবর পেয়েছেন যে কেষ্টদা এসেছেন। তাঁর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আসতে একটু দেরী হ'চ্ছে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর উসখুস করছেন। মাঝে-মাঝে ডানদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। এমন সময় কেষ্টদা এসে হাজির হ'লেন। কেষ্টদাকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে গেয়ে উঠলেন—রুমুর্-ঝুমুর্, রুমুর্-ঝুমুর্, কে এলে নূপুর পায়।

কেষ্টদাও হাসতে-হাসতে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। পণ্ডিতের হাতে একটা হাঁড়ি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কী মাল রে?

পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য)—মিষ্টি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী মিষ্টি রে?

পণ্ডিত—রাণাঘাটের পানতুয়া, লালমোহন, লেডিকিনি ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জবর মাল আনছিস তো? কড়া মিষ্টি আছে তো? আজকাল যুদ্ধের বাজারে চিনির অভাব, তাই বেশীর ভাগ মিষ্টি জলোজলো লাগে। মিষ্টি যদি মিষ্টি না হয়, তাহ'লে তার খায় কি?

পণ্ডিত—মিষ্টি ঠিক আছে ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনার আগে খায়ে দেখিছিলি?

পণ্ডিত—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাবার জিনিস আনতে গেলে আগে খেয়ে দেখা ভাল।

এরপর পণ্ডিতভাই শ্রীশ্রীবড়মার কাছে মিষ্টি দিয়ে আসলেন।

কেষ্টদা একটু দূরে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে ঝাঁকি মেরে বললেন—কাছে আগায়ে আসেন গল্প শুনি।

কেষ্টদা এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের তক্তপোষের কাছাকাছি বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার চোখে চোখ রেখে সহাস্য চাউনিতে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন হ'লো?

কেষ্টদা—ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যখন যেয়ে পড়েছেন, ভাল হবেই এ-ধারণা আমার ছিল।

কেষ্টদা (সহাস্যে)—ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। আমি তো দেখি, যা হয় আপনার দয়াতেই হয়, আমরা শুধু নিমিত্ত মাত্র। তবে প্রমথদা (দে) খুব খেটেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রমথদা খুব methodical (শৃঙ্খলাসম্পন্ন), sense of responsibility (দায়িত্বজ্ঞান)-ও আছে। বেচারির শরীর ভাল নয়, তাহ'লে আরো অনেক কাজ হ'তো ওকে দিয়ে।..............এবার শরীর কেমন দেখলেন?

কেষ্টদা—ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপাতত ভাল থাকলেও শরীর খুব ঘাতসহ নয়। সাবধানে থাকতে ব'লে আসছেন তো?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগেশদার সম্বন্ধেও আমার ভয় ছিল। তাই পই-পই ক'রে কত সাবধান ক'রে দিতাম। কিন্তু কথা না শুনলে কি করব? অনেকে শুধু কাজ দেখিয়েই আমাকে খুশি করতে চায়। কিন্তু তারা ভাল না থাকলে যে আমি খুশি হই না, তা' আর বোঝে না। ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা এই দুইয়ের সামঞ্জস্য চাই, নইলে গোলমাল হ'য়ে যায়। আপনাদের প্রত্যেকের সুস্থ, সুদীর্ঘজীবন আমারই স্বার্থ। আমার স্বার্থ বিবেচনায় তা' যদি সংরক্ষণ না করেন, তাহ'লে কিন্তু ইষ্টস্বার্থেরই হানি হয়। আর, ইষ্টস্বার্থ হনন করলে

ইষ্টপ্রতিষ্ঠাও বেশীদিন করা যায় না। কাজের অছিলায় অমনতরভাবে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করার পিছনে imbalance (অব্যবস্থতা) থাকে, martyr (ধর্ম্মার্থে আত্মোৎসর্গকারী) সাজার complex (প্রবৃত্তি) থাকে। ওর ভিতর ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধির থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি প্রবল থাকে।

কেষ্টদা একটু অপ্রতিভভাবে চেয়ে রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার analysis (বিশ্লেষণ) খুব cruel (নিষ্ঠুর) হ'তে পারে, কিন্তু বহুর ভাগ স্বতঃস্বেচ্ছ আত্মদানের ক্ষেত্রেই এমনতর দেখতে পাবেন। আমি বলি—যদি কোন cause (উদ্দেশ্য) আমি ভালই বাসি তবে সেই cause (উদ্দেশ্য)-কে successful (সফল) করবার জন্যই তো আবার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। মৃত্যুর কাছে, অসাফল্যের কাছে কেন তাড়াতাড়ি yield (আত্মসমর্পণ) করতে যাব? প্রাণপণ চেষ্টা করব আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। এ কিন্তু হীন স্বার্থের কথা নয়। এ জীবন পরমপিতারই দান। তাঁর এ প্রীতি-অবদান আমি সহজে কিছুতেই খোয়াব না। সেই আকূতি থাকলে মাথা চিরে বুদ্ধি বেরোয়, মানুষ কুশল-কুশলী হ'য়ে ওঠে, অন্যে যেখানে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে, সে সেখানে সুকৌশলে আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে অব্যাহত রেখে মৃত্যুকে এড়িয়ে যায়। মৃত্যুকে বরণ করার থেকে এ সাধনা অনেক বড় সাধনা। এর মধ্যে tragedy (বিয়োগান্ত নাটকের) dazzle (চোখ-ধাঁধান ঔজ্জ্বল্য) নেই, কিন্তু আছে comedy-র (মিলনান্ত নাটকের) struggle (সংগ্রাম)। এই struggle (সংগ্রাম)-এর ভিতর-দিয়েই মানুষ evolve ক'রে ওঠে (বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে)। অবশ্য আমি এ-কথা বলি না যে, আদর্শ বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোন ক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণের প্রয়োজন নেই, এবং সব ক্ষেত্রেই তা' আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি-প্রণোদিত। অনিবার্য্য প্রয়োজন ও সাত্ত্বিক আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও আছে। নফর কুণ্ডু যেমন একটা ছেলের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। অবশ্য আমার মনে হয়, মানুষের বুদ্ধি যত বিকশিত হবে, সে ততই মৃত্যুকে এড়িয়ে মনুষ্যোচিত মহত্তম কর্ত্তব্য যা'-কিছু সেগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হবে।

কেষ্টদা—যীশুখ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ সম্বন্ধে আপনি কী বলতে চান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুখ্রীষ্টের প্রাণ দান প্রয়োজন হয়েছিল তৎকালীন নিষ্ঠুর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তাঁর শিষ্যবর্গের ঔদাসীন্য ও অদূরদর্শিতার জন্য। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁর অমনতর মৃত্যুকে অনিবার্য্য প্রয়োজন ক'রে তুলেছিল, কিন্তু অন্ততঃ তাঁর শিষ্যবর্গ যদি আরো অনুরক্ত, শক্তিমান ও সুকৌশলী হতেন, তাহ'লে এ মৃত্যু যে avoid (পরিহার) করা যেত না, তা' আমি মনে করি না। আর, তাঁর crucifixion (ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যু) যে divine decree (ভাগবৎ

বিধান) আমি তাও মনে করি না। যদিও আমার মনে ধাক্কা মারে যে তিনি বেঁচেই ছিলেন।

কেষ্টদা—যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুকে অবলম্বন ক'রেই তো তাঁর প্রচার আরো ত্বরান্বিত হ'লো। তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে তো তাঁর মৃত্যু কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নৃশংস হত্যার ভিতর-দিয়ে তাঁর যে অকালমৃত্যু ঘটলো, এটা মন্দই, এই মন্দের ভিতর-দিয়ে যতখানি ভাল করা যায়, তা' তাঁর শিষ্যবর্গ পরবর্ত্তীকালে করেছিলেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এর থেকে ভাল হ'তো না। তাঁর জীবনই যে পৃথিবীর মহাসম্পদ্, তাঁর একটা নিঃশ্বাসের বাতাসে জগতের যত মঙ্গল হয়, তার কি কূল-কিনারা করতে পারি আমরা? তিনি বেঁচে থাকলে মানুষগুলিকে আরো কতখানি গ'ড়ে দিয়ে যেতে পারতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে অতো তাড়াতাড়ি হয়তো বিকৃতি আসতে পারতো না। তারপর ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনচলনা সম্বন্ধে আরো কত হয়তো বিশদ নির্দ্দেশ পাওয়া যেত।

কেষ্টদা—যীশুখ্রীষ্টের যে কথাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিই কি মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fundamental (মূল) কথাগুলি যীশুখ্রীষ্টের বলা থাকলেও আরো অনেক কথা বলার হয়তো বাকী ছিল। যদি বৈশিষ্ট্যানুপাতিক grouping (বিভাগ) ও proper marriage system (বিহিত বিবাহ-প্রথা) introduced (প্রবর্ত্তিত) না হয়, তাহ'লে ভিতটাই থেকে যায় কাঁচা। Religion (ধর্ম্ম) বা morality (নৈতিকতা) সেখানে ভালভাবে শিকড় গাড়তে পারে না। ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যথেষ্ট হ'য়ে থাকলেও সমাজ-ব্যবস্থা বা বিবাহ-ব্যাপারে সেখানে খাঁটি-খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিধান এখনও চালু হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে তথাকথিত বিজ্ঞানের চর্চ্চা ইদানীং কম হ'য়ে থাকলেও, আগে আমাদের ঋষিরা ছিলেন অত্যন্ত science-minded (বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন)। সমাজসংস্থিতির জন্য যে-বিজ্ঞান সব চাইতে বেশী প্রয়োজন সেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ছিল প্রখর। তাই সংহিতা-গুলির ভিতর দেখা যায়, বর্ণ-বিধান ও বিবাহের প্রতি কতখানি তীক্ষ্ণ নজর। তাঁরা সূত্রাকারে কথাগুলি ব'লে গেছেন, সব জায়গায় reasoning (যুক্তি)-গুলি unfold (প্রকাশ) করেননি। তাই অনেক সময় ওগুলি narrow dogmatic assertion-এর (সঙ্কীর্ণ স্বমতপোষক সদম্ভ উক্তির) মতো মনে হয়, কিন্তু আসলে তা' নয়। অনেক experiment (পরীক্ষা) ও observation (পর্য্যবেক্ষণ)-এর ফলে ঐ সব generalization (সাধারণ নীতি-নির্দ্ধারণ) তাঁরা করেছেন। আপনাদের কাজ হ'লো, ঐগুলির scientific

causal relation (বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণ-সম্পর্ক) unfold (উদ্ঘাটিত) করা। ইউরোপ, আমেরিকার অস্তিত্বের জন্য সেখানে এই তত্ত্বের উদ্ঘাটনের প্রয়োজন আছে। ওখানে সামাজিক প্রথা হিসাবে কতকগুলি জিনিস ভাল আছে, তাই এখনও ঠাট বজায় আছে। কিন্তু ওখানকার সমাজব্যবস্থা ও বিবাহ-পদ্ধতি যদি শাশ্বত বিজ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহ'লে কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা তাদের সব উন্নতি সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করতে পারবে না। আমি তো ভাল ক'রে সব খবর রাখি না। আপনাদের কাছে যা' শুনি তা'তে এমনতরই মনে হয়। শুধু ইউরোপ, আমেরিকা কেন, যে-দেশই সুপ্রজননের উপযোগী বৈজ্ঞানিক সমাজবিধান ও বিবাহ-প্রথার আশ্রয় গ্রহণ না করবে, সে-দেশই কালের কবলে প'ড়ে যাবে। তাদের হাজারো achievement (কৃতিত্ব)-ও তাদের দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না। হাউইবাজীর মতো তারা দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে ফট ক'রে মিইয়ে যাবে। ভারত যে সহস্র-সহস্র বৎসর ধ'রে তার কৃষ্টি ও সভ্যতা নিয়ে বেঁচে আছে, এখনও যে এদেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মানুষের জন্ম হয়, তার মূলে আছে ভারতের ঋষি-প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রম ও বিবাহ-প্রথা। বাইবেলে আমরা যতটুকু যা' পাই, তার কোন-কিছুই আর্য্যকৃষ্টির বিরোধী নয়। মনে হয়, দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক একই কথা। কিন্তু তিনি সব কথা ব্যক্ত করার সময় পেলেন কই? তাই তাঁর বাঁচার প্রয়োজন ছিল কত বেশী, তা' তো সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষ জেনেশুনে তো অনেক ভুল করেই, কিন্তু না জেনেও মানুষ অনেক ভুল করে। সেইজন্য মহাপুরুষরা এসে মানুষকে সত্যিকার পথ জানিয়ে দিয়ে যান। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, এমন কি ভারতেতর এশীয় দেশগুলিরও সুষ্ঠু সমাজবিন্যাস ও বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে যথাযথ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটেনি। সেদিক দিয়ে আপনাদের ঢের করণীয় আছে। আগে বাংলাকে ঠিক করুন। আমার মনে হয়, বাংলাকে ঠিক করতে পারলে ভারতকে ঠিক করতে বেশী দেরী লাগবে না। আর ভারত ঠিক হ'লে জগতেরও ঠিক হবার পথ খুলে যাবে। আমার বলতে ইচ্ছা করে—Bengal is the key to India and India is the key to the World (বাংলা ভারতের চাবিকাঠি এবং ভারত জগতের চাবিকাঠি।) ....আমার কথা মনে আছে তো?—মানুষ, মাটি, টাকা, কয়লা! আসছে কনফারেন্সে ভাল ক'রে move (প্রোৎসাহন) দেন।

একটানে কথাগুলি ব'লে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থামলেন। হরিপদদা (সাহা) শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার আনমনাভাবে তামাক খাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে রীতিমত ভিড় জমে গেছে মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। এতক্ষণ

সবাই মুগ্ধ অন্তরে শুনছিলেন তাঁর উদ্দীপনী অমৃতবচন, আর দেখছিলেন তাঁর মোহনমধুর বয়ান। এখন কথা থেমে গেছে, তাই সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছেন তাঁর দিব্য সান্নিধ্য, আর উন্মুখ হ'য়ে আছেন বচনসুধাপানের আশায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার অন্তরঙ্গভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলেন—ঘুরে তো আসলেন, মানুষ-টানুষ চোখে পড়লো নাকি? বরিশালের মানুষগুলি প্রায়ই রোখা হয়। রোখা মানুষ না হ'লে আবার কাজ হয় না। অবশ্য রোখটা সৎরোখ হওয়া চাই।

কেষ্টদা—না! আপনি যেমন মানুষের কথা কন, তেমন মানুষ তো চোখে পড়ল না। সব সময় তো ঐ খোঁজেই থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার হইছে সেই সাধুর দশা। এক সাধু ছিল, সে অনেক সময় অচৈতন্য হ'য়ে পড়তো, লোকে মনে করতো সমাধি হয়েছে। যেই তথাকথিত সমাধি ভেঙ্গে যেতো অর্থাৎ চেতনা আসতো, সেই-সে বলতো—রুপেয়া ফেকো! রুপেয়া ফেকো! ব্যাধিই হোক আর সমাধিই হোক 'রুপেয়া ফেকো' কথা তার মাথা থেকে যেত না। আমারও তেমনি, যত যাই-কিছু হোক, ঘুরে-ফিরে এক কথা—'মানুষ ফেকো' 'মানুষ ফেকো'। এই কাঙ্গালপনা আর এ জীবনে ঘুচবে না। আর ব্যাপারও গুরুতর, ওষুধ করতেও মানুষ মেলে না। ভাঙ্গাচোরা, অপুষ্ট, অপরিণত ছাড়া একটা আস্ত মানুষ চোখে পড়ে না। আপনাদের যত দোষই দিই, তবু আপনাদের মতো মানুষ তো আর একটাও আসছে না। মানুষগুলি যেন স্বার্থপ্রত্যাশার ঝুড়ি। মহৎ কিছুর জন্য, মহৎ কারও জন্য নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার বুদ্ধি নেই। বেশীর ভাগ এই মতলব নিয়ে চলে—কোথা থেকে কোন্ ফাঁকে নিজের জন্য কি বাগাবে। অমনতর হাভাতে যারা, দৈন্যদুষ্ট যারা, তাদের কাছে কি কখনও মানুষ ভেড়ে? না, ভিড়লেও কিছু পায়? রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন—শকুনি ওড়ে উঁচুতে, কিন্তু দৃষ্টি ভাগাড়ে। যাজন যারা ক'রে বেড়ায়, তাদের মধ্যেও অনেকের দৃষ্টি ঐ স্বার্থ-ভাগাড়ে। ধর্ম্মকথার উচ্চস্তরে যতই উড়ে বেড়াক না কেন, অনেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ স্বার্থ-প্রত্যাশার হীন স্তরে। কেউ চায় টাকা, কেউ চায় মান-যশ-খাতির, কেউ চায় অন্যকে down (নীচু) ক'রে নিজে বড় হ'তে, যোগ্য না হ'য়েও মানুষের উপর প্রভুত্ব করতে। আর, এ সবের পেছনে প্রায়ই গুঁড়ি মেরে থাকে sex-complex (যৌন-প্রবৃত্তি)। এইরকম হ'লে কি আর কাজ হয়? তবে ভরসার কথা এই যে, সবাই এমনতর নয়। কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য আরো বহু শুদ্ধ সত্তার প্রয়োজন। আমার মনে হয়, তারা সব নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জন্ম নেবার মতো ঠাঁই পাচ্ছে না। ঠিকানা পাচ্ছে না। দ্বারে-দ্বারে করাঘাত ক'রে বেড়াচ্ছে। যেখানে নিষ্ঠা নেই, পবিত্রতা নেই, সদাচার নেই, সংযম নেই, বিহিত সুসংস্কার নেই, সেখানে তো আর তারা আসতে পারে না। তাই তো আপনাদের কাছে অতো ক'রে কই

দীক্ষার কথা, বিবাহ-সংস্কারের কথা, সুশিক্ষার কথা, পরিবারগুলিকে আর্য্যাচারে অভ্যস্ত ক'রে তোলার কথা। সাত্ত্বিক আচার, নিয়ম, বিধি, বিধানগুলিকে যদি revive (পুনরুজ্জীবিত) না করেন, তাহ'লে কিন্তু শুধু philosophy-র (দর্শনের) lecture (বক্তৃতা) ঝেড়ে কাজ হবে না।

কেষ্টদা—আমাদের যাজন তো আজকাল বহু ক্ষেত্রে lecture (বক্তৃতা) ঝাড়াতেই পর্য্যবসিত হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো হ'লো না। যাজন বলতে আমি কি বুঝি, তা' আমি বলিনি?

কেষ্টদা—হ্যাঁ! বলেছেন বই কি। আপনার স্পষ্ট ক'রে বলা আছে—'যাজন মানেই হ'চ্ছে, মানুষের সংসর্গে গিয়ে বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, সাহচর্য্যে ও সাহায্যে বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে নিজের ইষ্টপ্রাণতাকে সেবাপটু দক্ষতার অনুপ্রাণনে এমনতরভাবে তাদের ভিতরে চারিয়ে দেওয়া—যা'তে তারা তোমার ইষ্টপ্রাণতায় আকৃষ্ট, উদ্বুদ্ধ ও অনুরঞ্জিত হ'য়ে তোমার ইষ্টে এমনতর অটুট ও আপ্রাণভাবে যুক্ত ও অনুরক্ত হ'য়ে ওঠে, যার ফলে স্বতঃশ্রদ্ধা ও ভক্তির উৎসারণে তারা পূজায়, যজ্ঞে, দানে, তৎসঙ্গমে অস্তিবৃদ্ধির অমৃতকৃষ্টিতে সহজ আপ্রাণ আলিঙ্গনে নিরন্তর হ'য়ে ওঠে!'

আবার এ-কথাও বলা আছে—যাজন যখনই যজনকে অনুসরণ করে না, তখন তার উপসংহারে ব্যষ্টি, সমাজ ও জাতির ধ্বংসকেই নিমন্ত্রণ ক'রে আনে; কারণ, মানুষকে যা' উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলছে, তা' যদি অনাচরণজনিত দোষে ক্লিষ্ট হ'য়ে অবসন্ন হ'য়ে থাকে, সেই অবসন্নতার ভিতর-দিয়ে ignorance (অজ্ঞতা) তাকে অধিকার ক'রে বিকট-বিক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অনবরত প্রয়াস প্রায়—তাই, যিনি যাজক, তিনি যদি Ideal-এ (ইষ্টে) thoroughly interested (সম্যক্‌ভাবে-অন্তরাসী) ও আচারবান্ না হ'য়ে যাজন করতে যান, তবে তা' সমূহ বিপদেরই কথা!

আমরা যজনহীন বাক্‌সর্ব্বস্ব যাজন করতে গিয়ে সেই বিপদই ডেকে আনছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যজন না থাকলে, আচরণ না থাকলে কথায়ই কি জেল্লা হয়? কথার মতো কথা কইতে পারলে তা'তেও অসম্ভব কাজ হয়। আমাদের উদ্দেশ্যই যে ঠিক থাকে না, তা' কথা কইব কি? Thoroughly (সম্যক্‌ভাবে) ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'লে কথাই ঠিকভাবে কইতে পারে না। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতার নামে যেখানে আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্নতা active (সক্রিয়) হ'য়ে চলে, সেখানে libido (সুরত)-ই অনেকখানি distortion-মুখী (বিকৃতি-মুখী) হ'য়ে থাকে। অমনতর কপটতা থাকলে কথাই খোলে না। কথার মতো কথা কইতে পারলে মানুষকে মাত ক'রে দেওয়া যায় না? সক্রিয় ইষ্টমুগ্ধতা ও

ইষ্টপ্রীত্যর্থে লোককল্যাণতৎপরতা যার মধ্যে সজাগ ও উদগ্র হ'য়ে থাকে, তার কথার ভিতরও ঐ spark (ঝিলিক) থাকে। কেউ-কেউ একটা পুরো নাটক একক অভিনয় করে, দেখেননি? বিচিত্র ভাব ও রসের অভিব্যক্তি সে একাই দেখিয়ে যায়। তন্ময় হ'য়ে যাজন যে করে, তার ভিতরও তেমনি কত ভাব ও রসের স্ফুরণ যে হয় তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃত যাজক যে, সে যাজন করতে-করতে প্রভুর বিশ্বরূপ দেখে, আর সশ্রদ্ধ, শুশ্রূষু শ্রোতা যে, সেও তার ভিতর-দিয়ে ঐ প্রভুরই বিচিত্র রূপ উপলব্ধি করে। বিশ্বরূপ দেখা মানে নানামূর্ত্তি দেখা নয়, ইষ্টের চরিত্রে যে অফুরন্ত, অনন্ত গুণ আছে, বিশ্বতোমুখী বৈভব আছে, তা' নিত্য নূতনভাবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে থাকে যাজন করতে-করতে। তাই গীতায় আছে—'মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা'—কি তো?

কেষ্টদা—"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

যাদের চিত্ত আমাতেই অর্পিত, যাদের প্রাণ মদ্‌গত, এমনতর ভক্তগণ পরস্পরকে আমার কথা বুঝিয়ে এবং সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন ক'রে পরম সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন।

যারা সতত আমাতে চিত্ত অর্পণ ক'রে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, সেইসব ভক্তকে আমি এমনতর বুদ্ধিযোগ দিই, যার দ্বারা তারা আমাকে লাভ ক'রে থাকে।

আমার সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থই তাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হ'য়ে উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দ্বীপদ্বারা তাদের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এসব হ'লো বাস্তব কথা। সত্যিই এমন হয়।

কেষ্টদা এইবার বললেন—কতকগুলি চিঠি লিখতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে যান, কাম সারে আসেন গা। আমি হলাম কর্ম্মনাশা মানুষ।

কেষ্টদা (হাসতে হাসতে)—অকর্ম্ম, কুকর্ম্ম ও তথাকথিত নৈষ্কর্ম্ম্যের নাশ আপনি করেন, সে কথা ঠিকই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মধুর হাস্যে)—যা' কইছেন! তাড়াতাড়ি সারে আসেন। আপনার গল্প কিন্তু কিছুই শোনা হ'লো না। সকাল-সকাল না শুনলে বাসি হ'য়ে গেলে আর রস থাকবে না।

কেষ্টদা ওঠার পর আরো কয়েকজন উঠে গেলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কাজল-ভাইয়ের বারান্দায় গিয়ে বসলেন। নরেনদা (মিত্র), প্রকাশদা (বসু), কালুদা (আইচ), জগন্নাথদা (রায়), রাজেনদা (মজুমদার), ঈষদাদা (বিশ্বাস), সন্তোষদা (রায়), হরেনদা (ভদ্র), সনৎদা (ঘোষ), মণিদা (বসু), অক্ষয়দা (পুততুণ্ড), মিলন (সেন), অরুণ (জোয়ার্দ্দার) প্রভৃতি অনেকে সেখানে এসে হাজির হলেন। একটু পরে আকুদা (অধিকারী) আসলেন।

আকুদা বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোকে যে খ্যাপা, বড় খোকা, মণি, কাজল, সাধনা, সানু, পাগলু, শান্তু, কানু ইত্যাদির কোষ্ঠী ভাল ক'রে দেখতি কইছিলাম, তা' কি দেখেছিস্?

আকুদা—সময় পেয়ে উঠিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময় ক'রে নিতি হয়। যখন যেটা করবার, তড়িৎ-ঘড়িৎ তা' না করাটাই ঠকা। Motor-sensory-co-ordination (বোধ-স্নায়ু ও কর্ম্ম-স্নায়ুর সঙ্গতি) না থাকলে জীবনের output (উৎপাদন) বাড়ে না। তা' ছাড়া, শরীর-মনের balance-এর (সমতার) জন্যও motor-sensory-co-ordination (বোধ-স্নায়ু ও কর্ম্ম-স্নায়ুর সঙ্গতি) প্রয়োজন। ঐ co-ordination (সঙ্গতি) পুরোপুরি আনতে গেলে কিছুটা কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। তা'তে শরীরও ভাল থাকে, মনও ভাল থাকে। মাথাটা আরো তরতরে হ'য়ে ওঠে। ওতে মাথার কাজ করা যায় ভাল। একঘেয়েমিটা নষ্ট হ'য়ে যায়। যাহোক, আজই সারে ফ্যাল গা!

আকুদা—খুব তাড়াতাড়ির কাজ নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোখ থাকলে দশঘণ্টার কাজ একঘণ্টায় করা যায়। দশজনের কাজ একজনে করা যায়। আমার কেবল ইচ্ছা করে, আপাত-অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলব কেমন ক'রে। এই যেন আমার জীবনের খেলা। তোদের মধ্যেও অমনতর রোখ যদি দেখি, ভাল লাগে।

আকুদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে বললেন—আমি এখনই যেয়ে লাগছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লাস সহকারে)—জয়গুরু, জগন্নাথ! পরমপিতা কী জয়! একেবারে দলমাদল কামান দাগায়ে দাও, negativism (নেতিবাচক ভাব) ধূলিসাৎ হ'য়ে যাক। শালা! মারি অরি, পারি যে কৌশলে। Mood (মনোভাব) এমন ক'রে নেওয়া লাগে যে, বাধাবিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি কি তাকে fight out (জয়) করবই কি করব। বাঁচাবাড়ার অন্তরায় যা', তাকে নিকেশ ক'রে, পরিবার-পরিবেশসহ জীবনের পথে, বাড়তির পথে এগিয়ে যাওয়াই ধর্ম্ম। নিবর্বীর্য্যতা ধর্ম্ম নয়, জীবনের তপস্যাই হ'লো অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে অমৃতের পথে এগিয়ে চলা। তাই

ধর্ম্মের সঙ্গে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, স্বার্থান্ধতা, রোগ, ব্যাধি, অসাফল্য, আলস্য, দুর্ব্বলতা ও প্রবৃত্তি-অভিভূতির কোন সঙ্গতি নেইকো।

আকুদা পুলকিত অন্তরে বেরিয়ে গেলেন কাজে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে বললেন—ও কালিদাসী! জালের ঘর থেকে কোষ্ঠীর ছকের খাতা ও পঞ্জিকাটা এনে দে তো আকুকে।

কালিদাসীমা তাড়াতাড়ি গেলেন খাতা ও পঞ্জিকা আনতে।

আকুদা মাতৃমন্দিরের সামনের দিককার সিঁড়ির কাছাকাছি গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ কি মনে ক'রে যেন বললেন—পেছন থেকে ডাকরো না। আকুকে একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম।

প্রকাশদা—ডাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল কাজের সংকল্প নিয়ে যাচ্ছে, পেছন থেকে ডাকিস না। ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকার আগে সামনাসামনি জায়গা থেকে বলবি—ঠাকুর আপনার খোঁজ করছিলেন।

প্রকাশদা তাই-ই করলেন।

আকুদা আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কল্যাণী, তিনা, অশোক ওদের কোষ্ঠীও দেখিস।

আকুদা হাসতে-হাসতে বললেন—কেবলই যে বোঝা বেড়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ও কিছু না, বোঝার উপর শাকের আটি।

আকুদা চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বলছেন—কাউকে-কাউকে দেখে হঠাৎ মনে হয়, ওকে এখন খুব চাপের উপর রাখা ভাল।

অক্ষয়দা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Obsession-এর (অভিভূতির) চাপ যতখানি, তার চাইতে বেশী চাপের মধ্যে না ফেললে obsession (অভিভূতি) কাটে না। যারা ভালবাসে না, যাদের আমাকে খুশি করার sentiment (ভাবানুকম্পিতা) নেই, তাদের উপর চাপ দিয়েও সুফল ফলে কমই। তারা callous (অসাড়) হ'য়ে থাকে। ভাবে, আমি আমার গরজে তাদের উপর দৌরাত্ম্য করছি, তাদের স্বস্তিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা, অনেক সময় পাড়ে' ফেলে বুকে হাঁটু দিয়ে লাগে যাই। শিব চক্কোত্তির ছেলের জিদ তো কম নয়।

সকলের হাস্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠী-মাকে পূর্বদিক থেকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কোনে গেছিলু রে?

কালীষষ্ঠীমা—বড়মার কাছে।

কালীষষ্ঠীমা কথা বলতে-বলতে মাতৃমন্দির ও শ্রীশ্রীমায়ের কুটিরের মাঝখান দিয়ে উত্তর দিকপানে বেঁকেছেন দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই অমন করিস

ক্যান্ ।

কালীষষ্ঠীমা (সহাস্যে)—কী করলাম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি সব জায়গায় চক্কর মারে' বেড়াতি পার, আর আমার কাছে আসে' একটু বসতি পার না।

কালীষষ্ঠীমা—আমি কি আর সেই কপাল ক'রে আইছি যে আপনার কাছে আসে' ব'সে থাকব? সংসারের কত তাল!

শ্রীশ্রীঠাকুর (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে)—কি আমার পীরিতের ঘুঘু রে! সংসারের কত তাল! আমি যেন ওর সংসারের বাইরে!

কালীষষ্ঠীমা—তা' কী করব ব'লে দেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর (রহস্যের সুরে)—তুমি হ'লে সেয়ানা শালিক! তোমারে শেখাব আমি? (পরে হেসে ফেলে বললেন) তাড়াতাড়ি কাম সারে' এত্তোরে চ'লে আয়!

কালীষষ্ঠীমা হাসতে-হাসতে বিদায় নিলেন।

৯ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪৯ (ইং ২৬।৯।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চের উপর ব'সে আছেন। কাছে লোকজন আছেন, কিন্তু বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হচ্ছে না। প্রফুল্ল কাছে আসতেই বললেন—তোর শরীর ঠিক হয়েছে তো? কাল অনেকগুলি লেখা এসে ফসকে গেল।

প্রফুল্ল—কাল বিকাল থেকেই ভাল আছি। ইচ্ছা করলে বিকালের দিকে আসতে পারতাম। কিন্তু বিকালে হাডুডু প্রতিযোগিতার শেষ খেলা ছিল, আগে থাকতে ওরা বিশেষ ক'রে বলেছিল খেলা দেখতে যেতে, তাই গিয়েছিলাম। খেলার মাঠে দর্শক অনেকে উপস্থিত থাকলে খেলোয়াড়রা তো খুশি হয়ই, তাছাড়া বড়দাও খুব স্ফূর্ত্তি পান। সবাই তোড়জোড় করায় কাল তাই বহুলোক হয়েছিল। খেলাটাও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' খুব ভাল। আজকাল দেশী খেলাগুলি উঠে যাচ্ছে। সে কিন্তু ভাল নয়। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিন্টন যা' খুশি খেল, যার যেমন সয়, সে তেমনতর, কিন্তু দেশী খেলাগুলিকে বাতিল করা ঠিক নয়। বরং আমার মনে হয়, আমাদের দেশে প্রাচীন কালে যে-সব খেলার প্রচলন ছিল, বইপত্র খুঁজেপেতে সেগুলি introduce (প্রবর্ত্তন) করা ভাল। আমাদের খেলাধুলো, গানবাজনা, আমোদস্ফূর্ত্তি সব-কিছুর মধ্যেই আমাদের কৃষ্টির ছাপ দেখা যায়, তাই কৃষ্টির জাগরণ-ব্যাপারে ওগুলির দিকেও লক্ষ্য দেওয়া লাগে। যাজ্ঞিকদের চাই চারচোখো নজর, এমন ক'রে জাল বিস্তার করা লাগে,

যা'তে যে যেমনতর instinct (সংস্কার)-এর লোকই হোক না কেন, সে তার নিজস্ব রকমে ইষ্ট ও কৃষ্টির প্রতি interested (অনুরাগী) হ'য়ে উঠতে পারে। বড়খোকার এ-সব দিকে খুব লক্ষ্য আছে।

খুলনার একটি প্রবীণ দাদা—আমরা হাডুডু, দাঁড়িয়া-বান্ধা, ছি-বুড়ি, কানামাছি এইরকম কত খেলা খেলেছি ছোটবেলায়। নৌকায় বাইচ দিয়েছি কত। আজকালকার ছেলেরা বলে, ফুটবলের মতো অতো উত্তেজনাপূর্ণ খেলা আর নাই। কিন্তু আমাদের গ্রাম্যজীবনের ঐ-সব খেলাধুলায় উল্লাস বা উত্তেজনা কিছু কম ছিল তা' তো মনে হয় না। পুকুরে, নদীতে আমরা যেভাবে দল বেঁধে সাঁতার কেটেছি, একজন আর একজনকে পিছে ফেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি এবং এইভাবে তীব্র প্রতিযোগিতা চালিয়েছি, আজকাল আর তা' দেখি না। আমাদের প্রতিদিনকার স্নানটাই ছিল একটা উৎসব। আমাদের কালে গ্রামে-গাঁয়ে প্রাইজ দেওয়ার রীতি ছিল না, কিন্তু মনের আনন্দে আমরা কতরকম প্রতিযোগিতা নিজেদের মধ্যে চালিয়েছি। গাছে-চড়া, লাঠি-খেলা, দৌড়-ঝাঁপ না কি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবচাইতে বড় প্রাইজ হচ্ছে আত্মপ্রসাদ ও মানসিক উল্লাস। তা' যদি না থাকে, বাইরের প্রাইজের কোন দাম নেই। আজকাল সব জায়গায়ই মানুষের নাম-চেতানর দিকেই ঝোঁক বেশী, দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ না করতে পারলে যেন কিছুই হ'লো না। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষের অন্তরের সম্পদ্ ক'মে যাচ্ছে, স্বতঃস্রোতা তৃপ্তি ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। ধর, তোমার বৌ তোমাকে খুব সেবাযত্ন করে। তোমার স্বাচ্ছন্দ্যবিধান তার কাছে মুখ্য না হ'য়ে তোমার কাছ থেকে তারিফ পাওয়াই যদি তার প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহ'লে কিন্তু তার সেবা কৃত্রিম ও তারিফ-সাপেক্ষ হ'য়ে থাকলো। এমনতর যে সেবা তার প্রাণ বা আয়ু বা দৌড় কতখানি তা' সহজেই বুঝতে পার। তারিফ চাওয়াটা মানুষের স্বভাবগত, কিন্তু ঐটেই যেখানে প্রধান হ'য়ে ওঠে, সেখানে বোঝা যায়, অনুশীলনে সে আনন্দ পাচ্ছে না। আর, অনুশীলনে যদি মানুষ আনন্দ না পায়, তার নৈপুণ্য বা যোগ্যতা বাড়ে না। তাই প্রাইজের লোভ মানুষকে শেষ পর্য্যন্ত প্রাইজ থেকে বঞ্চিত করে। আমি মানুষকে প্রশংসা দিতে কাতর নই। ও আমার ভালই লাগে, এবং প্রশংসা করি যখন, করিও প্রাণ খুলে। কারণ, জানি, প্রশংসার ভিতর-দিয়ে মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও স্ফূর্ত্তি বেড়ে যায়, বাঞ্ছিত চলন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে আবার কারও-কারও সম্বন্ধে চুপচাপ থাকি, কিছুই কই না। দেখি, তা'তে তারা কিভাবে চলে। ক্রমাগত প্রশংসার steam (বাষ্প) না দিলে যাদের সৎ-চলন স্তিমিত হ'য়ে যায়, সৎ চলন যে তাদের instinctive (সহজাত সংস্কারগত) নয়, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার, প্রশংসাও করতে জানা চাই। প্রশংসা এমনভাবে করা লাগে

যা'তে মানুষ অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ে অনুশীলন বন্ধ ক'রে না দেয়, বরং উৎসাহান্বিত হ'য়ে অনুশীলনে আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে, ধাপে-ধাপে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পায়।

খুলনার দাদাটি বললেন—আমি ছোটবেলায় যে স্কুলে পড়তাম, সেই স্কুলের অঙ্কের মাষ্টারমশাই আমি কোন অঙ্ক না পারলে প্রায়ই বলতেন, 'তোকে দিয়ে কিছু হবে না, তোর মাথায় গোবর পোরা। মিছেমিছি বাপের পয়সা খরচ ক'রে লাভ কী? তুই বরং কাস্তে নিয়ে মাঠে যেয়ে ঘাস কাট গিয়ে।' সবার সামনে এইরকম বলতেন, আর আমার অত্যন্ত অপমান বোধ হ'তো। কিন্তু যেগুলি পারতাম তার জন্য কখনও প্রশংসা করতেন না। ঐ মাষ্টারমশাইয়ের দরুন অঙ্কে আমি কোনদিন রসই পেলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সে আর ক'য়ো না। আমিও ভুক্তভোগী কম না। আমি conjugation-ই (ইংরেজী ধাতুরূপ) শিখবার পারলেম না। Intelligently (বুদ্ধিমানের মতো) কিছু বুঝতে গেলে অনেক মাষ্টারমশাই মনে করেন—ছেলেটা ডেঁপো, আর তাঁরা যে-ছাঁচে ও যে-কাঠামোয় ফেলে বুঝেছেন ও বোঝান, সেই ছাঁচ ও কাঠামোর মধ্যে যে নিজেকে না ফেলতে পারে তাকে মনে করেন dull (বোকা)। আমি একবার অঙ্কের ক্লাসে এক আর এক দুই হয় শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তা' হবে কী ক'রে? বরং দুটো এক হ'তে পারে। কারণ, দুনিয়ার দিকে, প্রকৃতির দিকে চেয়ে আমার তখনকার মতো অভিজ্ঞতা যা' হয়েছিল তা'তে এইটুকু বুঝেছিলাম—সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোন দুটো জিনিস ঠিক সমান নয়। আমার বোধ-অনুযায়ী এই কথা জিজ্ঞাসা করায় মাষ্টারমশাই দারুণ চটে গেলেন। তারপর সে কি মার! আমি কিন্তু হতভম্ব হ'য়ে গেলাম, মাষ্টারমশাই আমাকে এত মারছেন কেন? আমি সত্যিই তো কোন অপরাধ করিনি। আমার বুঝের সঙ্গে মিলছে না, তাই সঙ্গতি ক'রে নিতে চাচ্ছি। তার জন্য মার খাব কেন? আমাদের সঙ্গে পড়তো দেবেন সরকার। ও আবার আমাকে তখন প্রভু ক'তো। কাঁদো-কাঁদোভাবে মাষ্টারমশাইকে ক'লো—'প্রভুকে মারবেন না, প্রভুকে মারবেন না।' তা'তেও কি মাষ্টারমশাই ক্ষান্ত হন? বরং ওর উপর চটে যাওয়ায় আমার উপর মারের মাত্রাটা বেড়ে যায়।............এইভাবে কত ছেলে যে তাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য মার খায়, তার কি ঠিক আছে? আর, এইভাবে তাদের অনুসন্ধিৎসা নষ্ট হ'য়ে যায়। ভাবে, অতো তাফাল দিয়ে কাম কী? জিজ্ঞাসা করতে গেলে তো আবার মার, গালাগালি শুরু হবে। ওর চাইতে চুপচাপ থাকি। এতে যে শুধু তাদের অনুসন্ধিৎসা খতম হ'তে থাকে তাই নয়, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশও রুদ্ধ হ'য়ে যায়। ঐ যে মনে একটা ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন জাগছে অথচ

প্রতিকূল পরিবেশের দরুন খোলাখুলিভাবে সে প্রশ্নটা করতে পারছে না, এতে একটা suppression (নিরোধ) হয়, আর suppression (নিরোধ) যার মধ্যে যত হয়, তার ব্যক্তিত্বও ততখানি ব্যাহত হয়! তাই অভিভাবক বা শিক্ষক যদি সহানুভূতি-সম্পন্ন না হন, তাদের কাছে ছেলেমেয়েরা যদি সব কথা প্রাণখুলে বলতে না পারে, তাহ'লে তা' সমূহ বিপদেরই কথা।

যোগেনদা (হালদার)—কিন্তু আপনি তো বলেছেন সম্মানযোগ্য দূরত্ব বজায় রেখে চলার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তো সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে এত গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক, সেখানেও স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গে সম্মানযোগ্য দূরত্ব বজায় রেখে না চলে, তাহ'লে স্ত্রী কিছুদিন বাদে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে আরম্ভ ক'রে দেবে। তাই ঐ সম্মানযোগ্য দূরত্ব সেখানে দাম্পত্যপ্রণয় ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জন্য অপরিহার্য্য।

যোগেনদা—পারস্পরিক শ্রদ্ধার কথা বলছেন, স্বামী তো আর স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীর প্রতি, সহধর্ম্মিণীর প্রতি স্বামীরও একটা স্নেহল শ্রদ্ধা থাকে। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বেরই একটা মর্য্যাদা আছে। আত্মমর্য্যাদাশীল যারা, তারা অন্যকেও যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে চলে। পারস্পরিক মর্য্যাদাদান অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাবোধেরই পরিচয় দেয়। যার যতটুকু মর্য্যাদা প্রাপ্য, তাকে যদি ততটুকু মর্য্যাদা না দেওয়া যায়, তবে পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে না, অন্তরের বন্ধনও শিথিল হ'য়ে উঠতে চায়। ধরেন, আপনি বাবা, তাই ব'লে আপনি আপনার ছেলের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন না। আপনার হয়তো তাকে শাসন করা প্রয়োজন, কিন্তু সকলের সামনে, সব জায়গায়, সব অবস্থায় শাসন করা চলে না। যে-সব অভিভাবক এইগুলি বুঝে চলতে না পারে, ছেলেকে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে না জানে, ছেলেপেলেরা তাদের বেহাতি হ'য়ে যায়। শিক্ষক, স্বামী, জমিদার—সবার বেলায়ই ঐ কথা। এমন জমিদারের কথা আমি জানি, যারা প্রজাপালী কিন্তু বদমেজাজী। রাগ হ'লো তো হাটের মধ্যেই একজনকে জুতোপেটা ক'রে ছেড়ে দিল। এই যে মানুষের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে চলা—এ কিন্তু বেশীদিন চলে না। এর reaction (প্রতিক্রিয়া) আছেই। ঐ অগণ্য, নগণ্য, দুর্ব্বল যারা, তারা প্রবল-প্রতাপান্বিতদের এমন ক'রে বিব্রত ক'রে তুলতে পারে যে তখন আর তারা চোখে-মুখে পথ দেখতে পায় না। কাউকে অপমান করেছেন কি আপনাকে পাল্টা অপমানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রত্যেকটা individual-এর (ব্যক্তির) ego (অহং) rightly (যথাযথভাবে) tackle (নাড়াচাড়া) করা চাই। এ যারা না করতে জানে তারা বিপদে পড়বেই। আবার, শুধু

dealings (বাহ্যিক ব্যবহার) ভাল হ'লে চলবে না, feelings (ভাব) ভাল হওয়া চাই। অনেকে মৌখিক ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু তার মধ্যে যেন কোন প্রাণ নেই, তাতে কিন্তু মানুষের প্রাণ ভেজে না। আবার, অনেকে অন্তরের থেকে অন্যকে অবজ্ঞা করে, নিজেকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করে, মানুষের প্রতি অশুভ-বুদ্ধি ও অসূয়া পোষণ করে, কিন্তু বাইরে একটা মোলায়েম ও কৌশলী চাল নিয়ে চলে। এরা সাময়িকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারলেও দীর্ঘদিন তাদের স্বরূপ অনুদ্ঘাটিত থাকে না।..............হ্যাঁ! আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। স্ত্রীর প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহারের আরো একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। মায়ের স্বামীভক্তি দেখে সন্তানের পিতৃভক্তি যেমন বাড়ে, মায়ের প্রতি বাপের স্নেহল শ্রদ্ধাযুক্ত আচরণ দেখে সন্তানের মাতৃভক্তি আবার তেমনি পুষ্ট হয়। কাজলের মাকে তো আমি আগে 'মঙ্গলী' বলতাম। কিন্তু এখন 'মঙ্গলী' ডাক মুখেই আসে না। ভাবি—ও এখন মা, ও এখন কত বড়।

হরেনদা (ভদ্র) এসে বললেন—আপনি যে কাপড় আনার কথা বলছিলেন, সেই কাপড় আনছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন তোর কাছে রেখে দে। পরে কবোনে, কাকে দেওয়া লাগবি।

হরেনদা—আচ্ছা। তবে ভবানীদা যে টাকা দিছিলেন, তার থেকে কিছু বেশী লাগছে। বেশীটা দোকানে বাকী আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'তে কিছু না। জিনিসটা তোর পছন্দ-মত আনিছিস তো?

হরেনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই হ'লো। বাকী টাকাটা ভবানীর কাছ থেকে আমার কথা ব'লে নিয়ে দোকানে আজই দিয়ে আসিস। দোকানে বাকীবকেয়া ফেলে রাখা ভাল না। দোকানে বাকী ফেলে রাখলে দোকানদারদেরও অসুবিধা হয় আর আস্তে-আস্তে নিজেদেরও কম্বল ভারী হ'য়ে পড়ে। অনেক টাকা জমে গেলে একসঙ্গে দেওয়াও মুশকিল হয়।

হরেনদা—দোকানদাররা জানে যে আমাদের টাকা কখনও মারা যাবে না। তাই যত টাকার মালই বাকী চাই, আপত্তি করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের আচার-আচরণ দিয়ে দোকানদারদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পেরেছ, এ তো খুব ভাল কথা। তবু বাকী বা ধারের মধ্যে যত না যেয়ে পার, সেই-ই ভাল।

এরপর হরেনদা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বসূত্র ধ'রে নিজেই বলতে লাগলেন—মেয়েদের প্রতি সমীহ ও সম্ভ্রম যেন আমার মজ্জাগত হ'য়ে গেছে। ছেলেবেলায় যখন বুঝলাম, মেয়েদের পেটে মেয়ে ও ছেলে দুই-ই হয়, কোন মানুষই মায়ের পেট থেকে

ছাড়া জন্ম নিতে পারে না, তখন মেয়েদের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা হ'লো। ভাবলাম, এরা তো ভগবানের মতো। তাই একটা বাচ্চা মেয়ে দেখলেও, সে মায়ের জাতের একজন—এই কথা মনে ক'রে শ্রদ্ধা হয়।

যোগেনদা—আপনি বলছিলেন, শিক্ষক বা অভিভাবক যদি সহানুভূতি-সম্পন্ন না হন, তাহ'লে তা' সমূহ বিপদের কথা। এই বিপদটা কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন আপনি শিক্ষক, ছেলে একটা জিনিস বুঝতে পারছে না। কিন্তু সে যদি সেই কথা আপনার কাছে অকপটে বলতে না পারে, বলতে গেলে আপনার কাছে অযথা ধমক খায়, তাহ'লে তার গোঁজামিল দেবার প্রবৃত্তি হবে, না-বুঝেও বলবে বুঝেছি। এতে তার মাথাটাই একটা আবর্জ্জনাস্তূপ হ'য়ে থাকবে। ধীরে-ধীরে সব ব্যাপারেই গোঁজামিল দিয়ে চলতে অভ্যস্ত হবে। পরে তার চলন-চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, conception (ধারণা) যাদের clumsy (কদাকার), চলনও তাদের inconsistent (সামঞ্জস্যহীন) হ'য়ে ওঠে। তাই শিক্ষকের খুব সহ্য, ধৈর্য্য ও সহানুভূতি দরকার। তাকে নিজেকে ফেলতে হবে ঐ বিশিষ্ট ছাত্রটির অবস্থায়। সে কেন বুঝতে পারছে না, তার বুঝের পাল্লা কতদূর অগ্রসর হ'য়ে আছে, তার বুঝের দরজা কোন্‌টা এবং তা' আবার কোন্ angle (কোণ) থেকে বন্ধ আর কোন্ angle (কোণ) থেকে খোলা, তা' তাকে অনুধাবন করতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে। এতখানি না ক'রে ধমক দিয়েই যদি তিনি কাজ সারতে চান, তা'তে কখনও তিনি ছাত্রের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে পারবেন না। এতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ক্ষতি হবে। তাঁর ঐ ব্যবহারের ফলে ছাত্র দুর্ব্বিনীতও হ'য়ে উঠতে পারে। যে হয়তো শিষ্ট, সংযত ও সংগঠনমূলক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে সমাজের অশেষ কল্যাণ করতে পারত, সে হয়তো একটা destructive attitude (ধ্বংসাত্মক মনোভাব) imbibe ক'রে (পেয়ে) নিজের ও পরিবেশের দুর্গতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ালো। আবার ধরেন, আপনি অভিভাবক, আপনার ছেলে হয়তো কোন চারিত্রিক দুর্ব্বলতা বা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে প'ড়ে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু নিস্তারের পথ পাচ্ছে না। সে যদি জানে যে, আপনার কাছে বললে আপনি রূঢ় আচরণ করবেন না, সহানুভূতির সঙ্গে বিহিত সমাধান দেবেন, প্রয়োজন হ'লে মাত্রামত সহানুভূতি-স্নিগ্ধ শাসন করবেন, আবার তার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা দশের কাছে অক্ষুণ্ণ রাখবেন, তাহ'লে সে কিন্তু আপনার কাছে সব কথা খোলাখুলি ব'লে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। আর তা' যদি না হয়, সে ক্রমাগত গোপন করতে থাকবে। আপনাকে দিয়ে তার পরিশুদ্ধির কোন কাজ হবে না। আর, ঐ প্রবৃত্তি-বশ্যতায় সে-ও হয়তো আপনার কোন কাজে লাগতে পারবে না, কালে-কালে তার প্রবৃত্তির খোরাক পায় এমনতর দলের খপ্পরে প'ড়ে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বে আপনার থেকে।

এইরকম কত ব্যাপার যে ঘটে তার কি ইয়ত্তা আছে! আবার দেখা যায়—যে-সব পরিবারে অযথা কঠোর শাসন করে, সেই-সব পরিবারের ছেলেরা বেশী ক'রে মিথ্যাবাদী ও অবাধ্য হয়। তাই ব'লে শাসন করা যে অন্যায় তা' কিন্তু নয়। শাসন ও সোহাগের সুষ্ঠু সমাবেশ চাই, আর মাত্রাজ্ঞানও চাই। ফলকথা, শিক্ষক-ছাত্র, পিতা-পুত্র ইত্যাদির মধ্যে এমনতর একটা নিবিড় প্রীতির বন্ধন চাই, সম্মানযোগ্য দূরত্ব-সমন্বিত অন্তরঙ্গতা ও সাহচর্য্য চাই যে ছাত্র যেন শিক্ষকের কাছে, পুত্র যেন পিতার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করতে ভয় না পায়। তারা যেন তাঁদিগকে পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল ব'লে ভাবতে পারে, এবং তা' যেন যথাসম্ভব সর্ব্ব ব্যাপারে। সারাদিনের মধ্যে সবার অবসর-মত কোন-না-কোন সময়ে পরিবারের সকলে মিলে হৃদ্য আলাপ-আলোচনা, গল্প-গুজব, নির্ম্মল-হাস্য-পরিহাস ইত্যাদি করার রেওয়াজ যদি থাকে, তাহ'লে ভালই হয়। পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে নিত্য বিনতি-প্রার্থনা, গান ইত্যাদি করাও ভাল। আর, ছাত্র যদি মাঝে-মাঝে শিক্ষকের বাড়ীতে যায়, নিজেদের বাড়ীর আলুটা, মূলোটা, লাউটা, কলাটা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হিসাবে তাঁকে উপঢৌকন দেয়, আবার শিক্ষকও যদি মাঝে-মাঝে ছাত্রের বাড়ীতে গিয়ে তার খোঁজ-খবর নেন, বাড়ীতে একটা ভাল জিনিস হ'লে ছাত্রকে ডেকে খাওয়ান, (অবশ্য যাকে যেমন খাওয়ান চলে), তাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলাধূলা করেন, বেড়ান, তাহ'লে বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর-দিয়েও অনেকখানি সুফল ফলতে পারে। অভিভাবক, শিক্ষক সবার-ই আবার হওয়া চাই আদর্শ-নিষ্ঠ। তা' না হ'লে কিছুই হবে না।..............ছাত্রকে কেন্দ্র ক'রে তাঁদের (অভিভাবক ও শিক্ষক) পরস্পরের মধ্যে আবার যোগাযোগ থাকা চাই। ছাত্রকে মানুষ ক'রে তোলার ব্যাপারে পরস্পরের পরস্পরকে সাহায্যও করা দরকার। শিক্ষক হওয়া বড় কঠিন কাজ। তিনি হবেন একসঙ্গে ছাত্রের মা-বাপ দুই-ই। ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে কারও যদি পেট খারাপ হ'য়ে থাকে, বা রাত্রে ঘুম না হ'য়ে থাকে, এবং শিক্ষক যদি এক ঝলক তাকিয়েই তা' টের না পান, তাহ'লে তিনি আবার কেমন শিক্ষক? তার জন্য দরদী মন চাই, দরদী দৃষ্টি চাই। ছেলের অসুখ, অশান্তি যেমন মায়ের চোখ এড়ায় না, শিক্ষকেরও তেমন চোখ চাই। তিনি তখন ছেলেদের নিয়ে magic (যাদু) করতে পারবেন। তাঁকে খুশি করার প্রলোভনে ছেলেরা না পারবে এমন জিনিস নেই। আজ যাকে দেখছ বোকা-হাবড়া, কাল তাকে দেখবে তুখোড়, চতুর, চৌকস, যদি তার জন্মগত খাঁকতি না থাকে।

ইতিমধ্যে অনেকেই এসেছেন। সবাই মুগ্ধ অন্তরে শুনছেন তাঁর সুধাস্রাবী কণ্ঠের অমিয়-বচন, আর তার ভিতর-দিয়ে তাদের মনের আঙ্গিনায় অজ্ঞাতে উপ্ত হ'য়ে চলেছে এক নবীন আলোকবীজ, যা হয়তো একদিন ফলেফুলে

সুশোভিত হ'য়ে ধন্য ক'রে তুলবে ধরাতল।

গতকাল Questers' club-এর (অনুসন্ধিৎসু সভার) এক অধিবেশন হ'য়ে গেছে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Debating (তর্ক) হিসাবে যে আলোচনা হ'তো, তাই ভাল ছিল, না, এই ধরণের আলোচনা ভাল হ'চ্ছে?

প্রফুল্ল—ওতে উত্তেজনা বেশী ছিল, এটা কার্য্যকরী বেশী হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা কার্য্যকরী হয় সে-ই তো ভাল। আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে যা' পরিপূরণ করে না, তার দাম কী?

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—Questers' club (অনুসন্ধিৎসু সভা) ও Debating club (তর্কসভা)—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী, তা' তো বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Debating club-এ (তর্কসভায়) দুটি বিরুদ্ধ দল হয়। এক দলের আর-এক দলকে পরাজিত করার বুদ্ধি থাকে। যে যেদিকটায় যায়, সে সেই দিকটাকেই জোরদার ক'রে তুলতে চায়। এতে অনেক সময় আলোচনা একদেশদর্শী হ'য়ে ওঠে। সমাধানী ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী থাকে না। আবার, তর্কের খাতিরে অনেক ইষ্টকৃষ্টিবিরোধী, প্রবৃত্তিপোষক, মুখরোচক কথা ও যুক্তির অবতারণা করা হয় অকাট্য রকমে। বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে দুর্ব্বল মস্তিষ্ক যাদের, তারা যদি চিন্তাধারার ঐ gear-এ (ঘাটে) বেশী সময় থাকে, তার দ্বারা তারা affected (ক্ষতিগ্রস্ত) হ'তে পারে। তাই আমি বলেছিলাম, Questers' club (অনুসন্ধিৎসু সভা) করার কথা। তার মধ্যে প্রতিপাদ্য বিষয় থাকবে ইষ্ট ও কৃষ্টিমূলক কোন কথা। তার বিরুদ্ধে যত কথা উঠতে পারে, সে-কথাও সভ্যরা আলোচনা করবেন, কিন্তু যিনি যে-সমস্যার কথা তুলবেন তিনি তা' বিশদভাবে বিবৃত ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে তার সমাধান কী হ'তে পারে, তাও দেখিয়ে দেবেন। এবং উপস্থিত অন্যান্যরাও তাকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

রত্নেশ্বরদা—তর্কসভাতে একপক্ষ ইষ্টকৃষ্টিবিরোধী যত কথারই অবতারণা করুক না কেন, অন্যপক্ষ এবং সভাপতিও তো সেগুলির ইষ্টকৃষ্টিসম্মত সমাধান দিতে পারেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটোর মধ্যে অনেক ফারাক হয়। আমাদের মনেও তো কত সময় কত সমস্যা ও প্রশ্নের উদয় হয়, কিন্তু সব সময়ই আমরা চেষ্টা করি, আমাদের আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী সেগুলির সমাধান খুঁজে পেতে। তা' যদি না পারি, তাহ'লে মনের দ্বন্দ্ব যায় না। অনুসন্ধিৎসু সভায়, আমি যেভাবে বললাম, ঐভাবে যদি আলোচনা হয়, তাহ'লে বক্তা ও শ্রোতা প্রত্যেকেরই সমাধানী চিন্তার অভ্যাস হবে, এবং যাজনের ক্ষেত্রে যে-সব কূর প্রশ্ন উঠতে পারে, তার সমাধান কিভাবে দিতে হবে, সে-সম্বন্ধে জ্ঞান হবে। এই জ্ঞান

মানুষকে সমাধান-সমৃদ্ধ নির্দ্বন্দ্বতার ভূমিতে উপনীত হ'তে সাহায্য করবে। ভাল ক'রে চালাতে পারলে ঐ বৈঠকগুলিতে সমবেত ধ্যানের কাজ হ'তে থাকবে। আর, তার ভিতর-দিয়ে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণাও পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠবে। ধ্যান বলতে আমি বুঝি, ইষ্টকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্য-সমাধানমুখর চিন্তন। ধ্যান এসেছে বোধ হয় ধ্যৈ-ধাতু থেকে। তাই না? আপনি তো পণ্ডিত মানুষ। আমার থেকে তো এসব বেশী জানেন।

রত্নেশ্বরদা (সহাস্যে)—কানাছেলেকে যখন 'পদ্মলোচন' আখ্যা দেওয়া যায়, তখন আমাকে পণ্ডিত আখ্যা দেওয়ায় দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্যাবিজড়িত হাসি-হাসি মুখে বললেন—পরমপিতার দয়ায় আমার ছেলেরা কেউ বড়-একটা কানা নয়, বেশীর ভাগই চক্ষুষ্মান্। কিন্তু চক্ষুষ্মান্ হ'লে কি হবে? প্রায় সব সময়ই তারা চোখ বুজে থাকে। চোখ খুলে চলতে যে অনেক পরিশ্রম। একটা গল্প শুনেছিলাম। নারায়ণ আর লক্ষ্মী পাশাপাশি ব'সে আছেন বৈকুণ্ঠে। নিখিল চরাচরের বিষয় আলাপ-আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। একটি অলস দরিদ্র লোক সম্বন্ধে নারায়ণ লক্ষ্মীকে বললেন—বেচারী এত কষ্টে আছে, অভাবের তাড়নায় হা-হুতাশ ক'রে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়, তুমি যদি একটু করুণার দৃষ্টিতে তাকাও ওর প্রতি, তাহ'লেই তো ওর দুঃখ ঘুচে যায়। লক্ষ্মী হেসে বললেন—প্রভু! তোমার তো অজানা কিছুই নয়, তুমি তো সবই জান। করুণা করলেই কি সবাই তা' গ্রহণ করতে পারে? নারায়ণ জিদ ক'রে বললেন—তুমি ক'রেই দেখ না! লোকটা তখন পথ দিয়ে যাচ্ছে কোথাও থেকে কিছু আহরণের আশায়। নারায়ণের কথামত লক্ষ্মী তখন বৈকুণ্ঠ থেকে একছালা টাকা ফেলে দিলেন ঐ পথের উপর। যেতে-যেতে লোকটির মনে হ'লো—চোখ চেয়ে যাচ্ছি কেন? একটু চোখ বুজেই হেঁটে দেখি না! এই মনে ক'রে সে চোখ বুজে কিছুদূর হেঁটে গেল। টাকার ছালা ঠাঁয় প'ড়ে রইলো। তা' আর তার চোখে পড়লো না। টাকার ছালা পেরিয়ে গিয়ে তবে সে চোখ খুললো। লক্ষ্মী তখন নারায়ণকে বললেন—দেখলে? মানুষকে দিলেই কি সে নিতে পারে? আপনারাও তেমনি অলস তন্দ্রায় অনেক সম্পদ্ হারাচ্ছেন। পরমপিতার দান আপনারা নিচ্ছেন না।

শেষের কথাগুলির মধ্যে একটা করুণ বেদনার ছায়া ঘনিয়ে উঠলো তাঁর চোখে, মুখে, কণ্ঠে। আনন্দের আবহাওয়াটা কেমন যেন চকিতেই মিলিয়ে গেল। একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল। ঈষৎ-আন্দোলিত বাবলা-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আলোছায়ার লুকোচুরি চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই মায়াময় ছায়া ও আলোর দিকে চেয়ে রইলেন আনমনাভাবে।

এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য) আসলেন। কেষ্টদা এসে প্রণাম করার পর

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চলেন যাই ফাঁকে যেয়ে বসি গিয়ে।

তারপর কেষ্টদাকে সঙ্গে নিয়ে বাঁধের ধারে তাস্তুতে যেয়ে বসলেন। তাস্তুতে বিছানাটা গোটান ছিল।

কেষ্টদা বললেন—বিছানাটা পেতে দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দরকার নেই। এমনিই বসি।

সরোজিনীমা তামাক সেজে আনলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে কেষ্টদার সঙ্গে কথা বলছেন। কাছে দুই-একজন মাত্র আছেন। আর সবাই চ'লে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—দ্যাখেন কেষ্টদা! কর্ম্মী যারা আছে, তারা তো আছেই। তাছাড়া ২৭টা জেলার জন্য আরো ২৭ জন কাবিল লোক জোগাড় করেন। বাংলার থেকে তখন অনেকগুলিকে টেনে নিয়ে বাংলার বাইরে পাঠান যাবে। আর, এখন দুটো touring batch (ভ্রাম্যমাণ দল) আছে, আরো অন্ততঃ চারটে touring batch (ভ্রাম্যমাণ দল) দরকার। প্রফুল্ল আপাততঃ বাইরে যাচ্ছে যাক, কিন্তু ওর শরীর ভাল না। Touring batch (ভ্রাম্যমাণ দল) lead (পরিচালনা) করার মতো আরো কয়েকজনকে পেলে ওকে বাইরে না পাঠিয়ে আপনার কাছে রেখে দেবেন। বইটইগুলি বের করার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। বীরেনকেও আপনার সঙ্গে রাখা ভাল। ওকে যেখানে ফেলবেন, হটবে না। চালাক আছে। Uncompromising (আপোষরফাহীন) অথচ sweet (মিষ্টি)।..................আর, সব সময় নজর রাখবেন—কর্ম্মীরা যা'তে মত-মাথাতে এক হয়। নাম-ধ্যান কে কতটুকু করছে, কার কতটুকু হ'চ্ছে তার খোঁজ রাখবেন, এবং প্রয়োজনমত guide (পরিচালনা) করবেন। ঐটে ঠিক না থাকলে মানুষ progressive (প্রগতিমুখর) থাকে না। তখন প্রবৃত্তির ঘুণ বেশী ক'রে ধরে। কর্ম্মীদের প্রত্যেকে ইষ্টমুখী চলনে চললে disintegration (সংহতিতে ভাঙ্গন) কিছুতেই আসতে পারে না।

কেষ্টদা—পরস্পর ওঠাবসা, মেলামেশাই আমাদের কম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভা' কিন্তু করাই চাই।..............আর, কাজের পারম্পর্য্যগুলি ধরিয়ে দেবেন, একটা বাদ দিয়ে কিন্তু আর একটা নয়। উৎসবের টাম্মে' প্রত্যেক বছরই শুনি, origination work (সংসৃজন কাজ) ভাল হয়নি, কারণ, উৎসবের অর্ঘ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। আবার অনেকে বলে—জমি-সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, তাই origination work (সংসৃজন কাজ) ঠিকমত করতে পারিনি। কিন্তু origination work (সংসৃজন কাজ) বাদ দিয়ে কিছুই যে হবার নয়, সেটা ধরিয়ে দেবেন। Unbalanced work (সমতাহারা কাজ) ঠিক নয়। ওতে বোঝা যায়, ঐ কর্ম্মীর ব্যক্তিগত জীবনে adjustment ও co-ordination এর (নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্গতির) অভাব আছে। এগুলি সেরে

দিতে হবে। পথ দেখিয়ে দিতে হবে। ঋত্বিক্-অধিবেশনে আপনারা যাঁরা বক্তৃতা বা আলোচনাদি করবেন, তার আগে নিজেরা মিলে ঘরোয়া বৈঠকে ঠিক ক'রে নেবেন—কী আপনাদের করণীয়, কী আপনাদের বক্তব্য। এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমত এক সুরে একই জিনিস নানাভাবে পরিবেষণ করবেন, যা'তে কথাগুলি প্রত্যেকের মাথায়-মজ্জায় গেঁথে যায়। এক কথা বার-বার নানাভাবে মনোজ্ঞ রকমে বলার প্রয়োজন কিন্তু খুব বেশী।.................সৎসঙ্গ-আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আপনি যদি ইংরাজীতে কতকগুলি pamphlet, leaflet (পুস্তিকাদি) লিখে ফেলেন, তাহ'লে ভাল হয়। ইংরাজী থেকে বাংলা ও প্রয়োজন-মত হিন্দীতে অনুবাদ ক'রে নেওয়া যাবে। আপনি লাগলেই হয়। গত বছর অতো কাজের মধ্যে 'স্বস্তি-অভিযান' তো কয়েকদিনের মধ্যেই লিখে ফেললেন। সকলেই তো ঐ বইয়ের সুখ্যাতি করে। আরো লেখেন। দোয়াড়ে লিখে যান।

কেষ্টদা—অবশ্য-করণীয় ব'লে যা' লিখে রেখেছি, সেই list (তালিকা) দেখলে ভয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভয় হবি কি? Simultaneously (যুগপৎ) সবই করা লাগবি। পথ যত লম্বাই হোক, হাঁটলে দূরত্ব কমেই।..............আর, আমি কত দিন থেকে কচ্ছি, assistant (সহকারী) ভাল দেখে জোগাড় করেন!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ডান হাতখানি কেষ্টদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কেষ্টদা পরম যত্নে সশ্রদ্ধ সোহাগে হাতের আঙ্গুলগুলি টেনে দিতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি সহ। উত্তরমুখী হ'য়ে এগিয়ে চলেছেন। গোপালদার (মুখোপাধ্যায়) ঘরখানি পেরিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিত সুরে বললেন—গোপালের ঘরের দিকে চাইলে মাঝে-মাঝে হঠাৎ গোপালের কথা মনে পড়ে।..............মা'র কথা কিন্তু মনে লেগেই থাকে। ব্যথার কথা একটা মনে হ'লে সেই সঙ্গে আর দশটা মনে পড়ে। মাঝে-মাঝে বড় একলা মনে হয় নিজেকে।

কেষ্টদা—আমারও আপনাকে পাবার আগে ঐ-রকম মনে হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন কেষ্টদা! মানুষ একটা জীবন্ত অবলম্বন চায়ই, যাকে ধ'রে সে দাঁড়াতে পারে। পায়ের তলায় মাটি থাকে ব'লেই সেই মাটির উপর দাঁড়িয়ে মানুষ কত জোর-বলের কাম করে। সেই মাটিটা যদি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহ'লে কাজকাম করা তো দূরের কথা, মানুষ নিজ অস্তিত্ব ও

স্থিতি নিয়েই ফাঁপরে প'ড়ে যায়। প্রতি মুহূর্ত্তে বোধ করে সে যেন শূন্যের উপর ঝুলছে, অথবা থেকেও নেই। বোধ হয় এমন মানসিক অবস্থা থেকেই শূন্যবাদ বা মায়াবাদের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভালবাসার আশ্রয় যার পাকা-পোক্ত থাকে, সে বাস্তব দুনিয়াটাকে অস্বীকার করতে যাবে কোন্ দুঃখে? প্রিয়ের প্রয়োজনে, প্রিয়ের পরিতুষ্টির জন্য তার যে সব লাগে, সবাইকে লাগে। বাস্তব যা' তার এককণাও সে বাদ দিতে চায় না, fully utilise (পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার) করতে চায়। আরও দেখে, বাস্তব জগৎ আজ যতখানি এগিয়েছে, তার লওয়াজিমা যা', তা' দিয়ে প্রিয়-প্রীণন ঠিক-ঠিক হ'য়ে ওঠে না। প্রত্যেকটি বিষয়ে আরো অফুরন্ত উন্নতি দরকার। এর ফলে আসে অনুসন্ধিৎসা, আসে গবেষণা, হয় নূতন-নূতন উদ্ভাবন। এইভাবে কল্পনাকে ক'রে তোলে বাস্তবায়িত। বাস্তবকে স্বপ্ন বিবেচনা করা তো দূরের কথা, শুভ-স্বপ্নকে বাস্তব ক'রে না তুলতে পারলে তার ভাল লাগে না। আর এইটেই জীবন। এই মনোভাবের ভিতর-দিয়ে যে শুধু বিজ্ঞানের উন্নতি হয়, তা' নয়, প্রত্যেকটি বিষয়ের উন্নতি হয়।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানার সামনে এসে গেলেন। একটা চেয়ার এনে দেওয়া হ'লো, তা'তে বসলেন দক্ষিণাস্য হ'য়ে। বেলা তখন প'ড়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য হেলে পড়েছে। তার রঙ্গীন আভা ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতির বুকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে সেই রঙের ছোঁয়া লেগে। প্রশান্ত মাধুর্য্যে ভরপুর হ'য়ে আছেন। অদূরে কয়েকটা বানর খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। সোহাগ-সিঞ্চিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সেই দিকে। সকলে আশেপাশে মাটিতে ব'সে মুগ্ধ-অন্তরে দেখছেন তাঁকে।

কেষ্টদাও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছাকাছি ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন—ভালবাসার ভিতর-দিয়ে সব বিষয়ের উন্নতি হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, মানুষ বড় যখন কিছু করে, তার পিছনে একটা unending inspiration (অফুরন্ত প্রেরণা) দরকার হয়, তা' না হ'লে প্রতি পদে-পদে বাধা-বিঘ্ন ডিঙ্গিয়ে, জয় ক'রে, কৃতী হ'তে পারে না, সারাটা জীবন তপস্যার তাপের মধ্যে নিজেকে ফেলে রাখতে পারে না, একটুতেই ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে, গতানুগতিক আরামের মধ্যে ঢ'লে পড়ে। ভাবে, খাই-দাই আছি ভাল, অতো তাফালে কাম কী? তাই প্রেরণা লাগেই, যা' তাকে স্থির থাকতে দেয় না, একনাগাড়ে ঠেলতে থাকে কৃচ্ছ্রসাধনার পথে। এ থেকে নিস্তার থাকে না। এই যে প্রেরণা, so-called ambition-এ (তথাকথিত উচ্চাকাঙ্খায়) এই প্রেরণার সঞ্চার হয় না। কারণ, ambition is a complexion of complex (উচ্চাকাঙ্খা প্রবৃত্তিপরায়ণতার একটা রঙিন ভাব-বিশেষ)। তার মধ্যে মানুষের whole being (পূর্ণ সত্তা) থাকে না।

আর, কোন-কিছুর মধ্যে whole being (পূর্ণ সত্তা) যদি ঢেলে না দেওয়া যায়, তাহ'লে সে ব্যাপারে আমাদের whole energy (পূর্ণ শক্তি)-ও unlocked (উৎসারিত) হয় না। কিন্তু being (সত্তা) থাকে love-এ অর্থাৎ beloved-এ (ভালবাসায় অর্থাৎ প্রিয়তে)! ঐ জায়গায় কায়দামত ঢেউ তুলে দিতে পারলেই, মানুষের শক্তি বন্যার বেগে ফুলে ফেঁপে ওঠে, আর তা' যে-পথ বেয়ে যায়, সে-পথে কেবল পলি ফেলে-ফেলে যায়, উন্নততর ফসল ফলে তার ভিতর-দিয়েই, অবশ্য তার জন্ম যদি সুষ্ঠু হয়। আবার, মানুষের instinct-এর (সহজাত সংস্কারের) সঙ্গে তার energy-র (শক্তির) সম্পর্ক আছে। Energy (শক্তি) তখনই undisturbed way-তে (অব্যাহতভাবে) flow করতে (প্রবাহিত হ'তে) পারে, যখনই তা' instinctive channel-এ (সহজাত সংস্কারগত খাতে) directed (পরিচালিত) হয়। আর, এটা হয় both physiologically and psychologically (দেহ ও মন উভয় দিক দিয়েই)। মানুষের শরীর ও মন দুই-ই তা'তে সজাগ ও উদগ্র হ'য়ে ওঠে। শরীর সাহায্য করে মানসিকতাকে, মানসিকতা সাহায্য করে শরীরকে। দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বে শক্তির অপচয় হ'য়ে করণীয় কর্ম্মে অপঘাত সৃষ্টি করে না। বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে শরীর-মনের এই মিতালি বর্ণাশ্রমের এক পরম অবদান।

কেষ্টদা—বড় যা'-কিছু যে যেখানে করেছে তা' যে সর্ব্বত্র ভালবাসার প্রেরণায় করেছে তা' তো নয়! বিদ্বেষ ও শত্রুতাসাধনের স্পৃহা থেকেও তো মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন ক'রে থাকে। আজকাল যুদ্ধের ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবার জন্য মানবীয় শক্তি ও সংগঠনের যে চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাচ্ছে, তার তো তুলনা মেলে না। মানুষকে বাঁচাবার জন্য তো এর শতাংশের একাংশও করে না। তবে কি ক'রে বলতে পারি, প্রেমই জগতে প্রবলতম প্রেরণা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচতে চায়, বাঁচাতে চায়, তাই তো মানুষ এত কাণ্ড করছে। প্রিয়জনকে যদি ভাল না বাসতো, দেশকে যদি ভাল না বাসতো, ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখসুবিধা যদি না চাইতো, তাহ'লে কি মানুষ কখনও নিছক শত্রুতাসাধনের জন্য এত নৃশংস হ'তে পারতো? একপক্ষের ধারণা অপরপক্ষের বিনাশসাধনই তাদের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য অনিবার্য্য প্রয়োজন। তাই মূলতঃ এটা আত্মপ্রীতি ও আত্মসংরক্ষণের প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। প্রত্যেকেই চায় তার অস্তিত্বকে নিরাবিল করতে, তা'তে অপঘাত হানে যা' তা'কে উৎখাত করতে। এত কথা বলছি ব'লে এ-কথা মনে করবেন না যে আমি হিটলারের আক্রমণকে সমর্থন করছি। ঐখানেই তার ভুল যে সে অন্যকে মেরে জারমানীকে বড় ক'রে তুলতে চায়। পরিবেশকে মেরে কেউ কোনদিন বাঁচতে পারে না, বড় হ'তে পারে না। এই যে প্রচেষ্টা, এর চাইতে বড় ভ্রান্তি, এর চাইতে বড়

অজ্ঞতা আর কিছু হ'তে পারে না। বিধাতার দলিলে, প্রকৃতির দলিলে নিজের ক্ষতিসাধনের বুদ্ধির সমর্থন মেলে না, তাই কারও ক্ষতি ক'রে নিজের ক্ষতিসাধন সত্তার ধর্ম্ম নয়কো, বিধিও নয়কো। আমার মনে হয় কি জানেন? আমার মনে হয়, সবগুলি মানুষ মিলে একটা মানুষ, সবগুলি জীবন মিলে একটা জীবন, সবগুলি সত্তা মিলে একটা সত্তা, তাই কারও ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। যে আমার পূরণ-পোষণী হ'য়ে উঠতে পারে একদিন, তাকে যদি আজ আমি খতম ক'রে দিই, তাহ'লে সেই পূরণ-পোষণী অবদানের সম্ভাব্যতা থেকে তো আমি নিজেকে বঞ্চিত করলাম। তা'তে আমার নিজেরই কি ক্ষতি হ'লো না? দুনিয়াটার সৃষ্টি এমনতর নয় যে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে আমাকে লাভবান হ'তে হবে। যুগপৎ উভয়েই লাভবান হওয়া চলে, এই যে কৌশল—একেই বলে বিদ্যাবুদ্ধি, সাধনীয়ও তাই। যে বিদ্যাবুদ্ধি পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে সঙ্গতিসূত্র খুঁজে পায় না, তার মধ্যে কেবল বিরোধই দেখে, সে বিদ্যাবুদ্ধি অর্ব্বাচীন, অবাস্তব, এমন কি তাকে দানবীয় বললেও বেশী বলা হয় না। তাই সবকিছুর ভিতর-দিয়ে মানুষকে বিশেষ ক'রে একটি জিনিস শেখাবার আছে। সেটা হ'লো—'Do unto others as you wish to be done by' (তুমি অন্যের কাছ থেকে যেমন আচরণ পেতে ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতিও তেমনতর আচরণ কর)। যে অন্যকে মারতে চায়, সে কিন্তু চায় না যে অন্যে তাকে মারুক, যে অন্যের ক্ষতি করতে চায়, সে কিন্তু চায় না যে অন্যে তার ক্ষতি করুক। প্রীতির সঙ্গে মানুষের সত্তায় হাত দিয়ে তাকে বোধ করিয়ে দিতে হয়, অন্য সত্তার প্রতি কী তার করণীয়। মানুষের আর কিছু থাক বা না থাক, তার আত্মপ্রীতি আছেই, আত্মপ্রীতি যেমন আছে তেমনি আছে প্রিয়ের প্রতি প্রীতি। সেই খিড়কি দিয়ে সূচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হ'য়ে বারাবেন, দেখবেন, মিসমার কাণ্ড হ'য়ে যাবে।

কেষ্টদা—আপনি বললেন, অন্যকে মেরে বাঁচা প্রকৃতির দলিলে নেই, কিন্তু বাস্তবে তো তার উল্টো দেখতে পাই। বড়-বড় জীবজন্তুর খাদ্যই তো হ'লো ছোট-ছোট জীবজন্তু। জীবজন্তুগুলি যদি অহিংস সেজে ব'সে থাকে, তাহ'লে তারা নিজেরাই তো বাঁচবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)- এমনিই বা বাঁচছে কই? বাবারও বাবা আছে। যে অন্যকে মেরে বাঁচতে চাচ্ছে, তাকে আবার আর-একজন ঠিক ঐ কারণেই মেরে ফেলছে। এতে কারও অস্তিত্ব নিরাপদ নয়। তাই তো তাদের বলে পশু। পশু তো মানুষের আদর্শও নয়, অনুসরণীয়ও নয়, যদিও মানুষের ভিতর পশুত্ব আছে। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, বিবেক, মনুষ্যত্ব ও হৃদয়বত্তার পরিচয় এইখানে যে সে অন্যকে নিজের মতো বোধ করতে পারে এবং সেই বোধের দাঁড়ায় তার যাবতীয় আচরণ পরিচালিত করতে পারে নিজ অস্তিত্বকে

অক্ষুণ্ণ রেখে। ভগবান মানুষকে মাথা দিয়েছেন এই জন্য। মস্তিষ্ক-সমুদ্র মন্থন করলেই আপাত-বিরোধী যত যা'-কিছু আছে, সেগুলির মধ্যে একটা সুষ্ঠু সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। আর, শুধু চিন্তা ক'রে দার্শনিক সেজে ব'সে থাকলে হবে না। গায়-গতরে খেটেপিটে তাকে বাস্তবরূপ দিতে হবে আমাদের অভ্যাসে, চলনে, চরিত্রে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সমাজে, শুধু সমাজে কেন প্রতিটি সংস্থায়। স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সুসমঞ্জসভাবে সপরিবেশ সর্ব্বাঙ্গীণ বাঁচাবাড়া ও উন্নতির পথে চলা—আমার মনে হয়, এই-ই হ'লো বাস্তব সত্যসাধনা, বাস্তব ব্রহ্মোপাসনা। সত্যের মধ্যে আছে অস্তিত্ব অর্থাৎ, সত্তা, আর ব্রহ্মের মধ্যে আছে বৃদ্ধি। ব্রহ্ম এসেছে বৃংহ্-ধাতু থেকে, তার মানে বৃদ্ধি পাওয়া। তাই না?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সুশীলদা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের dictionary (অভিধান)-টা আনে দিয়ে আমার যে কি উপকার করিছে, তা' আর একমুখে কওয়া যায় না। আমি তো বইটই বিশেষ পড়িনি, সাধুসঙ্গ-টঙ্গও করিনি, তবু মানুষ তো যথেষ্ট ঘাঁটিছি, যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা ইত্যাদিও শুনিছি, নানানটার ভিতর-দিয়ে আমাদের দেশের philosophical ও religious conception (দার্শনিক ও ধর্ম্মীয় ধারণা)-গুলি সম্বন্ধে কিছু-কিছু জানবার সুযোগ হইছে। কিন্তু আমার direct realisation (প্রত্যক্ষ অনুভূতি) যা', তার সঙ্গে প্রচলিত অনেক ধারণার মিল খুঁজে পেতাম না। নিজের বোধটাকে মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেবারও জো ছিল না। কেমন যেন একটা খটকা লাগে ছিল মনে। সুশীলদা যখন ঐ বইখানা আনে দিল তখন দেখলাম, root-এর (ধাতুর) দিকে চাইলে সবই ঠিক আছে। গোল হইছে অনুভূতিহীন, কর্ম্মহীন, অলস দার্শনিক ব্যাখ্যার আমদানী ক'রে। বুঝবের পারলেম, আমরা কতখানি fall করিছি (প'ড়ে গেছি), আমাদের কতখানি readjust (পুনর্নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবি। খাটুনি আছে দুরন্ত খাটুনি। কার কাছে যেন গল্প শুনিছিলাম। কে এক বিরাট ওস্তাদ ছিলেন, মানুষকে গানটান শেখাতেন। শিখিয়ে দক্ষিণাও নিতেন। কিন্তু একেবারে অজান্ আনকোরা নতুন ছাত্র যারা, তাদের কাছ থেকে যা' নিতেন, যারা অন্য কোথাও থেকে কিছু শিখে আসত, তাদের কাছ থেকে তার দ্বিগুণ নিতেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি এমন উল্টো করেন কেন? তাতে তিনি নাকি হেসে বলেছিলেন ভুল যা' শিখে আসে, তা' ভোলাবার জন্য যে অতিরিক্ত সময় ও পরিশ্রম দিতে হয়, তার মূল্যবাবদ নিই এটা।..............আপনার ভিতর একটা scientific inquisitiveness (বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা) ছিল, কোন preconceived notion (পূর্ব্ব-কল্পিত ধারণা) নিয়ে obsessed (অভিভূত) হ'য়ে ছিলেন না। যা'-কিছু যাচাই ক'রে বুঝে নেবার আগ্রহ ছিল, এতে আপনারও সুবিধা হইছে,

আমারও সুবিধা হইছে। আপনারা যদি না আসতেন, আর কেষ্ট দাসের মতো philosopher (দার্শনিক) নিয়ে যদি আমার থাকা লাগত, তাহ'লেই গিছিলাম আর কি! (ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে উঠলেন, উপস্থিত সকলে একযোগে হাসতে লাগলেন।) এরপর কেষ্টদার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন—আপনাকে কয়বার কেষ্ট দাসের কাছে পাঠাইছিলাম, মনে নেই? ওর কাছে যাবার কথা বলতেই আপনার মুখে কেমন যেন একটা আর্ত্তভাব ফুটে উঠতো।

কেষ্টদা (সহাস্যে)—আমি বুঝতে পারতাম না—যার কথার মধ্যে, লেখার মধ্যে কোন sense (বোধ) নেই, যার ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহারের মধ্যে প্রীতিজনক কিছু নেই, তেমন লোকের কাছে ঠাকুর আমাকে বারবার পাঠাচ্ছেন কেন? কাছে গেলে কেবল মনে হ'তো, কতক্ষণে রেহাই পাব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন বুঝেছেন কেন পাঠাতাম?

কেষ্টদা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নমুনা দেখাতে। আপনার তো গোড়া থেকেই খারাপ লেগেছে। আবার কিছু লোক ছিল যারা কেষ্ট দাসের ব্যাখ্যা শুনে তার প্রতি ভক্তি-গদগদ-চিত্ত হ'য়ে উঠতো। ভাবটা এইরকম—মহাজন কোথায় লাগে এর কাছে? এই রকমটা inherent distortion-এরই (অন্তর্নিহিত বিকৃতিরই) পরিচয় দেয়। আমি সেই ভাব বুঝলে এমন ক'রে চেতায়ে দিতাম যে কেষ্ট দাসের প্রতি শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে যায়। আর ঐ দিকেই ঠেলে পাঠাতাম।

কেষ্টদা মুখে আনতে বাধে, কিন্তু আপনি এমনতর কথাও বলেছেন, কেষ্ট দাস প্রস্রাব ক'রে দিলে আমার মতো কত মানুষ ভেসে যায়। ও কি যে-সে মানুষ? কেষ্ট দাস যখন betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করলো, তারপর অনেকে এসে আপনার কাছে অনুযোগ করতো—আপনিই ওকে অতো বড় ক'রে ধরতেন আমাদের কাছে, ওর কাছে পাঠিয়ে দিতেন, আপনার কথা শুনে আমরা তো আর কোন সন্দেহ করবার অবকাশ পাইনি। তা'তে আপনি বলেছিলেন—সোয়ামী যদি স্ত্রীকে কয়, অমুক মানুষটা খুব ভাল, ওর মতো মানুষ হয় না, তাহ'লে স্ত্রী কি সোয়ামীকে ছেড়ে সেই পরপুরুষের সঙ্গে ঘর করতে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুরসহ সকলেই হাসছেন এবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসার একটা মস্ত পরখ এই যে, প্রিয়ের পরিপন্থী যে বা যা'-কিছু তাকে সে এক আঁচড়েই চিনতে পারে। ও তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। অনেকে আছে খুব সেয়ানা। ধরেন, আমি আপনাকে ভালবাসি, অথচ আপনার বিরোধী কেউ আমাকে হাতিয়ে নিয়ে আপনার ক্ষতি করতে চায়। জানে, গোড়াতেই যদি আপনার বিরুদ্ধে কিছু কয় আমার কাছে, তাহ'লে পাত্তা পাবে না। তাই আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির ভান দেখিয়ে আমার মধ্যে ঢুকতে চাইবে। কিন্তু আমি যদি সত্যিই ভালবাসি আপনাকে, তাহ'লে ঠিক ধ'রে

ফেলব—লোকটার মতলবটা কী? আমার যদি আসল-ভালবাসার ছিটেফোঁটাও থাকে, তাহ'লে আসল-নকল, অকৃত্রিম-কৃত্রিমের ভেদ বুঝতে আর কষ্ট হবে না। তাছাড়া আমি খাঁটি হ'লে অমনতর দুষ্ট মতলবওয়ালা কোন মানুষ আমার কাছে এগুতেই সাহস পাবে না। যমের মতো ভয় করবে আমাকে। গা ঢাকা দিয়ে চলতে চাইবে। ভালবাসা একটা sixth sense (ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়) গজিয়ে দেয় মানুষের মধ্যে। সে কখনও befooled (নির্ব্বোধ-প্রমাণিত) হয় না, অন্ততঃ প্রিয়ের ব্যাপারে। সাধনায় অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ হয় বলে, আমার মনে হয় তার মূলে আছে ঐ। যেমন, একটা হাবা মেয়ের ছেলে হ'লো, সে কিন্তু ভালবাসার টানে ছেলের মুখ দেখেই চিনত পারবে, তার কখন কী দরকার? একজন ধুরন্ধর psychologist (মনোবৈজ্ঞানিক)-ও হয়তো তার কাছে ফেল প'ড়ে যাবে। সন্তান-সম্পর্কে মায়ের এই যে সূক্ষ্ম অনুভূতি, এই যে সুতীব্র বোধশক্তি, আমি একে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রাথমিক ধাপ ব'লে মনে করি। অতীন্দ্রিয় মানে অতি সাড়াপ্রবণ ইন্দ্রিয়। কত মাকে দেখেননি, ছেলে বিদেশে থেকে পড়ছে, এমনি বেশ আছে, হঠাৎ একদিন হয়তো অস্থির উতলা হ'য়ে উঠলো, বার-বার ঘর-বার করছে আর বলছে আমার আজ কিছুই ভাল লাগছে না, মনে হচ্ছে, খোকনের শরীর বোধ হয় ভাল নেই, হয়তো কোন অসুখ করেছে, বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে আর 'মা' 'মা' ক'রে ডাকছে। তারপর টেলিগ্রাম বা চিঠিতে হয়তো জানা গেল যে ব্যাপারটা সত্যিই তাই। কিংবা ছেলে নিজেই হয়তো জ্বর-গায় এসে হাজির হ'লো মায়ের কোলে। আকছার এ-সব দেখা যায়।

কেষ্টদা - হ্যাঁ! তবে অনেক মতলববাজ খারাপ লোকের ব্যবহার এত মিষ্টি ও মোলায়েম এবং তথাকথিত সেবা তারা এতখানি দিয়ে থাকে যে, মানুষ সহজেই তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, অন্ততঃ প্রথমটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমনতরভাবে বিভ্রান্ত যারা হয়, বুঝবেন, তাদের ভিতর গোল আছে। তারা সাজগোজ দ্যাখে, চেহারা দ্যাখে না। সাজগোজেই ভোলে যারা, তাদের ভিতরে যে মালমশলার অভাব আছে, তা'তে কি কোন সন্দেহ আছে? মানুষ তাদের কাছেই তো যত সব অচল চালিয়ে দেয়। মায়েদের মধ্যে অনেকে আছে, কুৎসিত মেয়েকে এমন ক'রে সাজিয়ে দিতে পারে, দেখে মনে হবে কেমন সুন্দরী। কিন্তু পাকা লোক যারা, তারা ও দেখে ভোলে না। তাই মেয়ে দেখতে যাবার সময় প্রবীণ লোক সঙ্গে নিয়ে যায়।..............কেষ্টঠাকুর নাকি একবার গোয়ালিনীর বেশে গিয়েছিলেন রাধার কাছে, কেউ ধরতে পারেনি, রাধার কিন্তু ধরতে কষ্ট হয়নি, চোখ টিপে হেসে বুঝিয়ে দিয়েছে, 'আমি ধ'রে ফেলেছি।' এ-ও যেমন ঠিক, তেমনি অন্য কেউ যদি কেষ্টঠাকুরের বেশ প'রে যেত তার কাছে, তাও সে ধ'রে ফেলত।..............কেউ যদি কোন শিশুকে

অন্তরে-অন্তরে ঘৃণা বা হিংসা করে এবং সে যদি শত সুশ্রীও হয় ও শত আধিক্যেতা দেখায়েও ঐ শিশুকে কোলে নিতে যায়, তাহ'লে দেখবেন, সাধারণতঃ শিশু তার কোলে যেতে চাইবে না। আর, কুৎসিত একটা মানুষ যদি স্নেহ-পরায়ণ হয় এবং মিষ্টি তোয়াজী বোল বলতে সে যদি তেমন অভ্যস্ত না-ও হয়, দেখবেন, ছেলেপেলেরা ঝাঁপিয়ে যাবে তার কোলে। আমাদের বঙ্কিম তো খুব একটা সুন্দর নয়, আর বচনও যে খুব মধুবর্ষী তাও নয়, তবুও তো শুনি ছাওয়াল-পাওয়াল ওর কোলে যাবার জন্য অস্থির হ'য়ে ওঠে। বড় খোকার ছাওয়াল-পাওয়াল তো শুনি, ওকে ছাড়বারই চায় না, বিশেষতঃ ছোট যারা। তাই বলি, শিশুরাই যেখানে এতখানি বোঝে, সেখানে বয়স্করা বুঝবে না, এটা কি একটা কথা? ফলকথা, ভুল করায় যাদের interest (স্বার্থ) আছে, যারা ভুল করতে চায়, তারাই ভুল করে। Culture (অনুশীলন) ক'রে ভুলটাকে আয়ত্ত ক'রে নেয়। মানুষ যাই পাক, তা' সাধনা ক'রে পায়, দুঃখ পাবার জন্য মানুষ কি কম সাধনা করে?

এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একবার উঠে বাইন্ডিং সেকসনে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কেষ্টদা, প্যারীদা (নন্দী) প্রভৃতি আরো কয়েকজনে ঐ ঘরে ঢুকলেন। বেহারীদা (সরকার) ও তাঁর ছেলে শ্রীগোপাল তখন কাজ করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেতেই উভয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। কাজ ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কেমন যেন একটা ইতস্ততঃ ভাব, অর্থাৎ বসতে দেবেন কোথায়, তাই ভাবছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' লক্ষ্য ক'রে বললেন—আপনি ছাওয়াল নিয়ে কাজকাম করেন, আমি দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে দেখি। এতক্ষণ ব'সেই তো ছিলাম।

ওঁরা কাজ করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীগোপালের হাত তো বেশ পাকা হ'য়ে উঠিছে। আপনারা বাপ-বেটায় কাম করলে তো ভাসে যাবি।

বেহারীদা ও খেয়ালী মানুষ। মন করলি খুব পারে। আবার একদিন হয়তো ব'সেই থাকল। কিছু কইলে রাগ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (কথাটা উড়িয়ে দেবার ভাবে)—না করে!...............মাঝে-মাঝে দম নিয়ে নেয়, যা'তে আরো ভাল ক'রে কাজ করবার পারে।

শ্রীগোপালের এই কথাটা খুব মনে ধরেছে। হাসতে-হাসতে বলছে—আমি কী জানি যে কী করি, আপনি সব বোঝেন। বাবা কিছু বোঝে না। কেবল খিচখিচ করতি থাকে। ওতে আমার মনমেজাজ আরো খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর মন খারাপ হবি কী? বাপের বকুনিটাও আশীর্ব্বাদ! আবার তোর যে কত সুখ্যাত করে আমার কাছে!

শ্রীগোপাল বাবা অমনি' যদি কখনও রাগে যায়, আমি এক মিনিটে

জল ক'রে দিতে পারি।

বেহারীদাও ছেলের কথা শুনে মৃদু-মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই যেমন কাজ-কাম-শিখিছিস, আরো কয়েকজনকে যদি এইরকম শেখায়ে নিস, তাহ'লে খুব ভাল হয়। তোর ছাত্ররা আবার তখন কবে, শ্রীগোপালদা কাজটা শেখাইছিল তাই ক'রে খাচ্ছি। বেহারীদা তো বুড়ো মানুষ, এখন তোদেরই তো করা লাগবি।

শ্রীগোপাল—আমি যতটুকু শিখিছি, তা' শিখাতে পারি। তবে আমার অনেক শেখা লাগবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ তো, শিখবি। না শিখলে কি শেখান যায়? আবার নিজের চালচলন যদি ঠিক না হয়, কেউ কিন্তু মানবে না। ও দিকেও লক্ষ্য রাখবি—এই কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে গেলেন। সেখান থেকে গিয়ে কারখানার ভিতর ঢুকলেন।

কয়েকখানা ভাল কাঠ মাটিতে প'ড়ে ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যেনদাকে বললেন —কাঠগুলি ঐভাবে প'ড়ে থাকলে উই ধ'রে যেতে পারে। ভাল জায়গায় তুলে রাখ্।

সত্যেনদা (চৌধুরী) তুলে রাখলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই নিজের জিনিস মনে ক'রে আগলে রাখবি। কিছুরই অপচয় হ'তে দিবি না। ওতে নিজেরই ভাল হবে।

সত্যেনদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার আশ্রম-অভিমুখে রওনা হ'লেন।

গেষ্ট-হাউসে ফরিদপুর থেকে একটি মা এসেছেন, অন্যান্য দাদা ও মায়েদের সঙ্গে তিনিও মেয়েটিকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পিছনে-পিছনে ফিরছেন। মেয়েটির পায় তোড়া পরা। চলন-পথে ঝুম-ঝুম ক'রে শব্দ তুলে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ পিছন ফিরে মেয়েটির দিকে চেয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেলে মাথা দুলিয়ে বললেন—'ঝুমুর! ঝুমুর! ঝুমুর! ঝুমুর!' পরক্ষণেই আবার চলতে লাগলেন। মেয়েটি শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের ঐ কথা শুনে আনন্দে ডগমগ হ'য়ে উঠলো। আশপাশের সকলের অন্তরেও ছড়িয়ে পড়ল সেই আনন্দের রেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে এসে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুল-তলায় একটা বেঞ্চে বসলেন। একটু পরেই সাঁঝের আঁধার নেমে আসলো। ক্ষ্যান্তমা একটা লণ্ঠন ধরিয়ে দিয়ে গেলেন।

কেষ্টদা ও অন্যান্য দাদাদের দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গ-ভঙ্গীতে বলছেন —মানুষের ভিতরকার যোগ্যতা যদি না থাকে, যোগ্যতা যদি না বাড়ে, তবে

বাইরে থেকে প্যালা দিয়ে কাউকে বড় করা যায় না। আর ছোট মাথা যাদের, আধার যাদের সংকীর্ণ, তাদের যদি একটু টাকাপয়সা, মানযশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি হয়, তাহ'লে তারা আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। ঐ দম্ভ ও অহঙ্কারে ক্রমাগত মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকে। সমগ্র পরিবেশই তখন ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। এইভাবে পতন তাদের ত্বরান্বিত হ'য়ে ওঠে। আবার, কেউ-কেউ মূলকেই অস্বীকার করতে সুরু করে। এরা আরো ভীষণ! কেষ্ট দাস একজন ব্রাহ্মণের কাছে অপমানিত হ'য়ে আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ে। আমি তখন বলেছিলাম—তুই ভাবিস না। একদিন তুইও এত বড় হ'তে পারিস যে, ব্রাহ্মণরা পর্য্যন্ত তোকে সম্মান করতে বাধ্য হবে। সেইদিন থেকে আমি ওর পিছনে লাগলাম। ওর সম্বন্ধে মানুষের কাছে এমন ক'রে বলতাম যে, মানুষ ওকে খাতির না ক'রেই পারতো না। কত জায়গায় বক্তৃতা করবার আগে আমি ব'লে-ব'লে দিতাম কী-কী বলতে হবে। সেইসব কথা ব'লে খুব বাহবা পেত। এই পেতে-পেতে ওর মাথা গরম হ'য়ে গেল, পরে আমাকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার বুদ্ধি হ'লো। আমি যে কিছু না বুঝতাম তা' নয়, কিন্তু চুপ ক'রে থাকতাম। যারা আমার সর্ব্বনাশ সাধন করার জন্য ঘুরছে, তাদের কাউকে-কাউকে খুব কাছে টেনে নিলাম। তাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম নিজেকে। একজন একদিন অনুতপ্ত হ'য়ে আমার কাছে সব কথা স্বীকার গেল। ওরা তখন নানারকম ফন্দী করতে লাগল। কোনটাই টিকল না। তখনও আমাকে কেষ্ট দাসকে defend (সমর্থন) করা লেগেছে, তার অভাব-অসুবিধার সময় গোপনে সাহায্য করা লেগেছে।..............সে যা' হো'ক, এমনতর বিশ্বাসঘাতক যারা, তাদের সময় থাকতে চিনতে না পারা কিন্তু ভাল কথা নয়। 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।' মানুষ ইষ্টমুখী হ'লে চতুর হবেই। কিছুই তার চোখ এড়াবে না। আজকাল আমাদের দেশে ধারণা হয়েছে, ধার্ম্মিক যে হবে, সে বাস্তব জগৎ-সম্বন্ধে থাকবে উদাসীন, বিষয়-ব্যাপারের মধ্যে সে থাকবেই না, ওদিকে সে নজরই দেবে না। এ ধারণা কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক। মরণপন্থী হওয়া যদি ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে এই চলন ঠিক হ'তে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম মানে যদি হয় উচ্ছল জীবন, উদাত্ত অভ্যুদয়, তাহ'লে সে ধর্ম্মের মধ্যে এমনতর নির্ব্বীর্য্যতা ও মূঢ়তার কোন স্থান নেইকো।................তাই আমার মনে হয়, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে মানুষের মনে এত সংশয়, তার সঞ্চারক ও স্রষ্টা কিন্তু তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজীরা। ধর্ম্ম যদি কোথাও যথার্থ রূপ ধ'রে দাঁড়ায়, তাহ'লে নিজের ও অপরের মঙ্গলকামী যারা, তারা তা' বুঝবেই। আপনারা সেই রূপটি তুলে ধরেন মানুষের সামনে।

ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী)—আমরা যা' করছি, তার ভিতর-দিয়েই কি ধর্ম্মের যথার্থ রূপটি ফুটে উঠবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' বলেছি এবং যে-ভাবে করতে বলেছি, সেইভাবে যদি কর, তাহ'লে তা' হবে ব'লেই আমি বিশ্বাস করি—অবশ্য, এই তোমাদের দিয়ে যতটুকু যা' হতে পারে। বহুদিন না করায় মরচে ধ'রে গেছে। এখন খাটা লাগবে খুব। ধর্ম্মের নামে বিকৃত ও ভুল ধারণা যেগুলি আছে, সেগুলির নিরসন করা লাগবে। যেমন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একটা ধারণা আছে, আমাদের কিছু করা লাগবে না, ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় সব হবে। আমি অমনতর কথা বুঝতে পারি না। না করলে কিছুই হয় না। তাই আমি কই, কৃপা মানে ক'রে পাওয়া। কৃপ্-ধাতুর একটা মানে নাকি আছে যোগ্যতা, তার মানে —করার ভিতর-দিয়ে তোমার যোগ্যতা যেমন-যেমন বাড়বে তুমি পাবেও তেমনি। এই বিধিমাফিক করার প্রতি একটা প্রবল তৃষ্ণা ও সম্বেগ জন্মিয়ে দিতে হবে মানুষের। তোমাদের চলনচরিত্র মানুষের মধ্যে যদি এই জিনিসটা impart (সঞ্চারিত) করে, তাহ'লে তোমাদের ঋত্বিক্ নাম সার্থক হবে। ঋত্বিক্ মানে আমি কই, vanguard of prosperity (উন্নতির অগ্রদূত)। আজ যুদ্ধের বাজারে ঠেকায় প'ড়ে 'production (উৎপাদন) বাড়াও, production (উৎপাদন) বাড়াও' করে, কিন্তু productive leaven (উৎপাদনী দম্বল)-টা যদি প্রতিটি ব্যক্তি-চরিত্রের পাত্রে ছিটিয়ে না দেওয়া যায়, তবে সরকারী ফতোয়া জারী ক'রে কি রাতারাতি একটা কিছু ক'রে ফেলা যাবে? সেইজন্য ব্যক্তি-গুলিকে ধরতে হবে। টাকার লোভ দেখালে মানুষ কখনও বড় হবে না। চারিত্রিক বিকাশের লোভ গজিয়ে দিতে হবে মানুষের মধ্যে। তাদের অভ্যাস, ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে হবে। আর, সব-কিছুর pivot (কীলক) হবে ইষ্টপ্রীতি, ইষ্টানুরাগ। ঐ urge-এ (আকূতিতে) মানুষ করবে, বলবে, ভাববে, readjust (পুনর্নিয়ন্ত্রণ) করবে সপরিবেশ নিজেদের। এরই সূত্র হিসাবে দেওয়া হয়েছে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। এর ভিতর-দিয়ে যে-সব সুগঠিত ব্যক্তি-চরিত্রের আবির্ভাব হবে, তারাই হবে সর্ব্ববিধ উন্নতির ভূমি অর্থাৎ ভিত। এটা বাদ দিয়ে যদি টাকার বৃষ্টি কর, টাকার লোভ দেখিয়ে মানুষকে মাতিয়ে তোল, সে কর্ম্মমত্ততার কোন দাম হবে না। সে অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরে জাতির দৈন্য ঘুচবে না। টাকার জোগানে খাঁকতি পড়লেই তা' নিভে যাবে। তখন আসবে আরো অবসাদ, আরো অন্ধকার, আরো নিথর ভাব।

ধীরেনদা—আপনি যা' চান, তা' কি কখনও হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই হবে। না করলে হবে কী ক'রে? আমি কোন impracticable (অসাধ্য) কথা কই ব'লে আমার মনে হয় না। তবে মানুষকে জাগাতে গেলে জাগ্রত মানুষ চাই। মহৎ আদর্শ ও সাধু উদ্দেশ্যের জন্য নিরাশী, নির্ম্মম হ'য়ে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়-সহকারে অতন্দ্র পরিশ্রম ও অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করাটা কতকগুলি মানুষের নেশা হ'য়ে ওঠা

চাই। সকলে এটা পারবে না। তবে কিছু লোক এমনতর চাই-ই। তারাই হ'লো এ যুগের দধীচি। এইসব দধীচির অস্থি না হ'লে সর্ব্বনাশ-নিপাতী বজ্রের নির্ম্মাণ হবে না। অস্থিদান মানে আমি বুঝি আত্মদান। ম'রে যাওয়া নয়, বেঁচে থেকে সিদ্ধিদাত্রী কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিঃশেষে আত্মনিয়োগ, হাড়মাস ঐ কাজে লাগান।

১৫ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪৯ (ইং ২।১০।৪২)

কাল রাত্রে ময়মনসিং জেলার সেরপুর অঞ্চল থেকে ২৭টি হৈহয় ক্ষত্রিয়-পরিবার এসেছে আশ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। সঙ্গে এসেছেন নিবারণদা (বাগচী), ময়মনসিংয়ের অধরদা (লস্কর)। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) ও প্রফুল্ল আশ্রম থেকে গিয়েছিলেন ওদের নিয়ে আসতে। তাঁরাও ফিরেছেন ঐ সঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে আশ্রমে বাঁধের পাশে তাবুতে ব'সে আছেন। চতুর্দ্দিক শরতের স্বর্ণকিরণে পরিপ্লাবিত হ'য়ে যাচ্ছে। আশ্রমের বাবলা, বকুল ও নিম-গাছের ডালে-ডালে রং-বেরংয়ের নানারকম পাখী আনন্দে দোল খেয়ে বেড়াচ্ছে। সম্মুখের উদার উন্মুক্ত প্রান্তর ও অন্তহীন দিগন্ত হাতছানি দিয়ে দূরের পানে ডাকছে। প্রকৃতির বক্ষে অনুরণিত আগমনীর আনন্দগান মানুষকে উধাও আনন্দে আত্মহারা ক'রে তুলতে চাইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুভ্রহাস্যে আনন্দের রেণু ছড়িয়ে প্রীতিভরে ডাক দিলেন—ও অধর!

অধরদা—আজ্ঞে, বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের বাড়ী ছেড়ে এসে মনটন খারাপ করেনি তো? ভিটে-মাটির মায়া কি মানুষের কম? ওরা যে ছেড়ে আসতে পেরেছে সে কম কথা নয়।

অধরদা—ওরা বাড়ী থেকে তো বড় বাড়ীতে এসেছে। মন খারাপ লাগবে কেন? ওরা এখানে এসে খুব খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই বোধ থাকলে আর কোন ভাবনা নেই। সত্যিই আশ্রম হ'লো সব জায়গাকার সবারই বাড়ী-ঘর। ওরা খুশি আছে শুনে খুব ভাল লাগছে। আমার মন বড় খতায়। ভাবি, ওদের মনটন খারাপ না লাগে। আমি তো টাকাওয়ালা মানুষ না, যে টাকা দিয়ে মানুষের সবরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ক'রে দেব। এখানে কষ্ট আছে, অসুবিধা আছে। আমাকে ভালবেসে কষ্টটাও যারা সুখের ব'লে মনে করে, তাদের জন্য মন ততটা উদ্বিগ্ন হয় না। জানি হরে-দরে তারা ঠিক থাকবে। আনন্দ না মরলে তো মানুষ মরে না, তাই ভাবনার কী।

আস্তে-আস্তে লোকজন আসতে লাগলেন। (বর্দ্ধমান জিলার পালসিটের)

শিবদাসদা (কোঁয়ার) জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ যদি খেতে না পায়, শুধু মনের আনন্দ নিয়ে থাকে, তাহ'লে কি সে বেঁচে থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ওরে পাগল! মনে যদি আনন্দ থাকে, তবে মানুষের পেটের ভাত কাড়ে কে? পেট তো আর পেটের ভাত জোগাড় করে না। পেটের ভাত জোগাড় করে মানুষ খেটেপিটে, কোন না কোনভাবে অন্যকে সেবা দিয়ে। সেবা তখনই সফল হয়, যখন তার সঙ্গে থাকে উদ্দীপনী ব্যবহার। যে নিজেই দীপ্ত নয়, সে মানুষকে উদ্দীপ্ত করবে কী?

শিবদাসদা—সব কাজের মধ্যে এটা লাগে কোথায়, তা' ঠিক বুঝতে পারি না। যে অফিসে ব'সে কলম পিসে টাকা এনে খায়, তার তো মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে হয় না, অথচ বেশ ঘরে পয়সা আসে। বাবুগিরি ক'রে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জগতে এমন কোন অর্থকরী কাজ আছে কিনা জানি না, যার সঙ্গে বহু মানুষের সম্পর্ক জড়িত নেই, সে প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক, আর পরোক্ষভাবেই হো'ক। যে কেরাণীগিরি করে, তার উপরওয়ালা আছে না? সমপর্য্যায়ের লোক আছে না? নিম্নতন কর্ম্মচারী আছে না? অন্ততঃ এদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যদি চলতে না পারে, এদের যদি খুশি রাখতে না পারে, তাহ'লে শুধুমাত্র খাতার পাতাকে খুশি রেখে তার কিন্তু পেট ভরবে না। হও না তুমি মস্ত একটা কাজের লোক, তুমি যদি কারও হৃদয়ের দিকে না তাকাও, তোমার দক্ষতার অহংকারে সকলকে নস্যাৎ করতে থাক, তুমি দুনিয়ার বুকে ক'দিন টিকে থাকতে পার, তোমার স্বাচ্ছন্দ্য কতখানি বজায় থাকে দেখ না? এ বাবা ঘটে-ঘটে নারায়ণ, যার পূজোয় ত্রুটি হবে, সেই-ই কুপিত হবে, বেঁকে বসবে। তখন ঠেলা সামলাও।

শিবদাসদা (সহাস্যে)—সকলকে খুশি করতে গেলেও প্রাণ যাবে, এমনিও প্রাণ যাবে। প্রাণ যায় তো বরং এমনিই যাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর (গম্ভীর কণ্ঠে)—প্রাণ যদি যেতে বসে, তখন আর ও কথা কবা নানে মণি! মুখের হাসি মিলায়ে যাবিনি। কান্দে কূল পাবা নানে। আর্ত্তস্বরে চিৎকার করতি থাকবানে 'ওগো গেলাম, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও, আর পারিনে।' বিপদে প'ড়ে মানুষ কাটা কই মাছের মতো কেমন ছটফট করে, আকুলি-বিকুলি করে-তা' দেখনি, যে প্রাণ যাওয়া নিয়ে কাব্যি করতিছ? ওগুলি হ'লো পোয়াকী কথা! আর, সবাইকে খুশি করা মানে কী? তুমি যদি প্রত্যেকের খোশখেয়াল তামিল ক'রে প্রতিপ্রত্যেকটি মানুষকে খুশি করতি যাও, তাহ'লে তুমিও গেছ, তারাও গেছে। দরকার হ'চ্ছে নিজ-নিজ সাধ্যমত পরিবেশকে পোষণ দেওয়া আর সবার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সন্দীপনী ব্যবহার নিয়ে চলা। অযথা কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে নেই বা মনে আঘাত দিতে নেই। একটা দুর্ব্বল নগণ্য মানুষকেও না। তাই ব'লে কি প্রয়োজনমত শাসন করবে

না, অসৎ-নিরোধ করবে না? তা' না করা কিন্তু মহাপাপ। তাহ'লে তুমি নিজের শত্রু, সমাজের শত্রু। তবে যেমন শাসন করতে হবে, তেমনি তোষণ করতে হবে। ছাওয়াল-পাওয়ালের বেলায় যেমন কর আর কি! আর কোন্ মানুষটার সঙ্গে কেমনভাবে deal (ব্যবহার) করা লাগে, তার একটা নিরিখ চাই। এক-একজনের স্নায়ু এক-একরকম, মাথা এক-একরকম। কার কতটুকু সয়, কার বেলায় কতটুকু মিঠে, কতটুকু কড়া আবার কতটুকু মিঠেকড়া লাগে, তা' বুঝতে হয়। ক্ষেত বুঝে চাষ দিতে হয়। আজকাল আমাদের স্কুল-কলেজে সব শেখায় কেবল লোকব্যবহার ছাড়া। আর, এর মস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হ'লো স্ব-স্ব পরিবার। সেকালে বড়-বড় পরিবারের পাকা প্রবীণ কর্তাদের দেখিছি—তাদের কতখানি বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি ছিল। এক-একটা মানুষ সংসারের হাল ধ'রে রাখতেন। ছেলেমেয়ে, বৌ-ঝি, বুড়োগুড়া প্রত্যেকের আচার, ব্যবহার, চালচলনের প্রতি তাঁদের তীক্ষ্ম নজর ছিল। একটি ছেলে হয়তো প্রস্রাব ক'রে জল নেয়নি। তিনি নিজ হাতে একঘটি জল ও ঘর থেকে একখানি কাপড় বের ক'রে এনে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন—প্রস্রাব ক'রে জল নাওনি, ঘরে ঠাকুর-দেবতার আসন আছে, ঐ কাপড় প'রে ঘরে ঢুকো না। যাও, জলশৌচ ক'রে আস, তারপর কাপড় বদলে ঘরে যাও। একদিন এমন ঘটলে পরে তার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হ'য়ে উঠতো। আমি এটা উপমাচ্ছলে বললাম। এইভাবে কতরকম সুষ্ঠু পন্থা যে তাঁরা অবলম্বন করতেন পারিবারিক ধারা ও কুলকৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাদের ধ্যানজ্ঞান ছিল ঐ! সে শিক্ষাদীক্ষা আজ কোথায়? বহু পাশ-করা মানুষ দেখি, বয়স্ক, হোমরাচোমরা। তাদের মধ্যে কিছু-কিছু দেখে কিন্তু মনে হয় সদ্য যেন আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়ে দুনিয়ায় পাড়া দিল। চোখ খোলেনি, নাক খোলেনি, কান খোলেনি। উঁচুনীচু সম্বন্ধে জ্ঞান হয়নি, তাই বিশ হাত নীচু গর্ত্তটাকেও মনে করছে সমতল ভূমি। নিশ্চিন্ত মনে পা বাড়াচ্ছে আর হাত-পা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে।

নিবারণদা (বাগচী) লেখাপড়া-জানা মানুষেরও এমন হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, ডিগ্রী পায়, শিক্ষিত হয় না। কথা-সর্ব্বস্ব হ'য়ে কথার বেসাতি করে। আচরণের ধার ধারে না। শিক্ষার নামে এই vicious circle (দুষ্ট-চক্র) চলেছে সারা দেশে। আদত কথা শিক্ষকেরই যে অভাব। যাঁরা বড় বড় কথা মুখে বলেন, আলোচনা করেন, অথচ কাজে তা' ফলিয়ে তোলেন না, তাঁরা যদি হন শিক্ষক, তবে ছাত্ররাও তো ঐ-ই করবে। তার বেশী আর কি আশা করা যায়? আজকালকার বাজারে মানুষে চটক দেখে, চরিত্র দেখে না। দুটো ইংরেজী ভাল ক'রে লিখতে বা বলতে পারলে তো মানুষের চাকরীর অভাব হয় না। আর চাই কী? শিক্ষার উদ্দেশ্য তো ওখানেই সার্থক

হ'য়ে গেল। আর, রকম দাঁড়িয়েছে এমন যে বেশীর ভাগ তথাকথিত শিক্ষিত লোকের পরের গোলামী করা ছাড়া যেন কোন গত্যন্তর থাকে না। University-তে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) না ঢুকলে বরং পারে, কিন্তু একবার University-তে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) ঢুকলে অনেকেরই চাকরীর বুদ্ধি প্রবল হয়। এই যে আচরণ-হীন কথার কারবার, অভ্যাস-ব্যবহারের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেইকো, শিক্ষার নামে যতদিন তা' চলতে থাকবে, ততদিন মানুষ মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে দাঁড়াতে পারবে না। তাদের personality (ব্যক্তিত্ব) bifurcated (দ্বিধা-বিভক্ত) হ'য়ে থাকবে। তারা যা' বলবে, লিখবে, তা' করবে না, যা' করবে তা' বলবে না, লিখবে না। এই মিথ্যাচার মানুষকে কতটা বড় ক'রে তুলতে পারে, তা' কি বোঝ না? এর মধ্য-দিয়েও যে কতকগুলি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক না বেরুচ্ছে, তা' নয়, কিন্তু তার মধ্যে আছে সুষ্ঠু জন্ম, বিহিত পারিবারিক শিক্ষা ও আদর্শপ্রাণ শিক্ষকের সাহচর্য্য ও প্রেরণার প্রভাব। কিন্তু অনেকের ভাগ্যেই সে সর্ব্বাঙ্গীণ যোগাযোগ ঘ'টে ওঠে না।

উমাদা (বাগচী)—মাষ্টারমশায়রা আর করবেনই বা কী? অভিভাবকরা স্কুলে ছেলে পাঠায় পাশ করাবার জন্য, শিক্ষকদেরও লক্ষ্য থাকে, কেমন ক'রে পাঠ্য বিষয়গুলি ভাল ক'রে পড়িয়ে দিয়ে ছেলেদের ভালভাবে পাশ করান যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উদ্বেগের সঙ্গে)—তা'তে যা' হবার তাই-ই হ'চ্ছে। কতকগুলি কথা পুরে দিয়ে মগজটাকে ভারাক্রান্ত ক'রে কী লাভ হবে যদি তার সঙ্গে হৃদয় ও চালচলনের সঙ্গতি না থাকে নিজের কাছেই নিজে একটা সং সেজে লাভ কী? গোটা মানুষটাকে যদি গ'ড়ে তোলা না যায়, শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপুষ্ট ক'রে কী হবে? আর, বুদ্ধিগত উৎকর্ষই কি আমাদের খুব একটা কিছু হ'চ্ছে? মৌলিক জ্ঞান, গবেষণা ও অবদানের কথা তো বড় একটা শুনি না! বছরের পর বছর ভাল-ভাল ছেলেরা তো ফাষ্ট, সেকেণ্ড হ'য়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা যাচ্ছে কোথায়, করছে কী? দেখ গিয়ে বেশীর ভাগ চাকরীর গর্ত্তে ঢুকে যাচ্ছে। দেশ তাদের কাছ থেকে পাচ্ছে কী? এ অবস্থাটা হয় কেন ভেবে দেখেছ?

উমাদা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো পাগুলে কথা! আমার মনে হয়, যারা জ্ঞানবুদ্ধিমত conscientiously (বিবেক-সহকারে) চলে না, বুঝটাকে করায় ফলিয়ে তোলে না, যাদের বোধের সঙ্গে আচরণের মিল নেই, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও দিন-দিন অপকর্ষের পথে চলতে থাকে, মাথা blunt (ভোঁতা) হ'য়ে আসে। ঐ ভোঁতা মাথা নিয়ে, দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব নিয়ে দুনিয়াকে independently face করতে (স্বাধীনভাবে দুনিয়ার সম্মুখীন হ'তে) সাহস পায় না। তাই কোন-রকম ঝুঁকি না নিয়ে বিদ্যোবুদ্ধির মজুরি করে। বিদ্যা বলতে আমি কিন্তু বুঝি

তাই যা মানুষের বিদ্যমানতা বা অস্তিত্বকে অটুট রাখতে শেখায়। নিজের অস্তিত্বকে ঠিক রাখতে গেলে আবার পরিবেশের অস্তিত্বকে ঠিক রাখা লাগে। তাই পরিবেশের অস্তিত্বকে নিরাবিল ও উন্নত ক'রে তোলার উদগ্র আগ্রহ যদি বিদ্যামন্দিরে বিদ্যার্থীদের ভিতর সঞ্চারিত না হয় শিক্ষকদের মাধ্যমে, তবে সে-বিদ্যা বিদ্যা নয়, অবিদ্যা। অবিদ্যার চর্চ্চা ক'রে-ক'রে তো আমরা দিন-দিন বিদ্যামানতার ভূমি থেকে অবিদ্যমানতার অলীক লোকে ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলেছি।

ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়)—এখন উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আদর্শানুরাগ সঞ্চারিত করা। আদর্শ হওয়া চাই একটি জীবন্ত মানুষ, যাঁর মধ্যে অনুসন্ধিৎসু সেবা-বুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়ভাবে জাগ্রত। তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিতর-দিয়ে তাঁর ঐ তীব্র নেশা যতখানি সঞ্চারিত হবে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে, তাদের গোটা ব্যক্তিত্বও ততখানি উদ্ভিন্ন ও বিকশিত হ'য়ে উঠবে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী, তাদের করা, বলা, ভাবার মধ্যে এক-একটা Chinese wall (চীনের দরজা) খাড়া হ'য়ে উঠবে না। তারা হবে এক-একটা আস্ত মানুষ! তাদের দুর্ব্বার আত্মিক শক্তি অর্থাৎ গতি-শক্তির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। গীতায় আত্মা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—শস্ত্র একে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি একে দগ্ধ করতে পারে না, জল একে আর্দ্র করতে পারে না, বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না। এই আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন। স্থাণু মানে স্থৈর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। অচল মানে অটল, নিজের আদর্শ ছেড়ে এক পাও চলে না, কখনও বিচ্যুত হয় না তাঁ থেকে। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এই যে-সব কথা আছে এগুলিকে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে হবে প্রত্যেকের জীবনে ও চরিত্রে along with his environment in the material plane (প্রত্যেকের পরিবেশ সহ বস্তুতান্ত্রিক স্তরে)। তবেই বিদ্যমানতা দৃঢ় হবে। আমি তাকে বলি বিদ্যা। এমনতর বিদ্বান যে সে কোন্ দুঃখে চাকরী খুঁজতে যাবে? তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তার এতই করা থাকবে মানুষের জন্য যে মানুষ তাকে দেবার জন্য পাগল হ'য়ে পিছু-পিছু ছুটে বেড়াবে। মানুষ দিতে চাইবে, কিন্তু সে নিতে চাইবে না। যখন দেখবে, না নিলে কেউ ব্যথিত হয়, তখন যৎসামান্য নেবে। তা'তেই তার হেউঢেউ হ'য়ে যাবে, তা' দিয়ে আরো কতলোককে খাইয়ে বাঁচাতে পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বললেন—তামুক দাও।

লীলামা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বলছেন—আমার হইছে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মতো অবস্থা।

জিতেনদা (রায়)—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করবার কিছু পারি আর না পারি, সকলকে টেনে লম্বা করার রোখ্‌টা ছাড়তে পারি না। তাই লেগেই থাকি ফিঙ্গে হ'য়ে। আশা ছাড়ি না। আপনাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার করি না। আমার মাতাল আশা আমাকে সে-কথা ভাবতে দেয় না, যে-কথা আমার আশা পরিপূরণের পক্ষে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলকথা, যোগ্যতা বা মগজ সবার আশানুরূপ নয়। কিন্তু তাতে খুব আটকায় না, যদি মানুষ sincere (একনিষ্ঠ) হয়। বোধ-অনুযায়ী না করায় যেমন মানুষের brain (মস্তিষ্ক) dull (নীরেট) হ'তে থাকে ধীরে-ধীরে, তেমনি বোধ-অনুযায়ী কাজ করে যারা, করার পাল্লায় প'ড়ে ঠোক্কর খেতে-খেতে তাদের brain (মস্তিষ্ক) আবার খুলতে থাকে। করার ভিতর-দিয়ে যোগ্যতাও বেড়ে যায়—যার যেমন বাড়া সম্ভব তদনুপাতিক। ভাবনা হয় তাদের নিয়ে, যারা নড়তে চায় না, করতে চায় না, ব'সে-ব'সে তত্ত্ব কথা শুনতে চায়। আর, অন্তরাত্মা ডরিয়ে ওঠে তখনই যখনই দেখি, কেউ অকৃতজ্ঞ বা বিশ্বাসঘাতক।

নরেনদা (চক্রবর্ত্তী)—তাদেরও তো পরিবর্ত্তন হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বড় কঠিন কথা। কারও কাছে উপকার পেলেই তারা তাকে জব্দ করতে চায়, কলে ফেলে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে যেমন খুশি দোহন করতে চায়, কোন-কোন সময় সাবাড়ই ক'রে দিতে চায়। কৃতজ্ঞতার বোঝা বইতে যে নারাজ তারা। আমার মনে হয়—এটা হ'লো একটা dangerous ও distorted form of homicidal and suicidal tendency (নরহত্যা ও আত্মহত্যার প্রবৃত্তির সাংঘাতিক ও বিকৃত রূপ)। এগুলি মানুষের রক্তের মধ্যে থাকে। ছাড়া কঠিন।.................Pedigreed dog (ভাল জাতের কুকুর)-কে যদি কেউ tempt (প্রলুব্ধ) করতে যায়, সে তার টুঁটি চেপে ধরে। কিন্তু সাধারণ কুকুরকে চোর একটুকরো মাংস দিয়েই ভুলিয়ে রেখে গৃহস্থের বাড়ী থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে পারে। এও রক্তের ব্যাপার। তাই এখানকার জন্য মানুষ আনতে খুব সাবধানে দেখেশুনে আনতে হয়।

শৈলেনদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা (নবাগত হৈহয় ক্ষত্রিয়-পরিবারের লোকেরা) বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছে তো?

শৈলেনদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাঝে-মাঝে খোঁজখবর নিস।

শৈলেনদা—আচ্ছা। তবে আমাদের কিরণদার (ঘোষ) ওদের সঙ্গে পটে খুব ভাল। মাথাটাথা ঝাঁকায়ে কি যেন কয়, আর ওরা খুব স্ফূর্ত্তি পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ তো! যেখানে যেমন, সেখানে তেমন চালে না চললে কি

হয়? তাই নটের মতো চলা লাগে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় লক্ষ্য রেখে। কোন আড় থাকবে না। কথাবার্ত্তা, চালচলন হবে সহজ, সাবলীল, বিচিত্র রস-সমন্বিত। যারা এক ঘেয়ে রকমে চলে, তারা সবধরণের লোককে নিয়ে চলতে পারে না। তাদের অভিজ্ঞতার জগৎ হ'য়ে থাকে সংকীর্ণ। আমি বই পড়িনি বটে, কিন্তু মানুষ এত পড়িছি যে একটু টোকা দিলেই টের পাই, কে কী রকম। জীবনে আমি অনেক ঠকিছি, কিন্তু সবই জেনে, বুঝে। কারও রকম-সকম দেখে খারাপ মনে হ'লেও তা' বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না। ভাবি, দোষ-ত্রুটি নিয়েও লোকটা ভাল, আর ভালবাসার আওতায় একদিন না একদিন শোধরাবেই। তবে এ-কথা ঠিক জেনো, born incorrigible (জন্মগতভাবে অসংশোধনীয়) একদল আছে, তাদের কিছুতেই কিছু হবে না অন্ততঃ ঐ কাঠামো থাকতে। শরীর বদলে আসলে যদি কিছু হয়, হ'তেও বা পারে। সাধারণতঃ প্রতিলোমী ছিট থাকলে ঐ রকম ধরণ হয়। আমার মনে হয়, criminality runs in families (অপরাধপ্রবণতা বংশধারায় প্রবাহিত হয়)। অমনতর ধারা যে-সব পরিবারে চলছে, আইন ক'রে তাদের বিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া ভাল। আর, বিয়ে করলেও যা'তে সন্তান-সন্ততি না হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা করা লাগে।

শৈলেনদা—বর্ত্তমানে এই গণতন্ত্রের যুগে তাহ'লে তারা তো আন্দোলন সুরু করবে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হ'চ্ছে ব'লে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাপ, বাঘ যারা মানুষের জীবন নাশ করে, মানুষ তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করে। এখন ঐ সাপ-বাঘের দল যদি আন্দোলন করে, 'আমাদের স্বচ্ছন্দ চলনে ব্যাঘাত জন্মান হ'চ্ছে', তাহ'লে তোমরা কি তাদের সেই দাবী মেনে নেবে?

শৈলেনদা—সাপ-বাঘের কথা আর মানুষের কথা তো এক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাপ-বাঘের থেকেও হিংস্র ও ক্রূর মানুষের অভাব নেই। মানুষের চেহারা নিয়ে জন্মালেই যদি মানুষ মানুষ হ'তো তাহ'লে তো আর কথা ছিল না। মানুষের চেহারাওয়ালা যতগুলি জীব আছে, তাদের প্রত্যেককে সমান মনে করা ও প্রত্যেককে সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া—এর কি মানে হয় তা' আমি বুঝতে পারি না। ধর, শিক্ষা প্রত্যেককেই দেওয়া উচিত, কারণ শিক্ষা মানুষের ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে দেয়। চৌর্য্য যদি আমার জন্মগত প্রকৃতি হয় এবং সে প্রকৃতির সংশোধন বা মোড় ফেরাবার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা বা চেষ্টা যদি তোমার না থাকে, অথচ আমাকে লেখাপড়ায় খুব ওস্তাদ ক'রে দাও, তাহ'লে আমি ঐ লেখাপড়ার সাহায্যে চুরিই তো আরো ভাল ক'রে করব, না আর কিছু? আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তুমি সমাজের উপকার করলে না অপকার করলে? আমাকে লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব নেবে, অথচ আমার

অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তির সংশোধনের দায়িত্ব নেবে না, আমি একটা সাধারণ অপরাধী ছিলাম, আমাকে একটা পাকা অপরাধী হ'তে সাহায্য করবে, তোমার এই অপকর্ম্মের জন্য কেন তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না বলতে পার? মানুষের শুধু ভাল করতে চাইলেই ভাল করা যায় না, মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বাঙ্গীণ ও সুগভীর জ্ঞান চাই। তাই ব্যক্তি, দম্পতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগঠনের জন্য শরণাপন্ন হ'তে হয় ঋষির, যিনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সবটার রূপ দেখেন, প্রকৃতি বোঝেন। খাপছাড়া সঙ্গতিহীন জ্ঞান ও চরিত্র নিয়ে নেতা হওয়া যায় না। যারা নিজেরা নীত নয়, তারা আবার মানুষকে পরিচালনা করবে কি? তাই আমি বলি, ইষ্ট নাই, নেতা যেই, যমের দালাল কিন্তু সেই।

শৈলেনদা—সব সময় সব দেশ ঋষি পাবে কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋষি যদি না পায়, ঋষি-অনুগামী ভক্ত তো পেতে পারে, ঋষি-প্রদর্শিত পথে তো চলতে পারে।

শৈলেনদা—আপনি যেমন বললেন, তা'তে সবাইকে তো সব রকম অধিকার দেওয়া যায় না, এতে কি সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতিপ্রদত্ত যে বৈষম্য আছে, তার সংরক্ষণেই তো সাম্যের প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে। সাম্য বলতে আমি এখানে বলছি balance (সমতা)। পৃথিবীতে যত মেয়েছেলে আছে, পুরুষের সঙ্গে তাদের সম অধিকারের দাবী মেনে নিয়ে ভগবান যদি রাতারাতি তাদের বেটাছেলেয় পরিণত ক'রে দেন, তাহ'লে কী অবস্থাটা দাঁড়ায় ভেবে দেখ তো? তা'তে কি মেয়েছেলেরই সুখ হয়, না তারা তা' চায়? ভগবান যদি সমান অধিকারের দাবী to its fullest extent (পরিপূর্ণ মাত্রায়) মঞ্জুর ক'রে দেন—যতখানি তারা চায় বা কল্পনা করে তার চাইতেও অনেকখানি বাড়িয়ে—তাহ'লে দেখবে, ঠিক তারা কান্না জুড়ে দেবে। মা, বৌ, মাসী, পিসী, বোন ও মেয়ে হারিয়ে পুরুষদেরও প্রাণ খাঁ-খাঁ করবে। (শ্রীশ্রীঠাকুর সহ সকলের সানন্দ হাস্য)। ফলকথা, তোমার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখায় আমার স্বার্থ আছে, আমার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখায় তোমার স্বার্থ আছে। এ ছাড়া আমরা বাঁচি না। আমাদের নানা প্রয়োজন নানা বৈশিষ্ট্য-ওয়ালা মানুষ সরবরাহ করে, তাই আমরা বাঁচতে পারি। শুধু ডাক্তার যদি থাকে আর মাষ্টার যদি না থাকে, তবে ডাক্তারের ছেলেকে পড়াবে কে আর শুধু মাষ্টার যদি থাকে, ডাক্তার যদি না থাকে, তাহ'লে মাষ্টার বা মাষ্টারের ছেলের অসুখ হ'লে চিকিৎসা করবে কে? সবরকম বৈশিষ্ট্যেরই লোক চাই, তা' না হ'লে প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তাই এখানে লোক আনার সময় গয়লা, কামার, কুমোর, তেলী, মালী, তাঁতী, কংসকার, স্বর্ণকার, চাষী, ঘরামী, সূতোর, রাজমিস্ত্রী, দর্জ্জি, মোদক, martial instinct (সামরিক সংস্কার)-ওয়ালা লোক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আনতে বলি। সবগুলির

সমাবেশ যদি হয়, তাহ'লে পারম্পরিক শিক্ষার দিক দিয়েও অনেকখানি সুবিধা হয়। প্রত্যেকে চৌকস হবার সুযোগ পায়। সুযোগ দিতে হবে প্রত্যেকের সৎ-বৈশিষ্ট্য যা' আছে, তা' যা'তে বিকশিত হ'তে পারে। আবার, অসৎ অর্থাৎ সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর বৈশিষ্ট্য যা' আছে, তার যা'তে নিরসন বা রূপান্তর হয়, তার ব্যবস্থাও করতে হবে। নচেৎ তথাকথিত সমান অধিকারের কোন মানে হয় না। প্রত্যেককে সমান অধিকার আজই কি তোমরা দিতে পার? তাহ'লে চোর-ডাকাতকে জেলে পুরে রাখ কেন? তারাও তো চায় আর দশ-জনের মতো বাইরে থেকে নিজেদের ক্ষমতা ও রুচি-অনুযায়ী স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে। পরিবেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করে ব'লেই তো তাদের শাস্তি দাও। তাই এর প্রয়োজন আছে না? এ বাদ দিয়ে তুমি যাবে কোথায়? এককথায়, বাঁচা-বাড়ার পরিপোষণী যা', তাকে এস্তার বাড়িয়ে দিতে হবে, এবং তার প্রতিকূল যা', তাকে নিরোধ করতে হবে। জন্মগত অপরাধীর বংশ বৃদ্ধি হবে, তারা সমাজের অপকার করবে, তারপর তোমরা তাদের যেয়ে জেলে পুরবে, চক্রবৃদ্ধিহারে এই পাপ-প্রগতিকে বাড়তে না দিয়ে আইন ক'রে যদি তার সম্ভাবনাই কমিয়ে দাও, তাহ'লে সেটা কি এমন গণতন্ত্র-বিরোধী কাজ হয়, তা' আমি বুঝি না বাপু! আমি মুখ্যু মানুষ। কেই বা আমার কথা শুনতে যাচ্ছে? তবে দাসীর কথা বাসী হলি কামে লাগবি। আমার এ-কথাগুলি যদি লেখা থাকে, একশ বছর পরে লোকে ঠেকে শিখে কবে—ঠাকুর কথা যা' ক'য়ে গেছেন, অত্যন্ত খাঁটি কথা। ওঁর একটা কথাও নড়াবার জো নেই।

সুরবালামা কি একটা জিনিস নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী মাল রে?

সুরবালামা—বড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা', বড় বৌয়ের কাছে দিয়ে আয় গিয়ে। বড়ির ঝোল বড় ভাল লাগে!

সুরবালামা বড়ি দিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়ির মধ্যে তিল ও চিনেবাদাম বেটে দেওয়া যায় না?

সুরবালামা—তা' যাবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রে দেখলি হয়। ওতে স্বাদও যেমন ভাল হবে, পুষ্টিকরও হবে তেমনি। তিল বা চিনেবাদাম কোনটারই দাম বেশী নয়। নিরামিষ যারা খায়, তাদের পক্ষে এই দুটো জিনিস নানাভাবে খাওয়া খুব ভাল। তিলবাটা একটু তেল, লংকা দিয়ে ভাতের পাতে মেখে খেতে বেশ লাগে।

চারুদা (সরকার) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সস্নেহে)—চেহারা অমন হইছে ক্যান্?

চারুদা—পেট বড় খারাপ। আমের দোষ, যা' খাই হজম হয় না।

অনেকদিন থেকে এইরকম চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীকে দেখায়ে ওষুধ খালি হয়।

চারুদা— সে অনেক টাকার ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত টাকাই হোক, আগে জীবন তারপর টাকা। ওষুধ খাওয়া সুরু করলিই হয়।.................এই, ভবানীকে ডাক্ তো।

মাণিকদা (মৈত্র) দাঁড়িয়েছিলেন কাছে। মাণিকদাই ডেকে নিয়ে আসলেন।

ভবানীদা (সাহা) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর চারুদাকে দেখিয়ে বললেন—ওর চিকিৎসার জন্য টাকা যা' লাগে দিও।...............চারুদার দিকে চেয়ে বললেন—ওষুধপত্র প্যারী যা' দেয়, তা' তো খাবাই, আর রোজ সকালে খালিপেটে অন্ততঃ ৫।৬টা থানকুনীপাতা চিবায়ে খেয়ে ফেলবা। দীক্ষার সময় যে রোজ থানকুনীপাতা খাওয়ার কথা বলা হয়, সে কথা অনেকেই মানে না। মানবে কি, ঋত্বিক্ যারা, তাদের অনেকেই খায় না।

শৈলেনদা—সব জায়গায় পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছায়ায় শুকিয়ে বা বড়ি ক'রে যদি খাওয়া যায়, তা'তেও উপকার হয়।

চারুদা—আমাকে যে থানকুনীপাতা খাওয়ার কথা বললেন, আমি থানকুনীপাতা পাব কোথায়?

একটি দাদা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—তা'ও ঠাকুর এনে দেবেন নাকি? খুব তো আবদার!

শ্রীশ্রীঠাকুর (ধমকের সুরে)- তোমার কাছে যদি ওর আবদার না টেকে তাহ'লে আমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে আবদার করবে? রোগা মানুষটাকে খুব তো কড়া কথা শুনিয়ে দিলে, সহানুভূতি-সহকারে এ কথা বললে না—'চারুদা! আপনি ভাববেন না, থানকুনীপাতা আমিই জোগাড় ক'রে দিতে চেষ্টা করব।' তাহ'লে যে লোকটা একটু বুকে বল পায়, তা' কি বোঝ না? নিজের অসুখ-বিসুখ করলে মনের অবস্থা কেমন হয়, তা' কি মনে থাকে না? তোমরা ভাব, মানুষকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখলেই আমাকে relief (স্বস্তি) দেওয়া হয়। সত্যিকার relief (স্বস্তি) যদি আমাকে দিতে চাও, তবে মানুষের দুঃখ-কষ্টের সময় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িও, তাদের এমন ক'রে আগলে ধ'রো, যা'তে তাদের আমার কাছে আসার প্রয়োজন না হয়। অনেকে অবশ্য কিছু না ক'রে আমার মমতার সুযোগ নিয়ে বাঁচতে চায়। আবার অনেকের অনেক রকম খাওলোভি আছে। সেগুলি নিরোধ করাই ভাল। কিন্তু তা' আমার সামনে বা আমাকে দেখিয়ে করা ঠিক নয়। ওর পিছনে অনেক রকম বাজে মতলব থাকে, তাই আমার ও আর দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। আমার সামনে কাউকে যদি পাঁচ কথা শোনায়, আমি প'ড়ে যাই বিপদে। যে বলছে তার

বিরুদ্ধে কোন কথা না বললে, যাকে বলছে সে ভাবে, 'ঠাকুর উসকায়ে দিছেন ওকে। তা' ওকে দিয়ে বলান কেন? যা' বলবার ঠাকুর নিজে বললেই তো পারেন!' আবার যদি কিছু বলি, তখন যাকে বলছে, সে জুত পেয়ে যায়। ভাবে—এইতো ঠাকুরের সমর্থন পেলাম, আমার চলনা ঠিক আছে। এই নিয়ে আর দশজনের কাছে আবার বড়াই ক'রে বলে—'অমুকে ধরিছিল আমাকে ঠাকুরের সামনে—তুমি এ কর কেন? ও কর কেন? ঠাকুর ছেঁচে দিছেন একেবারে। ঠাকুর-দরদী সাজে! ওরে আমার ঠাকুর-দরদী রে! জানা আছে সকলের চরিত্তির!' যাদের কাছে এ-সব কথা ব'লে বড়াই করে, তারাও যে নিরোধ করবে বা রুখে দাঁড়াবে তা' দাঁড়ায় না। দেশে যে মেলা ক্লীব ও নপুংসকের আমদানী হইছে, তা' আমার এখানকার নমুনা দেখেই ঠিক পাই। সারা দেশের লোকই তো এখানে আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠে পড়লেন। পিছনে-পিছনে চললেন সবাই। শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরমুখী হ'য়ে হাঁটতে-হাঁটতে বলছেন—আমার এখানে ভাল মানুষ আছে যথেষ্ট, কিন্তু রাখালী করবার লোকের অভাবে মানুষগুলিকে ভাল ক'রে কাজে লাগান গেল না। আর, আলসেমী ক'রেও দিন চলে ব'লে বহু মানুষ অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ছে। কী জন্য কী হ'চ্ছে সবই বুঝি। কিন্তু আমার পক্ষে কড়া হওয়া মুশকিল আছে। আমাকে অচ্যুতভাবে ভালবাসে, প্রবৃত্তিঝোঁকা নয়, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান অথচ প্রয়োজনমত কঠোর, alert (সজাগ), efficient (দক্ষ), practical (করিৎকর্ম্মা), tactful (কৌশলী), চৌকস—এমনতর কয়েকটা মাহুত যদি পেতাম, তাহ'লে অনেক কিছু করা যেত।

২রা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৪৯ (ইং ১৯।১০।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে নিভৃত-নিবাসে ব'সে আছেন। কাছে বিশেষ লোকজন নেই, কেবল সরোজিনীমা, প্যারীদা (নন্দী) ও প্রফুল্ল আছেন।

প্রফুল্ল—মাঝে-মাঝে একটা কথা চিন্তা ক'রে আমার মনটা খুব খারাপ লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী কথা?

প্রফুল্ল—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃহারা আমি। কাকাই আমাকে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর জন্য কিছুই করতে পারলাম না। তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতা নেই, কিন্তু মনে শান্তি নেই। মনে-মনে প্রার্থনা করি, কাকা যদি আপনাকে পেতেন, তাহ'লে খুব ভাল হ'তো। কিন্তু তিনি কুল-গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, অন্য কোথাও দীক্ষা নেবার আগ্রহ দেখি না। সে-দিক দিয়েও কিছু করবার আশা দেখি না। তাই মনে হয়, আমি কাকার

কাছ থেকে শুধু নিলামই, পেলামই, তাঁর কোন কাজে লাগতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টসেবা যদি ঠিক-ঠিক ভাবে করা যায়, তবে তার ভিতর-দিয়ে সবার সব ঋণ শোধ হয়। কারণ, ইষ্টসেবা মানে মূর্ত্ত লোকমঙ্গলের সেবা, অর্থাৎ বাস্তব লোকমঙ্গলের সেবা, কারণ, তাঁর প্রেরণাতেই মানুষের মধ্যে লোক-মঙ্গল-প্রবৃত্তি গজিয়ে ওঠে। আর, সেই লোকমঙ্গলের মধ্যে নেই, এমন লোক নেই। তুমি যদি মানুষের জন্য সত্যই মঙ্গলকর কিছু করতে পার, আর সেই মঙ্গলকর কিছু করার যোগ্যতালাভের মূলে যদি থাকেন তোমার কাকা, তিনিও যে তার ফলে পরমপিতার বিশেষ করুণা লাভ করবেন, তা'তেও কোন সন্দেহ নেই। শাস্ত্রে বলে, সদ্‌গুরুলাভ করলে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার হয়। সদ্‌গুরু-লাভ মানে শুধু দীক্ষা নেওয়া নয়, সদ্‌গুরু তোমাকে পেয়ে বসবেন, যেমন মানুষকে ভূতে পায়।..............আর, তোর কাকাকে এখানে দীক্ষা নেওয়াবার জন্য ব্যস্ত হবি না। যে যা' করছে, তা' যদি নিষ্ঠাসহকারে করে, তার ভিতর-দিয়ে তার একটা বোধ হয়, আর সে বোধই তাকে তার করণীয় সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেয়। গীতায় আছে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

প্রফুল্ল—এই কথাটার ঠিক-ঠিক মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো সংস্কৃত জানি না, তবে আমার মনে হয়, ভগবানের আর এক নাম বিধি বা বিধাতা। আমি যেভাবে যা' করব, বিধি বা বিধাতাপুরুষ তেমনিভাবেই তার ফলবিধান করবেন। আমার সক্রিয় চাওয়াটা যেমন, আমার পাওয়াটাও তেমন। হিন্দীতে একটা বচন আছে—

'তুম যেইস্যা রামকো
তুমকো তেইস্যা রাম
ডাহিনে যাও তো ডাহিনে
বামে যাও তো বাম।'

কথাটা বোধহয় তুলসীদাসের। দুটো কথা মূলতঃ এক।

কাজলভাইয়ের অসুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব চিন্তান্বিত। বার-বার প্যারীদাকে (নন্দী) ঐ-কথা জিজ্ঞাসা করছেন। বলছেন শুনলাম, কাল সারারাত ছটফট করেছে, ঘুমোতে পারেনি। ওর শরীরটা কিছুতেই আর ভাল হ'চ্ছে না। একটু সুস্থ হ'য়ে ওঠে তো আবার অসুখে পড়ে।

প্যারীদার দিকে চেয়ে বললেন—আর-একবার দেখে আসবি নাকি?

প্যারীদা 'আচ্ছা যাই' ব'লে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিষণ্ণ কণ্ঠে)—পুজোর সময় মানুষ আমোদ-আহ্লাদ করে, কিন্তু আমার একে নিজের শরীর খারাপ, তারপর আবার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। পুজোটা কোথা দিয়ে কিভাবে গেল, টেরই পেলাম না। সামনে আবার কনফারেন্স। কত লোকজন আসবে, সবার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্ত্তা বলতে

পারব কি-না কি জানি! গলাটা তো সম্পূর্ণ ভালই হ'চ্ছে না। আমি কথা বলতে পারি বা না পারি, তোরা কিন্তু সব দিকে লক্ষ্য রেখে চলবি। কন্‌ফারেন্সে যারা আসবে, সকলকেই চাঙ্গা ক'রে দেওয়া চাই। এমন ক'রে দম দিয়ে দিতে হবে যে সেই দমের ঠেলায় তরতরে হ'য়ে না-চ'লেই পারে না।

প্রফুল্ল—খেপুদা, কেষ্টদা, বঙ্কিমদা প্রভৃতি আজ বিকালে আপনার কাছে বসবেন ব'লে মনস্থ করেছেন। এই কন্‌ফারেন্সে কোন্-কোন্ বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে, আপনার কাছ থেকে শুনে নেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। ....তোমরা বাইরে যে ঘোরাফেরা কর, একধারসে দীক্ষা দিয়ে গেলেই যে কাজ হ'লো, তা' মনে ক'রো না। স্থানীয় কর্ম্মীসৃষ্টির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। মানুষগুলিকে বার-বার এখানে পাঠাবে। প্রত্যেকটি বিষয় ও ব্যাপার সম্বন্ধে তোমাদের (সৎসঙ্গের) একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আছে, সেটা নিজেদের ভিতর আত্মস্থ ক'রে নিয়ে বাছা-বাছা লোকগুলিকে সেই ভাবে ভাবিত ক'রে তুলবে। গতানুগতিক ধর্ম্মবোধের মধ্যে অনেকখানি অধর্ম্ম আছে, অনেকখানি জড়তা আছে, জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে পরলোকমুখী হ'য়ে চলার বুদ্ধি আছে। তোমাদের সংস্পর্শে মানুষের ভিতর থেকে inertia (জড়তা) যেন ছুটে পালায়। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তোমাদের এতখানি active inquisitive interest (সক্রিয় অনুসন্ধিৎসু ঔৎসুক্য) থাকা লাগে, যে তা' দেখে যেন মানুষ শিখতে পারে, তাদের কী করণীয়। তোমাদের মুখের কথা কিন্তু মানুষ কমই নেবে। বেশী নেবে তোমাদের করাটা, তোমাদের চলাটা—তা'ও যদি তাদের শ্রদ্ধার পাত্র হও।

প্রফুল্ল—মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া যায় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ার মতলব নিয়ে যদি ঘোর, কখনও মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারবে না। আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার অটুট হয়, সেই শ্রদ্ধাই যদি তোমার চলনার নিয়ামক হয়, আর সেই শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত চরিত্র নিয়ে আদর্শের তৃপ্তিকামনায় যদি তুমি প্রতিটি মানুষের আদর্শানুগ সেবায় আত্মনিয়োগ কর, তাহ'লেই তুমি মানুষের সত্যিকার শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে উঠবে। আদর্শানুগ সেবার মধ্যে আছে সত্তানুগ সেবা। তা' দিয়ে মানুষের সত্তা পুষ্ট হবে। সে প্রকৃতই লাভবান হবে, এবং তুমিও লাভবান হবে তাদের দিয়ে। তারা তোমার asset (সম্পদ্) হ'য়ে উঠবে। ভাববে, বলবে—প্রফুল্লদার দৌলতে আমি জীবনের পথ পেয়েছি, উনি যা' করেছেন আমার, তার তুলনা হয় না। ঐ ভাব থাকলে যেমনতর করা আসে তোমার প্রতি, তাও আসবে। তাই আমি বলি মানুষ-সম্পদের কথা। এইভাবে মানুষ উপায় করা, মানুষের সাত্ত্বিক কল্যাণ করা এর চাইতে বড় জীবিকা কিছু হ'তে পারে না। সাত্ত্বিক কল্যাণের মধ্যে কিন্তু সত্তাসঙ্গত সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিহিত আছে। এই

ছিল ব্রাহ্মণ ও বিপ্রের কাজ। তাই ব্রাহ্মণ ও বিপ্রের এত সম্মান আমাদের দেশে। তাঁরা কখনও পরের চাকরী করতেন না, নিজেদের জন্য কারও কাছে কিছু যাচ্ঞাও করতেন না সাধারণতঃ। এরা ছিলেন আদর্শপ্রাণ, স্বাধীনচেতা, নির্ভীক, লোকযাজ্ঞিক। রাজারাজড়া, বৈশ্য, শেঠ সবাই তাদের সমীহ ক'রে চলত। তাঁরা কারুর খেতেনও না, পরতেনও না। তাঁরা ভয় করতে যাবেন কা'কে? তাঁদের মূলধন ছিল সুনিষ্ঠ সেবাপ্রাণ চরিত্র। ঐ চরিত্রই তাঁদিগকে অযাচিত প্রাপ্তির অধীশ্বর ক'রে রাখত। আমার ইচ্ছা করে—তোমরা ঋত্বিক্‌রাও চাকরী-বাকরী, ব্যবসায় বা এখানকার সাহায্যের উপর না দাঁড়িয়ে অমনি চরিত্রের উপর দাঁড়াও! তার ভিতর-দিয়ে তোমাদের যে ক্ষমতা হবে, সেই ক্ষমতার বলে সারা দেশ, সারা জগতের উন্মার্গী চলন প্রতিরোধ করতে পারবে।

প্যারীদা এসে বললেন—জ্বর আস্তে-আস্তে কমে আসছে। মনে হয়, দুপুর পর্য্যন্ত remission (বিরাম) হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন কত?

প্যারীদা—১০০°৬ ডিগ্রি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে যখন দেখিছিলি তখন কত ছিল?

প্যারীদা—দুই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কত আগে?

প্যারীদা—ঘণ্টা দেড়েক আগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব লিখে রাখছিস তো?

প্যারীদা—ছোটমাকে বলিছি। দেবু আছে, কালিদাসীমা আছেন, ঠিকই লেখা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আন্দাজটাকে যদি ঠিক ধ'রে নিয়ে চল, তাহ'লে কোনদিন আর ঠিক-এ পৌঁছোতে পারবা না। ঐ ফাঁক দিয়ে অনেক জিনিস হাতের বাহিরে চ'লে যাবে। যাও, এখনই দেখে আস গিয়ে। আর, যে-কোন রোগীর দায়িত্ব হাতে নাও না কেন, মনে করবে তুমি তার যেমন চিকিৎসক তেমনি তার অভিভাবক। পরিবারের লোকের সহযোগিতা না হ'লে অবশ্য চিকিৎসা করা যায় না। কিন্তু সে সহযোগিতাও lovingly (প্রীতিভরে) আদায় ক'রে নিতে হবে। শ্যেনদৃষ্টি রাখা লাগবে direction (নির্দ্দেশ)-গুলি followed (অনুসৃত) হ'চ্ছে কি-না সেদিকে। আবার, তোমার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হ'য়ে না পড়ে তা-ও দেখতে হবে। স্বাস্থ্য, সদাচার ও শুশ্রূষা-ব্যাপারে family (পরিবার)-গুলিকে educate (শিক্ষিত) ক'রে তোলবার দায়িত্বও ডাক্তারদের।

জ্বরের চার্ট রাখা হ'চ্ছে কিনা প্যারীদা দেখতে গেলেন।

সরোজিনীমা বললেন—আমি অনেক বাড়ী প্রসব করাতে যাই, কিন্তু দেখি, কোন-কোন বাড়ী বড় নোংরা, তাদের আচার-বিচারের ঠিক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেতাল দেখলেই ধরবি, ধ'রে শুধরে দিবি। উঠতে-বসতে না শেখালে কি আর রেহাই আছে? উপদেশ দিচ্ছিস, তুই একটা খুব বড়—এমনতরভাব যেন তোর কথার ভিতর-দিয়ে টের না পায়। কোন্‌টা কেন করা উচিত, কোন্‌টা কেন করা উচিত নয়, সেটা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝিয়ে দিতে হয়। সদভ্যাসটারও গোড়াপত্তন ক'রে দিতে হয় হাতে-কলমে। আবার, মাঝে-মাঝে যেয়ে দেখতে হয়, সেইভাবে চলছে কিনা। চলতে দেখলে তারিফ করতে হয়। তুমি যে খবরদারী করতে যাচ্ছ, তা' যেন বুঝতে না পারে। এই ব'লে যেয়ে হয়তো উঠলে—'তোর ছাওয়ালটারে দেখতে আসলাম। রোজ ভাবি—আসব, আসব, সময়ও পাই না।' ছাওয়াল দেখতে গেলে, ছাওয়ালের খোঁজখবর নিলে মায়েরা খুশি হয়ই। সেই খুশির হাওয়ার মধ্যে প্রয়োজনমত টুকটাক জিনিস ধরিয়ে দিতে হয়। এইভাবে পেছনে লেগে না থাকলে হয় না।

প্রফুল্ল—ডাক্তার, ধাত্রী বা নার্সদের যদি এই কাজ ক'রে বেড়াতে হয়, তাহ'লে তাদের রোজগারই তো বন্ধ হ'য়ে যাবে। এত সময় তারা পাবে কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোজগার বন্ধ হবে না। রোজগার বেড়ে যাবে। মানুষ রোজগার হবে। এই system (পদ্ধতি) হবে both preventive and curative (প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর উভয়ই)। অসুখ হ'লে চিকিৎসা করা যেমন ডাক্তারদের কাজ, অসুখ যা'তে না হয়, তা' দেখাও ডাক্তারদের কাজ। আবার, পরিবেশ বুঝে করণীয় নির্দ্ধারণ করতে হয়। রোগীর বাড়ীর সবাই যেখানে সুশিক্ষিত, দায়িত্বশীল ও সদাচারী, সেখানে ডাক্তারের খাটুনি কিছুটা কমে। আর, সময়ের কথা যে বলছ, ওর অভাব হয় না। যে মা তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, তার পেটে আর একটি ছেলে হ'লে দেখা যাবে, তাকেও সে বেশ সামলে নিচ্ছে। অন্য বাড়ীর একটি মাতৃহীন শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব যদি তার উপর চাপাতে যেতে, তাহ'লে দেখতে, 'সময় নেই, এদের নিয়েই পেরে উঠি না' ইত্যাদি কত অকাট্য অজুহাত দেখাত, কিছুতেই রাজী হ'তো না। পেটের ছেলের বেলায় একটা আপত্তিও তো করে না। তাহ'লে সময় ও সাধ্যের মূল কোথায়? মূল ভালবাসায়। ভালবাসা, যখন যা' প্রয়োজন, তখনই তা' পয়দা ক'রে নিতে পারে। শক্তিসিন্দুকের চাবিকাঠি ওর মধ্যে।

সরোজিনীমা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে কথা বলছেন।

প্রফুল্ল—আপনার মুখে শুনেছি, বৈশ্যেরা কৃষ্টিবিমুখ হওয়ায়, সদ্ব্যাপারে দান বন্ধ করায় বিপ্র, ক্ষত্রিয়েরাও তাদের উন্নত চলন সম্যক্ বজায় রাখতে

পারেননি। কিন্তু বিপ্রদের সম্বন্ধে আপনি তো আজ বললেন, তাঁদের চরিত্রই তাঁদিগকে অযাচিত প্রাপ্তির অধীশ্বর ক'রে রাখত। এই অযাচিত প্রাপ্তি বন্ধ হওয়ার জন্য তাঁরা নিজেরাও কি দায়ী নন? এর দ্বারা কি বোঝা যায় না যে তাঁদের চারিত্রিক দীপ্তি খানিকটা নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠেছিল কালে-কালে। তা' ছাড়া তাঁদের নিষ্ঠা যদি খুব প্রবল থাকত, তাহ'লে তো সব অসুবিধা সত্ত্বেও আদর্শ আঁকড়ে ধ'রে থাকতেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকেই আদর্শ আঁকড়ে ধ'রে ছিলেন বই কি? বিপ্রদের মধ্যে বেশ একটা মোটা অংশ বহুদিন পর্য্যন্ত বিপ্রেতর বর্ণোচিত বা বিপ্রের অনুচিত কর্ম্ম ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করতে স্বীকৃত হননি। তার জন্য তাঁদিগকে বহু দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তবু তাঁরা টলেননি। প্রতিপ্রত্যেকের কাছ থেকে তো সমান আদর্শ-নিষ্ঠা আশা করা যায় না। কালে-কালে অনেকেই জীবিকার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে শাস্ত্রে কিছু-কিছু বিধানও আছে। কিন্তু আপদ্ধর্ম্মটাকে মানুষ যদি স্বধর্ম্ম ক'রে নিয়ে বংশ-পরম্পরায় চলতে থাকে, তাহ'লে সেটা পাতিত্যের কারণ হ'য়ে ওঠে। অনুচিত বিবাহের ভিতর-দিয়ে মানুষের যেমন পাতিত্য আসে, অনুচিত জীবিকা গ্রহণের ভিতর-দিয়েও আবার তেমনি পাতিত্য আসে। কথায় বলে—কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ। যে যেমনতর কর্ম্ম করে, তার বুদ্ধি ও চলনও তার দ্বারা বিভাবিত হয়। তবে এই কর্ম্মজনিত পাতিত্য কিন্তু মানুষের মৌলিক রক্তগত কৌলিন্য ও বীজগত সংস্কারকে বিপর্য্যস্ত করতে পারে না। তাই সেটা শুধরে নিতে দেরী লাগে না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বহু পরিবারেরই রক্তগত ধারা অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু পাতিত্য যা' এসেছে তা' বর্ণোচিত আচরণ না করা এবং বর্ণানুচিত আচরণ করার ভিতর-দিয়ে। তবে এইগুলি যত ঠিক ক'রে নেওয়া যায়, ততই মানুষের জেল্লা বাড়ে। জন্ম ও কর্ম্ম এই দুয়েরই সঙ্গতি ও সংযোগের প্রয়োজন আছে। এতে বংশপরম্পরায় মানুষ স্ববৈশিষ্ট্যে বেড়েই চলে। এক-একটি বর্ণ হ'চ্ছে বিশিষ্ট সংস্কার অর্থাৎ instinct-এর সংস্করণ।

শেষের দিকে বঙ্কিমদা (রায়) আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—যার যে প্রতিভা আছে, তার তা' স্ফুরণের ব্যবস্থা তো করতে হবে। একজন বৈশ্যের যদি বৈশ্যবুদ্ধি থেকে ক্ষাত্রিয়োচিত গুণপনা বেশী থাকে, তাহ'লে তার ক্ষাত্রিয়োচিত কাজ করায় দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষাত্রিয়োচিত কাজ ক'রে দেশের সেবা করায় তার কোন দোষ নেই, কিন্তু সেইটেকে সে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। তাহ'লে তাকে শাস্ত্রানুযায়ী অন্যের বৃত্তি অপহরণ-রূপ পাপে লিপ্ত হ'তে হবে। এইরকম নজীর দেখিয়ে অনেকেই স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ে অন্যের ক্ষেত্রে অনধিকার

প্রবেশ ক'রে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য কতকগুলি অনুশাসন মেনে চলাই লাগে। আমরা যদি এ থেকে মুক্তি চাই, তবে বেকার-সমস্যা, অবাধ ও অন্তহীন প্রতিযোগিতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব ইত্যাদি সমস্যায় আবদ্ধ হ'তে রাজী থাকতে হবে আমাদের। কী যেন একটা কথা আছে, উপায়ং......................!

বঙ্কিমদা—উপায়ং অপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশু মুক্তি পেতে গিয়ে কোন্ বন্ধনে বাঁধা পড়ি, সেটা ভেবে দেখতে হবে। ঋষিরা ভেবেচিন্তেই পথ বেঁধে দিয়ে গেছেন। তাঁদের মূল কাঠামো ঠিক রেখে যুগোপযোগী বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে নিতে হবে। আমার মনে হয়, মানুষের ভিতর যত রকমের সম্ভাব্যতাই থাকুক না কেন, তা' থাকে তার পিতৃপুরুষের ধারাটাকে আশ্রয় ক'রে। তাই নিজ বর্ণোচিত কর্ম্ম বাদ দিলে অন্য কর্ম্মে যে মানুষ খুব চোস্ত হ'তে পারে, তা' আমার মনে হয় না। তুমি তো একসময় মনে করতে—ইট, কাঠ, চুন, সুরকী, বালি, লোহা-লক্কড় এইগুলিই তোমাকে পোষায় ভাল। কিন্তু শিক্ষকতা বা ঋত্বিকতার কাজে তুমি তো কম যাও না। তোমার ঐ বামনাই কাজের উপর দাঁড়িয়ে তুমি সবই তো রাখতে পারো তার সঙ্গে। ওটাকে যদি শুকিয়ে মার, তোমার অন্যগুলিও পুষ্ট হ'য়ে উঠবে না, অকালে ঝ'রে যাবে। মানুষের জীবনে রস জোগায় যে জৈবী-সংস্কারগত কর্ম্ম! সেই রসের জোগান না পেলে মানুষ চলবে কীভাবে? শুধু টাকা-পয়সা বা মানখাতির মানুষকে কত সময় মজিয়ে রাখতে পারে?......... আমি চৌকস হওয়া খুব পছন্দ করি, কিন্তু তা' নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, ভিত্তি যদি ন'ড়ে যায়, তবে মানুষের স্থিতি কোথায়? প্রগতি আছে, স্থিতি নেই—তাকেই তো বলে বিকেন্দ্রিক। কেন্দ্রবিন্দু যদি ঠিক থাকে, তবে পরিধি যতই বাড়ুক না কেন, পথের নিরিখ ঠিক থাকবে। চলাটা উন্মার্গগমন হবে না। আমি তো জ্যামিতি-ট্যামিতি জানি না। আমার মোটাবুদ্ধিতে যা' বুঝি তা' এই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমার দিকে চেয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসছেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—খোকা তোর খুব নেওটা হইছে, তাই না?

সরোজিনীমা—ও আমার নেওটা চিরকালই। তবে আগে কথা শুনত না, এখন শোনে। যদি কখনও অবাধ্য হয়, একটু মুখটুখ ভার করলে আমাকে খুশি করবার জন্য অস্থির হ'য়ে ওঠে। শয়তান কায়দাও জানে এমন, ওর সামনে বেশী সময় গম্ভীর থাকবে কার সাধ্যি?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যবদনে)—ও তাহ'লে তোকে কাবিজ ক'রে ফেলিছে!

সরোজিনীমা (কৃত্রিম ঔদাসীন্যে)—ও পাগলের কথা কন কেন? ওর কি মাথার ঠিক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাওয়াল-পাওয়ালের মাথা অনেক সময় ঠিক থাকে, কিন্তু আমরাই ঠিক থাকতে দিই নে। পারিবারিক চাল-চলন যদি ঠিক না হয়, তবে ছাওয়াল-পাওয়ালের পরকাল ঝরঝরে হ'য়ে যায়। ওদের সামনে মা-বাপের কখনও ঝগড়া করতে নেই। অনেক বাড়ীতে এমন আছে মা-বাপ হয়তো ঝগড়া করে। তারপর ছেলে হয়তো মায়ের পক্ষ নিয়ে, মাকে সহানুভূতি দেখিয়ে বাপকে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয়, মা যদি সেই সময় রুখে না দাঁড়ায়—"উনি আমাকে বকবেন না তো বকবে কে? তোমার এতখানি স্পর্দ্ধা যে আমার সামনে ওঁকে অশ্রদ্ধামূলক কথা বল? এখনই ক্ষমা চাও।"—এমনতর বলে,—তাহ'লে কিন্তু একদিন ঐ ছেলে মাকেও উল্টো গাঁটে গুঁজবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একবার তামুক খাওয়ায়ে দাও। উঠে পড়ি, বেলা অনেক হ'য়ে গেছে।

তামাক খেতে-খেতে উদাসভাবে করুণ কণ্ঠে বললেন—আজ বিজয়ার দিন। আগে এই দিন কত আনন্দের দিন ছিল। আজ আমাকে সবাই প্রণাম করে কিন্তু আমার প্রণম্য যাঁরা, যাঁদের প্রণাম ক'রে আমি কৃতার্থ হব, তাঁরা স'রে গেছেন। তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম করি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে যে ফাঁকা সেই ফাঁকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার নিভৃত-নিবাস থেকে বেরিয়েছেন। মাতৃ-মন্দিরের সামনে কয়েকটা গরু ও ছাগল অলস-মন্থর গতিতে চ'রে বেড়াচ্ছে। পাশ কাটিয়ে যেয়ে মাতৃ-মন্দিরের বারান্দায় বসলেন। আজ বিজয়ার প্রণাম করবেন ব'লে বাইরে থেকে রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), বীরেদা (মুহুরী), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), রমণদা (পাল), সতীশদা (চৌধুরী), সুবোধদা (সেন), সুরেনদা (বিশ্বাস), স্মরজিৎদা (ঘোষ), শরৎদা (কর্ম্মকার), জগৎদা (দীক্ষিত), অভয়দা (সরকার), গৌরদা (ঘোষ), কেষ্টদা (দাস, আলিপুরদুয়ার), কালিপদদা (মৈত্র), গোকুলদা (মন্ডল), বিষ্টুদা (বিশ্বাস), যোগেনদা (ঘোষ), লক্ষ্মীদা (দলুই), পঞ্চুদা (হাজরা), হরেনদা (সাহা), দিগম্বরদা (মন্ডল), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কাশীদা (দাশশর্ম্মা), গুরুদাসদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), জ্ঞানদা (দত্ত), অমূল্যদা (দাস), অজিতদা (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি বহু দাদা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসতেই অনেকে এসে ধীরে-ধীরে প্রণাম ক'রে নীচেয় ব'সে পড়লেন। প্রায় প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের নিজেদের আশেপাশের সংবাদ নিতে লাগলেন।

এইসবের পর অমূল্যদা জিজ্ঞাসা করলেন দীক্ষা নিয়ে করণীয়গুলি করতে যদি ভাল না লাগে, তখন কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যজনে ভিতরটা উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে, যাজনে পারিপার্শ্বিক integrated (সংহত) হয় ইষ্টে, সেই পারিপার্শ্বিক সর্ব্বপ্রকারে সহায়ক হয় জীবন-চলনার। তাই যজন না করলে ভিতরটা থাকে নীরেট হ'য়ে, আর যাজন

না করলে পারিপার্শ্বিক আমাদের বাঁচা-বাড়ার পরিপোষক না হ'য়ে পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে। তাকেই বলে নিয়তি, আমরা তখন তাদের খপ্পরে প'ড়ে যাই, দুর্গতির সীমা থাকে না। তবে, সর্ব্বোপরি দরকার ইষ্টভৃতি। এই তিন pillar (স্তম্ভ)-এর সঙ্গে যদি নিজেকে বেঁধে রাখ, তবে কোন ঝড়ঝাপটা বা বন্যা তোমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। ভগবানের নাম বিধি, কিছু করলে তবে ফল পাবে, না করলে পাবে না, ঝুলে থাকবে। ভাল লাগুক না লাগুক, করতে হয়। অনেক রোগীর মিছরি খেয়েও মিষ্টি লাগে না, তিতো লাগে, খেতে থাকলে আবার ঠিক হয়।

বিকালে পূজনীয় খেপুদা (চক্রবর্ত্তী), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), সুবোধদা (সেন) প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন নিভৃত-নিবাসে। আগামী অষ্টাদশ ঋত্বিক্-অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনা হ'চ্ছে। দুদিন পরে অর্থাৎ ৪ঠা কার্ত্তিক, বুধবার, দ্বাদশী তিথিতে সুরু হবে ঐ অধিবেশন।

খেপুদা বললেন—আমরা তিন দিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। আমাদের তো শুধু যাজন-কাজ চলছে, এখন যদি আমরা নানা জায়গায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি না করি, তাহ'লে তা' আর হ'য়ে উঠবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে লাগলেন—খুব golden time (সুবর্ণ সুযোগ)—এখনই তো আমাদের কাজের খুব golden time (স্বর্ণযুগ) এসেছে। তবে সব-কিছুর practical shape (বাস্তব রূপ) দেবার সময় এখনও আসেনি। Litmus test-এ (নির্দ্ধারণী পরীক্ষায়) আপনারা fail (ফেল) করেছেন। আপনাদের কৃষি-পরিকল্পনার জন্য স্ব-স্ব স্বতঃস্বেচ্ছ সংকল্প ২৫০ জন ৩০০্ টাকা ক'রে যে এখনও দিতে পারল না, তা'তেই বোঝা যাচ্ছে, আপনারা practical move (বাস্তব কাজের প্রবোধনা) দেবার stage-এ (স্তরে) এখনও আসেননি, অতদূর তৈরী হননি। ২৫০ জন লোক ৩০০্ টাকা ক'রে দেবে তাই-ই এখনও হ'ল না। এখনও অনেকখানি মক্স করা বাকী আছে যখন আপনারা practical shape (বাস্তব রূপে) দিতে পারবেন।

লোক এনে অনাবাদী জমি চাষযোগ্য ক'রে ফসল বাড়িয়ে যদি প্রয়োজন-পীড়িতের ক্ষুধা মেটাতেই চান, প্রথম চাই immediately (এখনই) ২৫০ জনের ৩০০্ টাকাটা এই যারা এসেছেন এদের মধ্য হ'তে এখানে ব'সে finish (শেষ) করা, এবং যা'রা ৩০০্ টাকা দিতে পারবে না, তাদের মধ্যে যারা চায় তারা ১৩০্ টাকার সই করতে পারে (৬ বছরে দেয়। জমিক্রয়, গৃহনির্ম্মাণ, প্রতিষ্ঠান গঠন ও পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য)। এমনতর সই অন্ততঃ ১০০০ হ'লে আপনাদের পরিকল্পনা সফল হ'তে পারে। তার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মিদের

সংস্থিতি ও জনসেবার জন্য প্রত্যেক জিলায় অন্ততঃ ৭০০ বিঘা করে জমি সংগ্রহ করুন। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, সর্ব্বসাধারণের সেবার জন্য স্বস্তিসেবক কিন্তু recruit (সংগ্রহ) করাই চাই। অবশ্য, এর সঙ্গেই origination work (সংসৃজন কাজ অর্থাৎ দীক্ষা) tremendously (প্রচন্ড বেগে) increase করতে (বাড়াতে) হবে এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে যা' propaganda (প্রচার) ও যাজন হ'চ্ছে তা' সকল বিষয়েরই করতে হবে।

খেপুদা জিজ্ঞাসা করলেন—স্বস্তিসেবকরা কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের সর্ব্বপ্রকারে disciplined (শৃঙ্খলাবদ্ধ) ক'রে তুলতে হবে। ওরা কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-সম্বন্ধে কাজ করবে।

কেষ্টদা—জিলায়-জিলায় আপনি যে ৭০০ বিঘা জমির কথা বললেন, সেটা কতদিনের ভিতর matercalise (বাস্তবায়িত) করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এত দেরী হ'য়ে গেছে। এখন immediately (তাড়াতাড়ি) না করলেই নয়। প্রত্যেকে এইরকম work ও sacrifice (কাজ ও ত্যাগ স্বীকার) করলে যুদ্ধ ঠেকাতে পারি বা না পারি riot (দাঙ্গাহাঙ্গামা), অরাজকতা প্রভৃতির হাত থেকে মানুষকে হয়তো উদ্ধার ও protect (রক্ষা) করতে পারব আমরা।

যতীনদা—৭০০ বিঘা জমি বিভিন্ন লপ্তে হ'লে চলবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভিন্ন লপ্তেও হ'তে পারে, তবে খুব ছোট-ছোট মেলা টুকরো হওয়া ভাল না। এক প্লটে হ'লেই সবচেয়ে ভাল হয়। ওর মধ্যে ৫০০ বিঘা থাকবে জিলার কাজ এবং কর্ম্মিদের সংস্থিতির জন্য। আর ২০০ বিঘা থাকবে, ঐ জমি যারা চাষ করবে বা অন্যভাবে কাজে লাগাবে, তাদের ভরণপোষণের জন্য।

কেষ্টদা—এই টার্মেই করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

কেষ্টদা—করবে কারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা।

কেষ্টদা—আমার জিলা তত্ত্বাবধায়করা আছেন, অন্য কর্ম্মীরা আছেন। কারা জমি জোগাড় করবেন? এ-সব কাজ ঠিকভাবে না করলে হয়তো অনেক লোকসানের পাল্লায় প'ড়ে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজে নামলে হয়তো কোথাও-কোথাও ওরকম হ'তে পারে। কিন্তু আগে ওরকম ভেবে তো লাভ নেই। যতটা পারেন দেখেশুনে সেলামী ছাড়া এবং লাখেরাজ যদি পান, তবে ভাল হয়। নইলে লাখেরাজের মতোই least (ন্যূনতম) খাজনায় যা'তে ঐ ৭০০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। আর, মানুষ engage (নিযুক্ত) ক'রে ঐ জমি হ'তেই টাকা সৃষ্টি করতে হবে।

সুবোধদা—যশোরে ৩০০।৪০০ বিঘা জমি পাচ্ছি, তা' নিয়ে কীরকম ক'রে সে জমি profitable (লাভজনক) ক'রে তুলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি আগে নেওয়া দরকার, তারপর তাকে profitable (লাভজনক) করার কথা আসবে। মানুষ লাগাতে হবে। কিছুরই অভাব নেই, শুধু ধ্যানধারণা ক'রে বিহিত সমাবেশ ও যোগাযোগ করতে হবে। তাকেই বলে organisation (সংগঠন), আমাদের চরিত্র যত organised (সংগঠিত) হবে, আমরা organisation (সংগঠন)-ও তত ভাল ক'রে করতে পারব।

সুবোধদা—যেমন কান্তিদা একজায়গায় বহু মাহিষ্যক্ষত্রির দীক্ষা দিয়েছেন। সেখানে ৩০০।৪০০ বিঘা জমি পাওয়া যেতে পারে। সে-জমি নিয়ে তাদের বললাম যে তোমরা বর্গা চাষ কর। আবার, আর দুইজনকে রেখে দিলাম ঐ জমি দেখাশোনা করার জন্য। তাদেরও ২৫।৩০ বিঘা জমি দিয়ে দিলাম ভরণ-পোষণের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে হাসতে-হাসতে বললেন—হ্যাঁ! ঠিক অমনতর করেই তো করতে হবে। মাথায় বলে খেলে না?

সবাই হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর একটা কাজ করতে হবে, প্রতিষ্ঠানাদির জন্য বাড়ীঘর যদি করতে হয়, তাহ'লে ইট, কাঠ, লোহা, সিমেন্ট, কয়লা ইত্যাদির জোগাড় করতে হবে। ঐ সব area (এলাকা)-য় এখন থেকেই লোক পাঠাতে হয়। তারা লোহা, কয়লা বা সিমেন্টকে মুখ্য ক'রে যাবে না, যাবে কৃষ্টিবার্ত্তা নিয়ে মানুষের কল্যাণলিপ্সু হ'য়ে। মানুষের ভাল ক'রে তাকে ভালবেসে যদি আপন ক'রে নেওয়া যায়, তখন তার হাতের মধ্যে যা', তা' আর অপ্রাপ্য থাকে না। প্রতিবৎসর ২০।২৫ লাখ ইট যা'তে কাটা যায়, এত কয়লা দরকার হবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত ইট বিক্রী ক'রে আবার construction-এর (বাড়ী-ঘর তৈরীর) অন্যান্য খরচ যথাসম্ভব জোগান দিতে হবে। একে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা। এইভাবে economic adjustment (অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য) ক'রে চলতে পারলে কিছুতেই আটকাবে না। কয়েকটা দল এই কাজ নিয়ে থাকবে।

কেষ্টদা আপনি ৬টা touring batch (ভ্রাম্যমাণ দল) ঠিক করতে বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ৬টা যদি হয়, তবে ৪টে অন্যত্র কাজ চালাতে লাগল, আর দুটো শিক্ষক ও ছাত্রমহলে concentrate (মনোনিবেশ) করলো। ছাত্রসমাজ যদি ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়ায় তাহ'লেই তো ভবিষ্যৎ ভারতের সমস্যা অনেকখানি মিটে যায়।

শরৎদা অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ চারান সম্বন্ধে আমরা কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে সৎসঙ্গী পরিবারগুলিতে সবর্ণ বিয়ে যা'তে ঠিক মতো হয়, তার ব্যবস্থা করুন। অবিহিত একটা বিয়েও যেন আর না হ'তে পারে আপনাদের আওতায়। আর,. অনুলোমের idea (ধারণা) ছিটিয়ে দিতে থাকুন, ground (ক্ষেত্র) prepared (প্রস্তুত) হো'ক, individually (ব্যক্তিগতভাবে) কেউ করতে চায়, বিধিমাফিক করুক।

খেপুদা—Local Satsang branch (স্থানীয় সৎসঙ্গ শাখা)-গুলি কীভাবে তৈরী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে পর্য্যন্ত জমি ক'রে পাকাপাকি branch (শাখা) না হয়, সে পর্য্যন্ত congregation centres (অধিবেশন-কেন্দ্র) রাখতে হয়। Roaming centres (ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র) যেমন বাড়ীতে-বাড়ীতে চলে, তাও চলতে পারে। আমার কখনও ইচ্ছা ছিল না, এখনও নাই যে ঐ রকম temporary branches (অস্থায়ী শাখা) হয়।

শরৎদা—জেলায়-জেলায় ৭০০ বিঘা ক'রে জমি হ'লে স্থায়ী শাখা হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!..................(সবার দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে তীব্র আগ্রহাতিশয্যে বললেন)—প্রত্যেকটা মানুষকে আগুন ক'রে ছেড়ে দেওয়া চাই।

অন্যান্য টুকটাক কথার পর সবাই উঠে পড়লেন। সন্ধ্যার পর আশ্রমের সামনের দিকে লোক আর ধরে না। আবালবৃদ্ধবনিতা অগণিত নরনারী সমবেত হয়েছেন প্রাণের ঠাকুরকে বৎসরের এই শুভ দিনটিতে অর্ঘ্যাঞ্জলি-সহ প্রণাম করবেন ব'লে। বাঁধের দক্ষিণ-পূব ও দক্ষিণ-পশ্চিম এই দুই কোণে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে লোহার থামে। আলোয় ঝলমল করছে সারাটা জায়গা। মুখর হ'য়ে উঠেছে শান্ত আশ্রমভূমি। সকলের চোখেই আনন্দের বিজলীদীপ্তি, মুখে তাদের প্রীতির পেলবতা, উদ্বেলিত প্রাণোচ্ছ্বাসের লীলায়িত তরঙ্গমালা। বিসর্জ্জন হ'য়ে গেছে খবর পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃ-মন্দিরে গিয়ে বিহ্বল আবেগে আভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম নিবেদন করলেন—হুজুর মহারাজ, স্বীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর প্রতিকৃতির সমক্ষে। তারপর এসে মাতৃমন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দায় বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা, খেপুদা, বাদলদা, বড়দা, ছোড়দা, সুধাংশুদা, পিসিমা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-পরিবারের অন্যান্য মায়েরা ও ছেলেমেয়েরা পর-পর এসে প্রণাম ক'রে গেলেন। উপস্থিত জনতা দলে-দলে পর-পর এসে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে যেতে লাগলেন।

তারপর নিজেদের পরস্পরের মধ্যে প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি সুরু হ'লো।

কিশোরীদা (দাস) একটা ধামায় ক'রে মুড়ি, মুড়কি, খই, বাতাসা ইত্যাদি নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে বাইরে গিয়ে বণ্টন করতে লাগলেন। ছেলের

দলের সে কি হুটোপুটি! কিশোরীদাও লম্বা দাড়ি দুলিয়ে হাস্যমুখে ওদের দৌরাত্ম্য সহ্য ক'রে প্রসাদ-বিতরণ ক'রে চললেন।

৪ঠা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৪৯ (ইং ২১।১০।৪২)

আজ থেকে অষ্টাদশ ঋত্বিক্-অধিবেশন সুরু হ'লো। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে অগণিত কর্ম্মী ও সৎসঙ্গী এসেছেন, বিহার এবং আসাম থেকেও কিছু-কিছু এসেছেন। নানাস্থানের গুরুভাইদের পরস্পরের শ্রীশ্রীঠাকুর-সমীপে আশ্রমের পুণ্যভূমিতে বিজয়ার পর এই প্রথম দর্শন, তাই একটা আনন্দ-উদ্দাম প্রীতি-বিনিময়ের পর্ব্ব চলেছে সারা আশ্রম জুড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় তক্তপোষে ব'সে আছেন। কাজল ভাইয়ের ডিপথিরিয়ার জন্য মনটা বিষণ্ণ। তাঁর নিজের শরীরও ভাল নয়! তবু লোকজন দেখে যেন অনেকখানি ভাল বোধ করছেন। দলে-দলে দাদা ও মায়েরা এসে প্রণাম করছেন। অনেকেই ফলমূল, তরিতরকারী, মিষ্টি, কাপড় ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সেগুলি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে ডেকে-ডেকে খোঁজখবর নিচ্ছেন। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কাছে স্থানীয় অন্যান্যদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন—'অমুক আসেনি? সে কখন আসবে? অমুক কেমন আছে?' ইত্যাদি। প্রত্যেকে যথা প্রয়োজন জবাব দিচ্ছেন।

যশোহরের একটি দাদা একটা বিরাট মিঠে কুমড়ো নিয়ে এসেছেন মাথায় ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেই ব'লে উঠলেন—এ দেখি exhibition-এ (প্রদর্শনীতে) দেওয়ার মতো জিনিস। এ পেলি কোথায়?

উক্ত দাদা—আমার বাড়ীতেই হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় সুন্দর তো! কী রকম ক'রে এত বড় করলি?

উক্ত দাদা—তেমন কিছু তো করিনি। আপনার দয়ায় হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া তো বিধিকে বাদ দিয়ে নয়। তাই কোন্ রকমের মধ্য-দিয়ে কী হয় সে-সম্বন্ধে পাকা বুঝ থাকলে পরে আবার সেইরকম ক'রে তদনুপাতিক ফল পাবার আশা করা যায়। এইভাবেই পরমপিতার দয়া ধ'রে রাখা যায়।..............আচ্ছা যা! তোর মাথা খালাস ক'রে আয়। মাথায় বোঝা নিয়ে কথা কওয়া যায় না।

দাদাটি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে কুমড়ো দিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ঘাম ঘেঁষে মাটিতে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুখটা মুছে ফ্যাল্। ঘেমে গিছিস একেবারে।

দাদাটি কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখ মুছে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাড়ীতে খুব ভীড় হয়েছিল নাকি?

উক্ত দাদা—ভীড় এমনি যে খুব বেশী ছিল তা' নয়। রাণাঘাটে যশোহর, খুলনা, বরিশাল এই তিন জেলার আমরাই তো প্রায় চার শ' লোক। সবাই এক গাড়ীতে উঠতে পারেনি। কিছু লোক প'ড়ে আছে। গাড়ীতে আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। খুব ঠাসাঠাসি, চাপাচাপির মধ্যে আসলেও slogan (আহ্বান-ধ্বনি) দিতে-দিতে স্ফূর্ত্তি ক'রে এসেছি। অন্যলোক যারা ছিল গাড়ীতে, তারা কেবল আমাদের মুখের দিকে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্দ্দিনে মানুষকে তো প্রাণখুলে আনন্দ করতে দেখে না, তাই কোথাও তা' দেখলে সাধারণতঃ ভাল লাগে। তবে দলবদ্ধভাবে আনন্দ করতে গেলেও দেখা লাগে যা'তে কারও মনে বা অহঙ্কারে আঘাত না লাগে। অকারণ ঈর্ষ্যা, আক্রোশ ও পরশ্রীকাতরতা অনেকের মজ্জাগত। একজন ভাল আছে দেখলেই তাদের মন টাটায়। তাকে দুরবস্থায় না ফেলতে পারলে সোয়াস্তি পায় না। এইরকম লোক সর্ব্বত্রই আছে। তাই যাই করি, যেখানেই যাই, মানুষের সঙ্গে বিনয়-ব্যবহার নিয়ে চলা ভাল। তা'তে মানুষ খুশি থাকে, ভাবে, লোকটা যত বড়ই হো'ক, আমাকে ছাপিয়ে যায়নি, আমার কাছে খাটো আছে।

বিজয়দা (বসু)—এত ভেবে চলতে গেলে তো পা-ই বাড়ান যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পা যেমন বাড়াবা, সঙ্গে-সঙ্গে তেমনি ভাববা। শুধু পা-ই যদি চালাও, আর চোখ যদি বুজে থাক, তা'তে যেমন ধাক্কা খাবা, তেমনি সহজ আবেগে কেবল স্ফূর্ত্তিই যদি কর, অথচ পরিবেশের উপর তার কী প্রতিক্রিয়া হ'চ্ছে, তা' লক্ষ্য ক'রে নিজেকে যদি নিয়ন্ত্রিত না কর, তাহ'লেও তেমনি ধাক্কা খাবা। আর, সে-ধাক্কা হয়তো এমন অতর্কিত ও অনাহূত হ'তে পারে যে তুমি তা' সামালই দিতে পারবে না। এটা সবসময় যে নগদানগদি আসে, তা' কিন্তু নয়। সেইজন্য পরিবেশের দিকে সবসময়ই নজর রাখা লাগে। সম্বিৎসু সেবার মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে। সবাই তোমার সেবাসাহায্য পাবার জন্য হাঁ ক'রে ব'সে নেই। অনেকের দম্ভ আছে—oblige (বাধিত) করবে, কিন্তু obligation-এ (বাধ্যবাধকতায়) যাবে না। তার মানে, সে তোমাকে oblige (বাধিত) ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চায়। সে-ক্ষেত্রে তাকে সেই সুযোগ দেওয়াই তাকে service (সেবা) দেওয়া। আর, এইসব কথা খুব হেঁকে-ডেকে লোকের কাছে বলতে হয়—'বোসমশায় আমার বাড়ীর কাজের সময় তিনটে সামিয়ানা দিয়ে যা' উপকার করেছিলেন, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। ওটা না পেলে আমার খুবই অসুবিধা হ'তো।' এই কথা বোসমশায়ের কানে যায়ই এবং তিনি তা'তে খুশি হন। তোমাকে জব্দ করার প্রবৃত্তি যদি কোন দিন থেকে থাকে, এতে তা' নিরস্ত হয়। মানুষ নিয়ে চলাতে অনেক হিসাব

ক'রে চলতে হয়, শুধু শুকনো যুক্তিসম্মত চলনই যথেষ্ট নয়। মানুষের ভিতর এলোমেলোও ঢের আছে, কোথায় কেন তা' কী রূপ নিতে পারে, আঁচ ক'রে সাবধান হ'য়ে চলা লাগে। সেইজন্য কুশলকৌশলী চলনটা আয়ত্ত ক'রে নিতে হয়।

সুবোধদা (সেন)—সেটা আয়ত্ত করা যায় কীভাবে? পরিবেশের ভিতর তো কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক থাকে। এত সব দিক ভেবে হিসাব ক'রে চলতে গেলে তো চলার মধ্যে কৃত্রিমতা ঢুকে পড়ে। ঐভাবে চলতে-চলতে মানুষ তো নিজের আদর্শ থেকে দূরে স'রে যেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভবসমুদ্রের compass (দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্র) হ'লো ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা! ঐ কাঁটা ঠিক থাকলে মানুষ বিপথে যায় না, পরিবেশও ঠিক থাকে। কুশলকৌশলী চলন মানে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামুখর চলন। তা'তে মানুষ একঘেয়ে হয় না, যেখানে ও যখন যেমন শোভন, তাই-ই করে—মূল ঠিক রেখে। তার বুদ্ধি থাকে বিপত্তি এড়িয়ে নিজের ও অপরের মঙ্গল সাধন। আর, এই চলনার মধ্যে egoistic rigidity (অহঙ্কৃত অনমনীয়তা) থাকে কমই। সে কঠোরও হ'তে পারে, কোমলও হ'তে পারে—যেখানে যেমন প্রয়োজন। আর, সবটার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে, ইষ্টপুরুষ যিনি, মূর্ত্ত মঙ্গলবিগ্রহ যিনি তাঁর প্রীতি, তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর পোষণা। তাই তার কোন টেঁক থাকে না, সে হয় সহজ, সরল অথচ মহাবুদ্ধিমান। কৃত্রিমতা ঢোকা তো দূরের কথা, তার গতিভঙ্গিমা হয় অবাধ, উন্মুক্ত, সাবলীল। এককথায় তার personality (ব্যক্তিত্ব) হয় charming (মনোমুগ্ধকর)। তার চাল-চলন দেখে মনে হয়, ছবি তুলে রাখি, কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয়, gramophone record (গ্রামোফোন রেকর্ড) ক'রে রাখি। Art (শিল্প) ও science (বিজ্ঞান) দুই-ই blend করে (মিশে যায়) তার character-এ (চরিত্রে)। তার মূল মঙ্গলপ্রেরণার মধ্যে যদি কোন গলদ বা খাদ না থাকে, তাহ'লে কৃত্রিমতা ঢোকার অবসর কোথায়?

সুবোধদা—যারা মানুষের ভাল করে, তাদেরই তো বিপদ বেশী। খারাপ যারা করে, তাদের খারাপ করতে মানুষ ভয় পায়। ভাল মানুষদের ক্ষতি করতে তো মানুষ ভয় পায় না, জানে, তারা উল্টে ক্ষতি করবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—তুমি যা' বলছ কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তাই মিনমিনে ভালমানুষ হ'লে চলবে না। ভালমানুষ হ'তে গেলে কল্যাণ-বুদ্ধির দ্বারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে শক্তিমান হ'তে হবে, সুকৌশলী হ'তে হবে, দক্ষ ও যোগ্য হ'তে হবে, পরাক্রমী হ'তে হবে, যা'তে বিরুদ্ধ শক্তির কাছে পরাভূত না হ'তে হয়। আর, ঐ জন্যই তো আমি বলি হিসাব ক'রে চলার কথা। জগৎটা জটিল, এর পাকে-পাকে চোরাগোপ্তা অনেক বিপদের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে! সেগুলি এড়িয়ে চলা, নিয়ন্ত্রণ করা ও প্রতিরোধ করার মতো বল, বুদ্ধি

ও কৌশল যদি না থাকে, প্রস্তুতি যদি না থাকে, তাহ'লে আমরা যে তাদের শিকার হ'য়ে পড়ব, তা'তে কি আর কোন সন্দেহ আছে? আর, সবসময় এটা তুমি একক করতে পার না। Evil forces (অসৎশক্তি) organized (সঙ্ঘবদ্ধ) হ'য়ে আছে জগতে। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দ্দারের মতো তুমি একক যদি লড়তে যাও তার বিরুদ্ধে, তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতির ভিতর-দিয়ে ইষ্টার্থী জনবল, ধনবল ও সৎ-সংহতি গ'ড়ে তুলতে হবে। সৎকে যেমন পোষণ দিতে হবে, অসৎকে তেমনি নিরোধ করতে হবে। আমি যে স্বস্তিসেবক সংগ্রহের কথা বলছি, তা' কিন্তু করাই চাই। তারা হবে crusaders for কৃষ্টি (কৃষ্টি-সংরক্ষণার্থে ধর্ম্মযোদ্ধা)। মানুষের ভাল করতে গেলে তার একটা রীতি আছে, সেই রীতি-অনুযায়ী যদি না চলা যায়, তবে হিতে বিপরীত হয়, ভাল করাটাই মন্দের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।......................আবার অন্যকে শাসন ও সংশোধন করবার আগে নিজেকে শাসন ও সংশোধন করতে হয়। আত্মশাসন ও আত্মসংশোধনের অভিজ্ঞতা যদি না থাকে, তবে অন্যকে শাসন ও সংশোধন করবার knack (কৌশল) হাতে আসে না। তা'ছাড়া, তুমি যত বড়ই ধুরন্ধর হও, যত বড়ই শক্তিমান হও, নিজে আচরণ না ক'রে যদি উপদেশবাক্য ছড়িয়ে বেড়াও, মানুষ তোমার সামনে কিছু না বললেও পরোক্ষে কিন্তু সমালোচনা করতে ছাড়বে না—'সুবোধদা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু নিজে কীভাবে চলেন, উপদেশ দেবার সময় সে-কথা আর মনে থাকে না।' এই ধর, যশোরে কাজকর্ম্ম যেটুকু হয়েছে, তুমি যদি নিজে মাজায় কাপড় বেঁধে না দাঁড়াতে, তাহ'লে এটুকু হওয়া কঠিন ছিল। অবশ্য যা' হওয়া উচিত ছিল, তার অনেকখানি হয়নি, কিন্তু যা' করেছ, সে কম ব্যাপার না। তোমার বাড়ী তো শুনি এক আনন্দবাজার, দীয়তাং ভুজ্যতাং লেগেই আছে। আর আড্ডা, যাজন, আলাপ-আলোচনার বিরাম নেই। এইভাবে যদি খোলা জন্নালায়ে না রাখতে, তাহ'লে শুধু কথায় চিড়ে ভিজতো না। তুমি এতখানি কর, নিজে নীতি-মাফিক চলতে চেষ্টা কর, তাই কোন কর্ম্মীকে অন্যায়ের জন্য শাসন করলে, তারাও তা' মাথা পেতে নেয়।

যশোহরের কুমড়োওয়ালা দাদাটি বললেন—আপনি পরমপিতার দয়া ধ'রে রাখার কথা কী যেন বলছিলেন, আমি কথাটা বুঝতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো ঠিক খেয়াল নেই। (আশুভাইয়ের দিকে চেয়ে) —কী বলছিলাম রে?

আশুভাই (ভট্টাচার্য্য) আমারও কথাটা ঠিক মনে নেই। তবে আপনি ঐ দাদার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কুমড়োটা অতো বড় হ'লো কী ক'রে? তা'তে উনি বলেছিলেন—পরমপিতার দয়ায়। সেই কথার পৃষ্ঠে ঐ কথাটা

বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ঘাড় নেড়ে)—ও! হ্যাঁ! আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল, পরমপিতার দয়ায় কোন্ বিধি অনুসরণ ক'রে কী হয়, সে-সম্বন্ধে যদি আমাদের একটা বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান থাকে, তাহ'লে ঐ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমরা লাভবান হ'তে পারি। পৃথিবীতে accidentally (আকস্মিকভাবে) কিছু হয় ব'লে আমার মনে হয় না। যা' ঘটে তা' কার্য্যকারণ সম্পর্কেই ঘটে। আমার ধারণা, তোমার কুমড়োটা যে অতো বড় হয়েছে তার পিছনে উপযুক্ত কারণ আছে। বীজ, মাটি, সার, জল, আলো-হাওয়া, পরিবেশ সবটার সুষ্ঠু মিলনের ফলে এমনটা হ'তে পেরেছে। এই প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সবখানি যদি তোমার বোধে জাগ্রত থাকে, তাহ'লে ভবিষ্যতে তুমি হয়তো এইরকম বড় কুমড়ো আরো অনেক ফলাতে পারবে, এবং অন্যকেও হয়তো সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।..............আচ্ছা! ঐ গাছে কতগুলি কুমড়ো হয়েছিল?

উক্ত দাদা—সঠিক সংখ্যা বলতে পারবো না। তা' নিতান্ত কম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবগুলো কুমড়োই কি বড়-বড় হইছিল?

উক্ত দাদা—এইটেই সব থেকে বড়। তবে অন্য কুমড়োগুলিও সাধারণ কুমড়োর থেকে বেশ বড়ই হ'য়েছিল। যে ক'টা কুমড়ো পাকান হয়েছে, তার প্রত্যেকটি কুমড়ো এত বড় হয়েছে যে সবগুলিই পাটের শিকেয় বেঁধে মাচায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছে। মাচা ভেঙ্গে যাবে ভয়ে, মাচায় নূতন বাঁশ, খুঁটি লাগাতে হয়েছে। এই কুমড়োটা সম্বন্ধে আমার খুব ভয় ছিল যে ছিঁড়ে প'ড়ে না যায়। রোজ পরমপিতাকে ডাকতাম যেন কুমড়োটা পাকায়ে নিজ হাতে আপনাকে এনে দিতে পারি। বাড়ীতে যেমন অসুখ-বিসুখ, এই কুমড়ো নিয়ে আসার সংকল্প না থাকলে আমার হয়তো আসা হ'তো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (খুশি হ'য়ে)—তা' ভালই করিছিস। তুই পরমপিতার চিন্তা করিতিছিস, আর বাড়ীতে সবাই তোর ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে পরমপিতার কথা চিন্তা করতিছে, এতে অনেকখানি ভাল হ'য়ে যাবি। চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা ঠিকমত ক'রে আইছিস তো?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ। ম্যালেরিয়া জ্বর, এলোপ্যাথিক ডাক্তার দেখছে। ডাক্তারের বেশ হাতযশ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ঠিক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে দাদাটি আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন—আর আমার ভাবনার কিছু নেই।—এই ব'লে প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এমন সময় বললেন—এই, শোন্।

দাদাটি বললেন—আমাকে কিছু বলছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। এবার যেমন ক'রে করিছিস, সামনের বার ঠিক অমনি

ক'রে ঐ কুমড়োর বীচি দিয়ে কুমড়ো ক'রে দেখিস তো কেমন হয়। আর আমাকে জানাস, আমি হয়তো জিজ্ঞাসা করতি ভুলে যাব।

উক্ত দাদা—কুমড়ো যদি লাগাই, আর যদি কি, আপনি যখন বলেছেন লাগাবই, আর সব চেয়ে বড় যেটা হয়, সেটা আপনার জন্য নিয়ে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলি তো ভালই হয়। কেউ নিজ হাতে কিছু অর্জ্জায়ে নিয়ে আসিছে দেখলি আমার খুব ভাল লাগে।

ইতিমধ্যে মন্মথদা (দে), বিশ্বেশ্বরদা (দাস), জনার্দ্দনদা (বসু), প্রিয়নাথদা (বসু), বিপিনদা (সেন), প্রমথদা (গঙ্গোপাধ্যায়), ক্ষেত্রদা (শিকদার), ব্রজেনদা (দাস), ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী), ফণীদা (মুখোপাধ্যায়), সুধীরদা (গঙ্গোপাধ্যায়), পরেশদা (দত্তগুপ্ত), সত্যেনদা (মিত্র), খগেন ভাই (মালাকার), কিরণদা (ঘোষ), ননীদা (দে), শশাঙ্কদা (দে), মণীন্দ্র ভাই (কর), জগৎদা (দীক্ষিত), মতিদা (চট্টোপাধ্যায়), ইন্দুদা (দাশগুপ্ত), রমণীদা (দত্তগুপ্ত), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), শচীনদা (চক্রবর্ত্তী), কালীমোহনদা (বসু), প্রভাতদা (দে), সুরেনদা (পাল), সুরেনদা (সেন), ত্রৈলোক্যদা (হালদার), অন্নদাদা (হালদার), বিধুদা (রায়চৌধুরী), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কাশীশ্বরদা (দাশগুপ্ত), প্রিয়নাথদা (সেনশর্ম্মা), সুবোধ ভাই (সেনশর্ম্মা), কুঞ্জদা (দাস), অনাথদা (সরকার), গৌরদা (দাস—সিঁথির), ধীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), শীতলদা (পাঁচাল), সন্তোষদা (সেনাপতি), সত্যদা (দত্ত), যতীনদা (নাথ), অমূল্যদা (দাস), গোকুলদা (নন্দী), সুরেনদা (মোদক), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), মদনদা (দাস), যুগলদা (রায়), হরিচরণদা (গঙ্গোপাধ্যায়), শ্রীচরণদা (বসাক), গিরীনদা (গোস্বামী), পশুপতিদা (দত্ত), যতীনদা (মুখোপাধ্যায়), বদ্রীবিশালদা (শ্রীবাস্তব), চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়), নরেনদা (মিত্র), গুরুদাসদা (সিংহ) প্রভৃতি বহু স্থানের বহু দাদা এসে হাজির হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাউকে মাথা নেড়ে, কাউকে চোখের ইশারায়, কারও প্রতি ঈষৎ হেসে, কাউকে উল্লাসভরে ডেকে কথা ক'য়ে অর্থাৎ একভাবে-না-একভাবে প্রত্যেককেই অন্তরঙ্গ মধুর আপ্যায়নায় তৃপ্ত ও ফুল্ল ক'রে তুলছেন। প্রত্যেকেই খুশি, প্রত্যেকেই ভরপুর। আর কিছু না, শ্রীশ্রীঠাকুরের মমতাময় স্নেহদৃষ্টির প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেয়ে দরদ-কাঙাল প্রাণ মানুষের রাজৈশ্বর্য্যে, রাজগৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ভালবাসার যাদুতে বনের পশু বশ হয় আর এই অগাধ, অপ্রমেয়, অপার্থিব প্রেমের প্রভাবে সৎ-সন্ধানী মানুষের দল মুগ্ধ হবে না? বদ্ধ হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার তাকিয়াটায় হেলান দিয়ে খুব আরাম ক'রে বসেছেন। বসার কি অপরূপ ভঙ্গিমা! যেন নন্দদুলালটি ব'সে আছেন। দেখলে বড় আদর করতে লোভ যায়। এত বড় একজন, তা আর মনে হয় না। মনে হয়—

'আমাদের ঘরের মানুষ, মনের মানুষ, সাত রাজার ধন এক মাণিক আমাদের। সেবাযত্নে সুস্থ রাখতে হবে, সুখী করতে হবে এঁকে। নইলে অন্যায় হবে, অবিচার করা হবে।'

শরতের সূর্য্য তার সোনার কিরণ বিছিয়ে দিয়েছে আশ্রমের বুকে, দিগন্তের বালুচর ঝিকমিক করছে, অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে, শিশিরস্নাত বকুল ও বাবলার সিক্ত দেহ বিশুষ্ক হ'য়ে উঠেছে তরুণতপনের অনলস পরিচর্য্যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলেন-আপনার আস্তানা ঠিক করিছেন তো?

মন্মথদা—আমার আস্তানা তো ঠিকই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইবার তা'হলি মাথায় এক পাগড়ী বাঁধে, হাতে এক লাঠি নিয়ে সব ঘুরে-ফিরে দেখেন। আর খ্যাপা, কেষ্টদা ওদের কাছে সব শুনে-টুনে নেন, এই conference-এ (অধিবেশনে) কী-কী করা লাগবি। আগে থাকতে ওয়াকিবহাল না হ'লি অসুবিধা হবেনে। এখনই যেয়ে শুনে নেন গা। যাক, ঐ শরৎদা আসতিছে। শরৎদার ও-সব জানা আছে। শরৎদার কাছে শুনলিও চলবি। ও শরৎদা!

শরৎদা—আজ্ঞে, বলেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুবোধ তো আপনাদের সঙ্গে ছিল, সে না হয় সব জানে। মন্মথদা, বিপিনদা, যোগেনদা, বিরাজদা—এদের সব কইছেন?

শরৎদা—এখনও সুযোগ পাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো আপনাদের ঢিলে কথা! আগে সাজগোজ ক'রে মানুষ যাত্রায় পাঠ করতি নামে, না, যাত্রা শেষ হলি সাজগোজ করে?.................যান, এখুনি কথা ক'য়ে নেন। (ঈষৎ হেসে)—আপনারা অমন ঢিমে-তেতালা ক্যান্?

....

'এক লহমা সময় আছে সর্ব্বনাশের মাঝে তোর।
ভোগসায়রে ডুব দিয়ে কর্ একটি নিমেষ নেশায় ভোর॥'

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণোন্মাদী কথায় সকলেই পুলকিত হ'য়ে উঠলেন।

শরৎদা সলজ্জভাবে মন্মথদাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন-মাষ্টারমশায়, হীরালাল, অনিল, তারক এদেরও কবেন। এক কথায়, আগে থাকতে যাকে-যাকে কওয়া সমীচীন, সবাইকে কবেন।

শরৎদা-আজ্ঞে হ্যাঁ।

এমন সময় প্যারীদা (নন্দী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর-কাঙাল কেমন রে?

প্যারীদা Improvement (উন্নতি)-টা steady (স্থায়ী) হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল ক'রে watch করিস (লক্ষ্য রাখিস)।

প্যারীদা—তা' করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো দেখতেও পাচ্ছি। রোগ তো আর কেড়ে ফেলা যায় না, কিছুটা সময় নেবেই। তবে কোন বিপদের ভয় নেই তো?

প্যারীদা—না! তা' কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে বড় খারাপ ডাকে। ছাওয়াল-পাওয়ালগুলোর একটারও শরীর ভাল না। বড়খোকার gland (গ্ল্যান্ড), মণির পেটখারাপ, সাধনা দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, ভাল থাকে কমই। সানুটা পরমপিতার দয়ায় এখনও সুস্থ আছে যা'হোক, কিন্তু শরীর শক্ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তামাক খেয়ে প্রস্রাব করতে গেলেন। বাঁধের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রস্রাবের জায়গা। তার পাশেই কাজলের ঘর। প্রস্রাব করবার পর একবার কাজলের ঘরে গেলেন। পূজনীয়া ছোটমা মিনতি-ভরা করুণ চাউনিতে একবার চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুর সে-চাউনি দেখে যেন ব্যথিত-বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। চোখদুটো ছলছল ক'রে উঠলো। পরমুহূর্তেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন।

ওখান থেকে সোজা চ'লে আসলেন খেপুদার বারান্দায়। আবার প্রচন্ড লোকের ভীড়। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু নিরিবিলি থাকতে চান বুঝে ভীড় কিছুটা দূরে সরিয়ে দেওয়া হ'লো। তা'ও সহস্র চক্ষু নিবদ্ধ তাঁর উপর। সেও কি কম অস্বস্তি!

কাজলের ঘর থেকে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানা ভার দেখে খেপুদা সান্ত্বনার সুরে বললেন—দাদা! তুমি ভেবো না, আমি মাষ্টারমশাইয়ের কাছে ভাল ক'রে শুনেছি ভয়ের কোন কারণ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপচাপ ব'সে রইলেন। কোন কথা বললেন না। তামাক সেজে দেওয়া হ'লো। শূন্যদৃষ্টি মেলে চুপচাপ তামাক খেতে লাগলেন। তামাক খাওয়ার পর গামছা দিয়ে মুখ মুছে একটু সুপুরি চেয়ে নিলেন।

প্রাতঃকালীন অধিবেশন সমাপ্ত হবার পর কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন খেয়েদেয়ে এসে বসেছেন মাতৃ-মন্দিরের নীচের ঘরটিতে। দাদাদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন হ'লো মিটিং?

সুরেনদা (শূর) বললেন বাবা! কিশোরীদা ও কেষ্টদা এমন সুন্দর কইছেন, তা' আর কওনের না। উভয়ের বলা যারপর-নাই হৃদয়গ্রাহী হইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা না হয় বিদ্বান, পন্ডিত মানুষ, শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিছে, কিন্তু কিশোরী অমন ক'রে কয় কী করে? তাই কয়—"মূকং করোতি

বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ।”
(দাদাদের দিকে চেয়ে)—তোমরা খাইছ?

অনেকে একযোগে—না, এখনও খাওয়া হয়নি। খাব এখনি গিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, খেহেদেয়ে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নাওগে। অনেকে গাড়ীতে তো ঘুমাতে পারনি। আবার তো বিকালে মিটিং-টিটিং আছে।

দাদারা বললেন—এই যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট মাসীমার দিকে চেয়ে বললেন—কাজলার অসুখ হওয়ায় মনটা আমার এত খারাপ যে, এরা সব আইছে, এদের সঙ্গে যে একটু প্রাণ খুলে স্ফূর্ত্তি করব, তা' আর পারছি না।

ছোট মাসিমা—তা' তো হবারই কথা। আমি তো দেখি, তোমার কষ্ট আমাদের থেকে অনেক বেশী। আমরা শুধু সংসারের লোকক'টিকে ভালবাসি, তাই উদ্বেগে অস্থির হ'য়ে যাই। আর, তোমার যে আমাদের সবার জন্য ভাবনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা যা' কইছ খুব ঠিক। আমার ভাগ্যিটা বোধ হয় ভাল না। একটু ভাল খবরের জন্য হা-পিত্তেস ক'রে থাকি। কা'রও ভাল শুনলে কত ভাল লাগে, কিন্তু তা' কি আর হবার জো আছে? ভাল খবর আমাকে আবার মানুষ জানায়ও না। এখানে এত লোক আছে, গ্রামের লোকজন আছে, বাইরে থেকে লোকজন আসে, চিঠিপত্র আসে, টেলিগ্রাম আসে—এর ভিতর-দিয়ে যত খবর আসে তার বেশীর ভাগই উদ্বেগজনক। তাই, ভাল কাজকর্ম্মের খবর শুনতে ইচ্ছা করে। ওতে যেন অনেকখানি প্রাণ পাই। কিন্তু এবার আর গল্প শোনার মতোও মন নাই।

দাদাদের মধ্যে অনেকে চলে গিয়েছেন, কয়েকজন আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুমের সময় আসন্ন বুঝে তাঁরাও উঠে পড়লেন। অতিথিশালায় যাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে গেলেন। একজনের কাছ থেকে আর পাঁচ জন আবার তা' গ্রহণ করতে লাগলেন।

আনন্দবাজারে এখন খাওয়া-দাওয়া হ'চ্ছে। আশ্রমের ব্রাহ্মণ যুবকদের অনেকে পরিবেষণ করছেন। ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) তদারক করছেন। মাঝে-মাঝে একদল বানর লুব্ধ দৃষ্টিতে এগিয়ে আসছে, পরক্ষণে জনতার তাড়া খেয়ে আমগাছের ডালে যেয়ে উঠছে। খেয়েদেয়ে একদল অতিথিশালায় বিছানা পেতে টান-টান হ'য়ে শুয়েছেন। পান চিবোচ্ছেন আর পরস্পর খোশ-গল্প করছেন। কোথাও যাজন ও আলাপ-আলোচনা চলছে। নির্ম্মলদা (ঘোষ) গলা ছেড়ে গান ধরেছেন, তা'তে যে অন্যের বিশ্রাম ও ঘুমে ব্যাঘাত হ'চ্ছে, সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। অন্যে তীব্রভাবে বাধা দিতেই তিনি বললেন—What right have you got to disturb me? (আমাকে বিরক্ত করবার আপনার কী অধিকার আছে?) — ঠাকুরের কথা আপনি জানেন না?

'অনুরোধী আবেদনী সুরে
আদেশ দিতে হয়
এই স্বভাবের এস্তামাঙ্গে
গায় মানুষ তার জয়।'
'সব কথারই বাঁক যদি রয়
আবেদনী সুরে
সেই তো ভাল আঘাত লাগে না
মানুষের অহংকারে।'
'উচিতবাদের দম্ভ কর
হিতের ধারটি ধারছ না
এমন চলায় চললে জেনো
পাবেই পাপের লাঞ্ছনা।'
'কারেও যদি বলিস কিছু
সংশোধনের তরে
গোপনে তারে বুঝিয়ে বলিস
সমবেদনা-ভরে।'
'কথা কইবে গুড়ের মত
লেপ্‌টে রবে গায়
মিষ্টি কথাও শক্ত হ'লে
উল্টো পানেই ধায়।'

অন্য সবাই তখন তাকে চেপে ধরলেন—থাক থাক, নিজের দোষের সমর্থনে আর ঠাকুরের ছড়া আবৃত্তি করতে হবে না।

নির্ম্মলদা স্বীয় ভাষায় একটি কথাও না ব'লে ক্রুদ্ধ হ'য়ে হাত-পা ছুঁড়ে ছড়া কেটে নিজের কথা ব'লে যেতে লাগলেন—

'কাউকে আপন করতে হ'লেই
আপন-আপন ভাববি তায়,
স্বপক্ষে তার করবি কইবি
দেখবি দোষ তার উপেক্ষায়।'
'কারু বিষয় ভালমন্দ
বুঝলেও কিন্তু মনে বেশ,
বলতে বলিস হিসেব ক'রে
নইলে পাবি শুধুই দ্বেষ।'

ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ছড়া শোনার লোভে দাদাটিকে আরো চটিয়ে তুললেন কয়েক-

জনে মিলে। তিনিও ক্ষিপ্ত হ'য়ে উন্মত্তের মতো লম্ফ-ঝম্ফ করতে-করতে অজস্র উপদেশমূলক ছড়া বলতে লাগলেন। অনেক ছড়া ব'লে যখন দেখলেন, এত ছড়া শুনেও অবুঝ লোকদের চৈতন্যোদয় হ'চ্ছে না, তখন একবার চীৎকার করে বললেন, 'I shall complain to Sri Sri Thakur.'—এই ব'লেই তীরের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাই সবাই তাঁকে মিষ্ট কথায় নিরস্ত করলেন।.................অতিথিশালায় নানাদিগ্‌দেশাগত নানাবৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। মোটপর, কৃত্রিমতাবর্জ্জিত, রসাল, রঙ্গীন, প্রীতিস্নিগ্ধ-বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ একানুগ জীবন। বেশ লাগে এখানে এসে আড্ডা দিতে। জায়গায় ব'সে দেশভ্রমণের আমোদ কিছুটা উপভোগ করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ঘুম থেকে উঠে এসে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চে বসেছেন। হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), কানাইদা (গঙ্গোপাধ্যায়), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), ধীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), গৌরদা (দাস), নেপাল ভাই (পাল), যুগলদা (রায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), গোপেনদা (রায়), ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), জিতেনদা (মুখোপাধ্যায়), জিতেনদা (মিত্র), যোগেনদা (ঘোষ), বিষ্টুদা (হাজরা), দুলালদা (নাথ), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য), বনবিহারীদা (ঘোষ), প্রিয়নাথদা (বসু), ব্রজেনদা (দাস), সত্যেনদা (মিত্র), নিবারণদা (বাগচী), মণি ভাই (কর), প্রভাতদা (দে), রমণদা (পাল), বৈদেহীদা (কর), বিনয়দা (বিশ্বাস), অনন্তদা (ঢালি), অন্নদাদা (হালদার), প্রমথদা (গঙ্গোপাধ্যায়), যামিনীদা (দত্ত), রাজেনদা (মজুমদার), হরিদা (গোস্বামী), সুধীরদা (গঙ্গোপাধ্যায়), গিরীনদা (গোস্বামী), অভয়দা (ঘোষাল), যতীনদা (গুহ), মধুদা (গুহঠাকুরতা), সতীশদা (চৌধুরী) প্রভৃতি বহুস্থানের বহু কর্ম্মী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সমবেত হয়েছেন।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরভাবে বলতে লাগলেন—গালগল্প হিসাবে সমস্যার আলোচনা করলে কিন্তু সমাধান মিলবে না। আমি তোমাদের যা'-যা' করতে বলেছি সেগুলি যদি কর, তাহ'লে দেখতে পাবে—ব্যাপার অনেকখানি সরল হ'য়ে আসছে। প্রথমে অন্যকে ঠিক করবার কথা ভাবতে নেই, প্রথমে ভাবতে হয় নিজেকে ঠিক করার কথা। নিজেকে ঠিক করা মানে ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে হয়। প্রথমটা হ'লো যজন আর দ্বিতীয়টা হ'লো যাজন। আর, ইষ্টের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাতে হয়। তাঁকে সব চাইতে আপন ক'রে নিতে হয় নিজ সক্রিয় স্মৃতি ও বোধভূমিতে। এ-কথা বলার একটা তাৎপর্য্য আছে। ইষ্টপুরুষ যিনি,

তাঁর কাছে সবাই তাঁর আপন। আর, তিনি সেইভাবে সবার জন্য ভাবেন, বলেন ও করেন। কিন্তু আমাদের তাঁর জন্য যদি ভাবা, বলা, করার খাঁকতি থাকে, তাহ'লে আমাদের সক্রিয় স্মৃতি ও বোধভূমিতে এই ভাবটা জাগ্রত থাকে না যে তিনিই জীবনে প্রথম ও প্রধান। এই বোধটা ফুটিয়ে তোলার জন্য যজন-যাজনের সঙ্গে চাই নিষ্ঠাভরে ইষ্টভৃতি ক'রে দিনযাত্রা সুরু করা। অন্নজল গ্রহণ করার পূর্ব্বে যে ইষ্টভৃতি করার বিধান আছে, তার কারণ হচ্ছে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনের থেকেও তাঁর তর্পণ-নন্দনাকে বড় ক'রে দেখা, সেইটেকেই প্রাধান্য দেওয়া। তাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি আবেগভরে, নিষ্ঠা-সহকারে পালন করতে-করতে আত্মপ্রীতির থেকে ইষ্টপ্রীতিই প্রবল হ'য়ে ওঠে। ইষ্টপ্রীতির সঙ্গে-সঙ্গে আসে পারিবেশের প্রতি প্রীতি। এইভাবে মানুষের ভিতরে সত্তাপোষণী গুণাবলীর বিকাশ হয়। ঐ গুণগুলিই মানুষকে টিকিয়ে রাখে, বাঁচিয়ে রাখে। সৎসংহতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সেবা এবং অসৎ-নিরোধী প্রচেষ্টা তখন সহজ হ'য়ে ওঠে। তোমরা তো বিশেষ কিছুই করনি, কিন্তু right line-এ (ঠিকপথে) move করার (চলার) ফলে তোমাদের মধ্যে যে দানাবাঁধা রকমটা গজিয়ে উঠছে, তা' কিন্তু আজকের দিনে দুর্ল্লভ। পরমপিতার দয়ায় তোমরা সুস্থ, সুদীর্ঘজীবী হও, অন্যকে বাঁচিয়ে বাঁচবার বুদ্ধি নিয়ে চল, অন্যকে বড় ক'রে নিজেরা বড় হও। তাহ'লে আমার অন্ততঃ এই আত্ম-প্রসাদটুকু থাকবে যে, আমি সারাজীবন শুধু ঘবঘাব বাজাইনি, পরমপিতার যারা, তাদের খানিকটা সেবা ক'রে ধন্য হ'তে পেরেছি। আজকাল ভাই ভাইয়ের বুকে পয়সার জন্য ছুরি বসাতে দ্বিধা করে না, সেই বাজারে তোমরা অন্যকে দিতে কুণ্ঠিত হও না, প্রার্থী কেউ এসে দাঁড়ালে ফকাৎ ক'রে দুই-চার আনা, আট আনা, একটাকা, দু'টাকা, পাঁচটাকা পর্য্যন্ত পকেট থেকে বের ক'রে দাও। কাছে না থাকলে ভিক্ষা ক'রে সংগ্রহ ক'রে দাও। আবার, কোন কারণে যদি দিতে না পার, ব্যথিত হও। মনের এই প্রসরাটুকু যে হয়েছে একি কম কথা? তোমাদের চলনা ঠিক থাকলে দেখবে, এটা সমাজের মধ্যেও চারিয়ে যাবে। কত লোক আমার কাছে এসে তাদের গোপন দুষ্কৃতির কথা ব'লে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চায়। আত্মশুদ্ধির আগ্রহ না জাগলে মানুষ কি কখনও এমন করে? আমার কাছে কেন, তোমাদের কতজনের কাছেও কয়। তাহ'লে বুঝে দেখ, পরমপিতার দয়ায় তোমরা কতখানি সুবাতাস তুলে দিয়েছ দেশে। এই উপকারের তুলনায় আর সব উপকার মিছে। তাই শাস্ত্রে কয়, ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠ দান। তোমরা ঋত্বিক্‌রা হ'লে ধর্ম্মদাতা। যা' দান করতে হবে তা' আগে নিজেরা অর্জ্জন করতে হয়, সঞ্চয় করতে হয়। তহবিলে থাকলে তবে তো পারবে অন্যকে দিতে! তাই চরিত্রের তহবিল বাড়িয়ে তোল এন্তার। এই-ই সাধনা, এই-ই সাধন। (মনোজ্ঞ মধুর ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে)

'মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাদের লইয়া বাহিরে থাকুক তারা'

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের হঠাৎ খুব কাশি এসে গেল। কাশতে-কাশতে চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠলো। দম আটকে যাবার মতো অবস্থা।

প্যারীদা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে পিকদানি ধরলেন। উপস্থিত সবার দিকে চেয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন—আপনারা এখন একটু সরেন, আপনারা কাছে থাকলেই ঠাকুরের কথা বলতে ইচ্ছা হবে।

সবাই দূরে স'রে গেলেন।

কাশি আসার পর একটু সামলে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন ওদের ঐভাবে সরিয়ে দিলি, ওরা মনে ব্যথা পেল না তো? কতদূর থেকে আসে কত আগ্রহ নিয়ে।

প্যারীদা (নন্দী)—ব্যথা পাইলে কি হবে? আপনার শরীরের থিকা তো বড় কিছু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর অমন খোস্তামারা কথা কেন? ওদের দিকেও তো চাইবি। আমার দিক যেমন চাইবি, আমার যারা তাদের দিকেও তেমনি চাইবি, নইলে আমার দিকে চাওয়া হয় না। আদত কথা—মিষ্টি ক'রে কথা বলতে শেখনি, তাই মানুষকে ব্যথা দিতে পার, কিন্তু ব্যথিত প্রাণে শান্তির প্রলেপ দিতে পার না। তোমরা আমার কাছে যারা থাক অথচ মানুষের সঙ্গে অযথা রূঢ় ব্যবহার কর, তাদের দেখে আমার মনে হয়, তারা আমার কাছে থাকলেও আছে তাদের নিজেদের জগতে, নিজেদের খেয়ালখুশি নিয়ে। আমার জগতের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেইকো। তাই কয়—

"সে আর লালন একখানে রয়
মাঝে লক্ষ যোজন ফাঁক।"

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের মাঝের ঘরে গেলেন বিশ্রাম নিতে।

৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৯ (ইং ২২।১০।৪২)

প্রাতে অগণিত দাদা ও মায়েরা এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দায় ব'সে আছেন। বলছেন—কাল শেষরাত্রে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। তোমরা অনেকে বাইরে থেকে এসেছ, উপযুক্ত জামা-কাপড়, বিছানা-পত্র হয়তো আননি। খুব সাবধানে থেকো কিন্তু।

ক্ষিতীশদা (দাস)—গেষ্ট হাউসের উত্তরদিকের একটা জানালা ভেঙ্গে গেছে। সেইদিক দিয়ে কাল ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা এখনই ঠিক ক'রে নেওয়া লাগে। সুধীরকে ডাক্ তো।

শচীনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) সুধীরদাকে (দাস) ডাকতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেবেলা থেকে কোন কাজ আমার কখনও ফেলে রাখতে ইচ্ছা করে না। যখন যা' করবার, তখনই তা' না ক'রে আমার আর রেহাই নেই। এই অভ্যাসটা একবার এস্তামাল ক'রে নিতে পারলে অজস্র কাজ করা যায়। করছি, করবো, এত তাড়া কী?—এমনতর ঢিলেমিকে প্রশ্রয় দিলে nerve (স্নায়ু)-ই ঢিলে হ'য়ে যায়। তখন প্রয়োজনের সময়ও ক্ষিপ্র হ'তে পারে না। হয়তো ছেলের গুরুতর অসুখ, সেই মুহূর্ত্তেই ডাক্তার ডাকা দরকার। তখনও গড়িমসি করতে থাকে। যখন নিয়ে আসে, তখন ডাক্তার বলে—আরো আগে ডাকেননি কেন? এখন যে অনেকখানি বেকায়দা ক'রে ফেলেছেন।................ সে কি ছেলেকে কম ভালবাসে? তা' নয়। কিন্তু তার ঐ দীর্ঘসূত্রতার অভ্যাস তার কাল হ'য়ে দাঁড়ায়। কতকগুলি বদ-অভ্যাস পুষে রাখা মানে, ঘরের মধ্যে কতকগুলি কেউটের বাচ্চা ছেড়ে দিয়ে রাখা। কোন্ সময় কোন্‌টা ছোবল মেরে যে প্রাণ-সংশয় ক'রে তুলবে, তার কিছুই স্থিরতা নেই। আমরা কারে না পড়লে তো বুঝি না। বুঝলেও বিপদ কেটে গেলে আবার বিস্মৃতি আসে। লেগে-বেঁধে অভ্যাস-ব্যবহারগুলি ঠিক করি না। শিক্ষা বা সাধনার মূল কথা হ'লো অভ্যাস-ব্যবহারগুলিকে জীবনীয় সঙ্গতিশীল ক'রে তোলা। এর ইতি নেই, সারা জীবন করা লাগে আরো, আরো, আরো। এই যারা করে, তাদের কয় কর্ম্মী। তাদের ঐ আচরণ ও কর্ম্ম দেখে মানুষ ঐ আচরণ ও কর্ম্মে ব্রতী হয়। ওকেই কয় যজন, যাজন। তাই একটা বোবা মানুষেরও ভাল যাজক হ'তে বাধে না, যদি তার আচার, আচরণ, অভ্যাস, ব্যবহার, সেবা ইত্যাদি সরঞ্জাম ঠিক থাকে। কথা যাজনের একটা অংশমাত্র, এবং তা'ও অপরিহার্য্য নয়। তাই ব'লে কথার যে দরকার নেই, তা'ও নয়।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—আমরা বাইরে গিয়ে মানুষকে যখন অল্প সময়ের মধ্যে ইষ্টসম্বন্ধে বোঝাতে চাই তখন কথার আশ্রয়ই তো বেশী ক'রে গ্রহণ করতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো করাই লাগে। কিন্তু ঐ করাই সব নয়। করাগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বচনের উপর একটা ছাপ ফেলে যায়। করনেওয়ালা মানুষের কথার তাই দাম হয়, ঐ কথা মানুষকে কাজে প্রবুদ্ধ করে। যাজন মানে, কর্ম্মময় অভিজ্ঞতা ও আবেগ-নিঃসৃত সুচিন্তিত উদ্দীপনী পরিবেষণ। তখন ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করা লাগে না, অল্প কথাতেই কাজ হয়। আবার, অনেক সময় বিনা কথায় হাব-ভাব-ভঙ্গীতেও মানুষ অনেক বুঝে ফেলে। আজকাল যেমন talkie (সবাক চিত্র) হইছে, এক সময় তো silent picture (নির্ব্বাক ছবি) ছিল, তখন কিন্তু মূক অভিনয় দেখে মানুষ যা বোঝার বুঝে নিত। আমি বলি—যাজনের ক্ষেত্রে তোমাদের করাটা মুখর হ'য়ে উঠুক। প্রত্যেকটি মানুষকে স্বস্তি, শান্তি, তৃপ্তি ও সেবা দেবার আগ্রহ, অভ্যাস ও বুদ্ধি যদি কারও থাকে,

তা' তার অন্তরে একটা সক্রিয়, সন্ধিৎসু সম্বর্দ্ধনী ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে। অন্যেও তার কাছে এসে টের পায় যে মানুষটা সত্যিই তাকে ভালবাসে ও তার ভাল যা'তে হয়, সুখ-সুবিধা যাতে হয়, বাস্তবে তা' করতে চায়। এতে যাজিত যে, তার resistance (প্রতিরোধবুদ্ধি) ঢিলে হ'য়ে যায়, receptivity (গ্রহণমুখরতা) unfurled (বিকশিত) হ'য়ে ওঠে। এমনটা হ'লে অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে। তখন যাজন effective (কার্য্যকরী) হয়।

সুরেনদা—একটা মানুষের সঙ্গে যেমন আমার প্রথম দেখা হ'লো, আমার কীভাবে অগ্রসর হ'তে হবে তার সঙ্গে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন তো কোন বাঁধা গৎ নেই যে সেই গৎ-বাঁধা চলনে চললেই হবে। ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে। যার সঙ্গে যেমন, তার সঙ্গে তেমন। স্থান, কাল, পাত্র, বিবেচনা ক'রে যেখানে যেমন সেখানে তেমন করবে। তবে সেই মানুষটির বোধ করা চাই যে তুমি তার স্বার্থে স্বার্থান্বিত, তার দরদে দরদী, তার একটু সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে দিতে পারলে তুমি বর্ত্তে যাও, এবং এইগুলি যে চাও, তার পিছনে তোমার কোন হীন স্বার্থপ্রত্যাশা বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার মতলব নেই। এইরকম ভাবভূমিতে দাঁড়িয়ে তুমি যদি একজন তৃষ্ণার্ত্তকে একগ্লাস জল দাও, তবে দেখবে, সেই জল খেয়ে তার প্রাণ জল হ'য়ে যাবে। তোমার চাউনি, চলন তার প্রাণ কেড়ে নেবে। মানুষকে kidnap (চুরি) করে, শোননি? যাজন হ'লো kidnapping the soul of man for God by auto-initiative inquisitive love and service (স্বতঃ-দায়িত্বপূর্ণ, অনুসন্ধিৎসু প্রীতি ও সেবার সাহায্যে মানুষের আত্মাকে ভগবদর্থে অপহরণ করা)। মানুষ অন্যকে sincerely (অকপটভাবে) ভালবাসতে রাজী থাকুক বা না থাকুক, অন্যের sincere (অকপট) ভালবাসা enjoy (উপভোগ) করতে চায় না, এমন মানুষ বড় চোখে পড়ে না। তবে selfishly (স্বার্থপরভাবে) অন্যের ভালবাসার সুযোগ নেওয়ায় মানুষের কোন সাত্ত্বিক কল্যাণ নেই, মানুষের কল্যাণ আছে অন্যকে self-lessly (নিঃস্বার্থভাবে) ভালবাসায়। অত্যন্ত selfish (স্বার্থপর) যে, তার ভিতরও self-less (নিঃস্বার্থ) ভালবাসার একটা seed (দানা) latent (সুপ্ত) থাকে, কারণ, ঐখানেই হ'লো মানুষের being (সত্তা)। তাই Ideal-centric (ইষ্ট-কেন্দ্রিক) self-less love-এর (নিঃস্বার্থ ভালবাসার) সংস্পর্শে মানুষ যত আসে, ততই ভাল। ঐ জিনিসের সুযোগ নিতে-নিতে কোন ফাঁকে ঐ মানুষটার প্রতি ভালবাসা গজিয়ে যদি যায়, তবে তখন তার ঐ character (চরিত্র) ও imbibe (আত্মস্থ) করবে সে। ভালবাসা বা শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে imbibed (আত্মীকৃত) হয় যে জিনিসটি, তাই হ'লো মানুষের character (চরিত্র)। তাই যাজকের একাধারে হওয়া চাই loving (প্রীতিময়) ও lovable

(ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য), আর তাকে ভালবেসে মানুষের শ্রেয়গতি যা'তে এন্তার হ'য়ে ওঠে, তার জন্য তার হওয়া চাই ও থাকা চাই Ideal (আদর্শ)-এ actively legared (সক্রিয়ভাবে যুক্ত)। নইলে ঐ সদ্‌গুণগুলিও নিজের ও অপরের becoming (বিবর্দ্ধন)-এর রাস্তায় জঞ্জালের মতো হ'য়ে দাঁড়ায়, মানুষকে আটক করে রাখে মায়ার কারাগারে। মায়া মানে যা' মানুষকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে রাখে, গণ্ডী কেটে বিস্তারের পথে এগুতে দেয় না।

যতীনদা (ঘোষ)—সদ্‌গুণ becoming (বিবর্দ্ধন)-এর অন্তরায় হয় কী ক'রে? তা' তো বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তথাকথিত অবগুণও being and becoming (জীবন ও বর্দ্ধন)-এর পরিপোষক হ'তে পারে। আবার, তথাকথিত সদ্‌গুণও being and becoming (জীবন ও বর্দ্ধন)-এর পরিপন্থী হ'তে পারে। কোন্‌টা কার সেবায় লাগান হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে সব। একজন হয়তো রাগী মানুষ; সে যদি রাগত স্বভাবকে ইষ্টার্থে ব্যবহার করে, অন্যায় ও অসৎ যা'-কিছু তারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে: দুষ্ট লোকদের মনে এমনতর একটা ত্রাসের সঞ্চার ক'রে দেয় যে, খারাপ কিছু করলে অমুকের হাত থেকে আর রেহাই নেই, তার ফলে তো মানুষের ভালই হবার কথা। আর, আত্মনিয়ন্ত্রণ যে জিনিসটা তাও আসে অমন ক'রে। একটা বদরাগী লোক যদি ইষ্টকে ভালবেসে ফেলে, ইষ্টে interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তখন কিন্তু সে এমন ক'রে রাগের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, যা'তে ইষ্টের interest (স্বার্থ) affected (ব্যাহত) হয়। এই যে consideration for the superior beloved (প্রেষ্ঠের জন্য বিবেচনা)—এই-ই হ'লো মানুষের সব চাইতে বড় শিক্ষক ও অনুশাসক। এই জিনিসটি নাই, অথচ সদ্‌গুণ আছে, সে সদ্‌গুণ তো বেওয়ারিশ মাল। নিজের বা অপরের কার কোন্ বদ-মতলবের ইন্ধন হবে ঐ সদ্‌গুণ তার কি ঠিক আছে? ইষ্টের পূজায় লাগে না যা', তাই-ই অনিষ্টের কারণ হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ, আর তাই-ই স্বাভাবিক। রূপযৌবনসম্পন্না নারীর যদি সতীত্ব বা স্বামীনিষ্ঠা না থাকে, তাহ'লে তার যে দুর্গতি হয়, ইষ্টনিষ্ঠাহীন তথাকথিত সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষেরও তেমনতর দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। এই কালবিধ্বস্ত জগতে যদি কোন জিনিসের কার্য্যকরী মূল্য থাকে, তা' হ'লো কালাধীশ যিনি, তাঁর প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য। আর কিছুই কালের কবল থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে না। তাই, সর্ব্বশাস্ত্রে ভক্তির এত ভূয়সী প্রশংসা। ও বড় মধুর মাল। পরাণ পাগল ক'রে রাখে। (এই ব'লে আবেগবিহ্বল অন্তরে গান ধরলেন)—'তাঁর নামে এত মধু ঝরে, প্রেমে না জানি কি করে!'

তাঁর অনিন্দ্য কণ্ঠনিঃসৃত, মিহিসুরের মোহন মূর্চ্ছনা একটা তীব্র ব্যাকুলতা ছড়িয়ে দিল আকাশে-বাতাসে, সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রতিটি অন্তরে।

জগৎদা (চক্রবর্ত্তী)—জ্ঞানযোগী বা কর্ম্মযোগী যাঁরা, তাঁরাও তো কালের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় কি আছে তো—ত্রিভির্গুণময়ৈঃ?

সুবোধদা (সেন)—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্ম দিয়েই হোক আর জ্ঞান দিয়েই হোক তাঁর শরণাপন্ন হ'তে হবে। তাঁতে যুক্ত হ'তে হবে—তৎসংরক্ষণী সক্রিয় আবেগ ও প্রচেষ্টা নিয়ে;—নইলে রেহাই নেই। তাই বলেছে—যোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি। যোগ না হ'লে হবে না। আর, এই যোগের সূত্র হ'চ্ছে অনুরাগ। তাই সব যোগের মধ্যে ভক্তিটা অনুস্যূত হ'য়ে আছেই। ভক্তির সঙ্গে-সঙ্গে আছে ভজন, সেবা। ঐখানেই এসে পড়ে কর্ম্ম। কর্ম্মের আগে-পাছে জড়ান আছে জ্ঞান। কর্ম্ম করতে গেলেই মানুষকে জানতে হবে, কিভাবে কোন্ বিধিতে কর্ম্ম করলে সে-কর্ম্ম ফলপ্রসূ হবে, প্রেষ্ঠের পরিপূরণ, পরিপোষণ ও পরিরক্ষণ হবে। ঐ বিধি জেনে নিয়ে সেইভাবে কর্ম্ম করতে হবে। নইলে আবোল-তাবোল যা'-তা' করলে হবে না। আবার, কর্ম্মনিঃসৃত অভিজ্ঞতা থেকে গজিয়ে উঠবে আরোতর বাস্তব জ্ঞান। তাই ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য। ওর প্রত্যেকটিই যোগের পক্ষে অপরিহার্য্য। ইষ্ট বা ভগবানকে ভালবাসি অথচ তাঁর জন্য কিছু করি না, কিংবা কী করতে হবে তা' বুঝি না, সে-জ্ঞান আমার নেই। তার মানে, আমি তাঁকে ভালবাসি না, তাঁর সঙ্গে যুক্ত নই আমি। আমি যুক্ত আমার প্রবৃত্তির সঙ্গে। তবে এক-একজনের approach (অভিগম) এক-এক রকম। কারও হয় তো কাজের দিকে ঝোঁক বেশী, সে কাজকর্ম্মই পছন্দ করে এবং করেও তাই, কারও হয় তো emotion (ভাবাবেগ) বেশী, emotional upheaving (ভাবস্ফীতি) যা'তে হয়, সেইজন্য নামগুণকীর্ত্তন ইত্যাদি বেশী ক'রে করে, কেউ হয় তো intellectually-minded (বুদ্ধি-প্রধান), সে হয় তো ideological understanding (ভাববাদ সম্বন্ধে বোধ) পরিপক্ক ক'রে তুলতে প্রয়াস পায়। এইসব রকমারি থাকে। কিন্তু ঐ প্রকৃতিগত ঝোঁকগুলি যদি ইষ্টার্থে বিন্যস্ত হয়, তবে গড়পড়তায় এসে দাঁড়ায় একজায়গায়। ইষ্টই তার কাছে ধীরে-ধীরে prominent (প্রধান) হ'য়ে উঠতে থাকেন, এবং সে দেখে যে কোনটাই

ignore (উপেক্ষা) করবার নয়। কর্ম্মপ্রধান যে, সে দেখে আবেগ না থাকলে, বোধ না থাকলে কর্ম্ম নীরস ও নিষ্ফল হ'য়ে ওঠে, আবার, আবেগ-প্রধান যে, সে দেখে ইষ্টার্থপূরণী কর্ম্ম ও জ্ঞান না থাকলে তাকে দিয়ে ইষ্টের কোন সুখ-সুবিধা হয় না, আবার, জ্ঞানতপস্বী যে সে দেখে, ইষ্টের জন্য আবেগ ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা না থাকলে সব জ্ঞান মিথ্যা হ'য়ে যায়। এইভাবে প্রত্যেকের আড় ভেঙ্গে যায়। ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞানের সমন্বয়ে মানুষ সহজ হ'য়ে ওঠে, অবশ্য যদি সে অকপট হয়। তাই ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান কোনটাই কোনটার বিরোধী নয়, বরং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

বসন্তদা (পূততুণ্ড)—কিন্তু বাস্তবে তো তা' সবসময় দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট-সম্বন্ধে with being (সত্তাসহ) interested (স্বার্থান্বিত) হ'লে এমনতর না হ'য়ে উপায় নেই। এমনিই দেখ না কেন? হয় তো একটা লোক বিপন্ন হ'য়ে তোমার কাছে এসে পড়ল। তার প্রতি তোমার যে ভালবাসা আছে, তা' হয় তো নয়, তবু কর্ত্তব্যের খাতিরে তাকে যতটুকু উপকার করার করতে লাগলে নিতান্ত দায়ঠেকাভাবে। কয়েকদিন যদি তার জন্য কিছু-কিছু করতে থাক, তাহ'লে দেখবে, ধীরে-ধীরে মানুষটার প্রতি তোমার একটা মায়া জন্মে যাবে! তখন ভাববে, আরো কী করা যায় লোকটার জন্য। তার অবস্থা-সম্বন্ধে মনে-মনে খতাবে। পাঁচজনের সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধি করবে, কি-ভাবে লোকটাকে দাঁড় করান যায় জীবনে। কর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে সেই পথ বেয়ে তার সম্বন্ধে আবেগ ও জ্ঞানের সৃষ্টি হবে। কারণ, মানুষটাকে তুমি ভালবেসে ফেলেছ। ও যে একসুতোয় জড়ান। রীলে টান পড়লে ফক-ফক ক'রে বেরুতে থাকবে। সত্তার রাজ্যে watertight compartment (বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠ) ব'লে কিছু নেই। সবই interlinked (পরস্পর-সম্বন্ধ)। তাই তো বলে অখণ্ড অনন্ত। অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালবাসার রাজ্যে দাঁড়ায় যখন মানুষ, তখন সে সসীম হ'য়েও অসীম। একেই বলে মায়ার পারে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথের আছে—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে শুনছেন তাঁর কথা। মজে আছেন, ডুবে আছেন আনন্দ-সায়রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ক'টা বাজে?

একটি দাদা বললেন—পৌনে আটটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিটিং আছে না?

সুবোধদা—আছে। তবে আপনার কাছে বসতে পেলে আর মিটিং-এ যেতে ইচ্ছা করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কী কথা? কর্ম্মীদের মিটিং, তোমরা ঋত্বিক্, তোমরা যদি ওখানে না গিয়ে আমার কাছে ব'সে থাক, তাহ'লে অধ্বর্য্যু-যাজকরাও তো যাবে না। তাছাড়া, যখন যা' করবার তখন তা' না ক'রে অন্য যত ভাল কাজই কর না কেন সেটাও কিন্তু go-between-এর (দ্বন্দ্বীবৃত্তির) পর্য্যায়ে পড়ে।

এরপর অনেকেই উঠে পড়লেন।

চুনীদা (রায়চৌধুরী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রবীন্দ্রনাথের ঐ যে আছে 'সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর', ওর পরের লাইনগুলি তোর মনে আছে?

চুনীদা—না, ঠিক মনে নেই। গীতাঞ্জলিতে আছে। এই ব'লে চুনীদা গীতাঞ্জলি এনে প'ড়ে শোনালেনঃ—

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর॥
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর॥

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাগুলি বড় সুন্দর। বোধ না থাকলে এমনতর লেখা বেরোয় না। তাঁর যে আলো, সে আলো অখণ্ড, আঁধার বা ছায়া দিয়ে বারিত বা ব্যাহত হয় না তা'। সে আলো তাই ছায়া সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে কায়া। ছায়াটা মিথ্যা। কায়াটা বাস্তব। প্রকৃত জ্ঞান কখনও আলেয়ার সৃষ্টি করে না, তা বাস্তবায়িত হয় নব-নব রূপে, নব-নব রচনায়। সীমার মধ্যে হয় অসীমের নব-নব সংহত প্রকাশ। ছেলেবেলায় ঘাসের বুকে শিশিরবিন্দুকে দেখতাম, যেন গোটা সূর্য্যকে প্রতিফলিত করছে সে। দেখতাম আর মনে হ'তো শিশির-বিন্দু যদি জগৎপ্রসবিতা সূর্য্যকে বুকে বহন ক'রে বেড়াতে পারে, তবে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমিই বা পারব না কেন পরমকারুণিক পরমপিতাকে বুকে বহন ক'রে বেড়াতে, শিশিরবিন্দুর মতো তাঁকেই ঠিকরে দিতে আমার সারাটা জীবন দিয়ে? এইসব কথা ভাবতাম আর বুকখানা যেন আনন্দে দশহাত হ'য়ে উঠতো। এখন দেখছি, ছেলেবেলার ভাবনাটা মিথ্যা কল্পনা নয়। রবীন্দ্রনাথও তো ঐ কথাই বলেছেন তাঁর মতো ক'রে কবির ভাষায়ঃ—

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাগুলি বার-বার রোমন্থন করছেন আর রসিয়ে-রসিয়ে

উপভোগ করছেন। চোখমুখ তাঁর রসাবেশের মাধুর্য্যে আরো মধুর হ'য়ে উঠেছে। রসিকশেখর যেন বিশ্বরহস্যের গূঢ়স্বাদ আপন অন্তরে নূতন ক'রে আস্বাদন করছেন। আস্বাদ গ্রহণ করছেন আর তজ্জনিত তৃপ্তিতে মস্‌গুল হ'য়ে উঠছেন। চেহারায় ফুটে উঠছে সেই অপার তৃপ্তির অপার্থিব ব্যঞ্জনা। ধন্য তারা যারা চর্ম্মচক্ষুতে দেখছে এই দিব্যলীলা।

একটি ভাই এসে বললেন—ঠাকুর, আপনি বাবা-মাকে ভক্তি করার কথা বলেন, কিন্তু আমার বাবা-মাকে মোটেই ভাল লাগে না। জোর ক'রে কি ভক্তি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা-মাকে ভাল লাগে না মানে, নিজের জীবনকেই তোমার ভাল লাগে না। অমন কথা কখনও বলবি না। অমন কথা বলাও পাপ, ভাবাও পাপ, শোনাও পাপ। বাবা-মা হ'লেন তোমার জীবনের আদিভূমি, তাঁদের দিয়েই জাগাইছে তোমার শরীর-মন। তাঁদের যদি অপ্‌ভার করতে শেখ, দেখবে, দুনিয়ার তোমার loafer (বাউণ্ডুলে) হ'য়ে ঘুরে বেড়ান ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না। বাপ-মায়ের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নেই, অথচ জীবনে বড় হইছে এমন একটা মানুষও দেখা যায় না। আমি বলছি—তুই রোজ এইগুলি করবি। রোজ সকালে উঠে বাবা-মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবি। ইষ্টভৃতি করিস তো?

ভাইটি—আজ্ঞে করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি করার পর বাবা ও মাকেও কিছু-না-কিছু রোজ দিবি। নিজ হাতে বাবা-মার সেবাযত্ন করবি। বাবার জুতোটায় হয়তো কালি দিয়ে দিলি। পা ধোয়ার জলটা হয়তো এনে দিলি। মা'র বাসনটা হয়তো মেজে দিলি। রান্না করতে-করতে মা ঘেমে গেছে, তুই যেয়ে হয়তো পাখা নিয়ে বাতাস করলি। নিত্যনূতন ভেবে-ভেবে বের করবি আর বাবা-মার সন্তোষ ও শান্তি হয় যা'তে, হাতেকলমে তাই করবি। কয়েকদিন এই ক'রে দেখ-তখন দেখবি, বাবা-মাকে কত মিষ্টি লাগে, বুঝতে পারবি তারা কী বস্তু। বাবা! এই জ্যান্ত দেবতাদের যদি খুশি করতি না পার, তাঁরা যদি প্রসন্ন না হন, তাহ'লে কিন্তু সব দেবতার দরজায় তোমার কাঁটা প'ড়ে যাবে। কারও প্রসন্নতা উৎপাদন করা সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে।

উক্ত ভাই—যদি তাঁরা ইষ্টের পথে চলার বাধা সৃষ্টি করেন, তাহ'লেও কি তাঁদের মেনে চলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার মঙ্গল যাঁরা চান, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী যাঁরা, তাঁরা কখনও তোমাকে মঙ্গলের পথে চলতে বাধা দিতেই পারেন না। তবে তোমার নিজ আচরণ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে তুমি প্রকৃত মঙ্গলের পথে চলেছ। তার প্রথম ধাপই হ'লো পিতামাতার প্রতি আরো সশ্রদ্ধ ও সেবাপরায়ণ হওয়া। তোমার ঠাকুর ধরার ফলে নগদানগদি এই শুভ পরিবর্ত্তনটা যদি তাঁরা দেখেন,

তাহ'লে তোমার সঙ্গে লড়াই করতে যাবেন কোন্ দুঃখে? সেবা খুব দিতে হয়, মান্য খুব করতে হয়, কিন্তু ইষ্টের ব্যাপারে খুব fanatic (ধর্ম্মমত্ত) থাকা লাগে। ধর, তোমার হয়তো নিরামিষ খাবার কথা। তোমার মা-বাবা হয়তো নিরামিষ আহারের তাৎপর্য্য বোঝেন না। এখন তাঁদের খুশি করবার জন্য তুমি যদি পূর্ব্ববৎ মাছমাংস খেতে থাক, তাহ'লে কিন্তু তুমি গেছ। তোমার নিজেরও তা'তে ভাল হবে না। ভবিষ্যতে তাদেরও ভাল করতে পারবে না। সকলের প্রতি সশ্রদ্ধ ও সেবাপরায়ণ থেকেও তুমি যদি আদর্শানুসরণ-তৎপর হও, তা' সত্ত্বেও conflict (সংঘাত) আসতে পারে। কিন্তু সেখানে অপরের কাছে yield (আত্মসমর্পণ) করার মধ্যে তার solution (সমাধান) নেই। Solution (সমাধান) আছে unyielding zeal (অনমনীয় উৎসাহ) নিয়ে আদর্শানুসরণ করায়। কারণ, আদর্শের মধ্যে আছে সকলের সত্তার রসদ। তাঁকে যদি অটুট নিষ্ঠায় ধ'রে থাক, তুমিও বাঁচবে, অন্যকেও বাঁচাতে পারবে। তাই বাপ-মাকে ভালবাসলে বাপ-মায়ের কল্যাণের জন্যই আরো বেশী ক'রে আদর্শপরায়ণ হওয়া দরকার। সবার সম্পর্কেই এই কথা খাটে। এই প্রফুল্লর (প্রফুল্লকে দেখিয়ে) দাদা তো নাকি একসময় সৎসঙ্গের কথা শুনতে পারত না। এই কিছুদিন আগে এসে তো দীক্ষা নিয়ে গেল। নিল তো নিল আবার কত আগ্রহ ক'রে ছোট ভাইয়ের কাছ থেকেই দীক্ষা নিল। প্রফুল্লকে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠাল 'কার কাছে দীক্ষা নেব?' আমি ক'লাম—'তুই দেগা।' ও তো শুনে সঙ্কোচে কাঁচুমাচু করতি লাগল। সরোজিনী ছিল সেখানে, সরোজিনী দেখিছিল—ওর চেহারাটা তখন কেমন আর্ত্ত ও বিপন্নের মতো হ'য়ে উঠেছিল। আমি ধমক দিয়ে ক'লাম—'তাড়াতাড়ি কাম সারে চ'লে আয়গা।' ও তো জবুথবুর মতো উঠে চ'লে গেল। পরে দীক্ষা নিয়ে আ'সে ওর দাদা কয়—'ঠাকুর! আপনি অন্তর্য্যামী। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, দীক্ষা যদি নিই তো প্রফুল্লের কাছ থেকেই নেব।' শুনে একটা আত্মপ্রসাদ হ'লো যে প্রফুল্ল আমার কাছে প'ড়ে থেকে দাদার মনে এতখানি দাগ কাটতে পেরেছে। আমি এ ঘটনা বললাম এইজন্য যে, গোড়ায় যত বিরোধেরই সৃষ্টি হোক, সুনিষ্ঠ চলন যদি থাকে তাহ'লে পিতামাতা, গুরুজন বা প্রিয়জন যারা আছে কালে-কালে তাদের অনেককেই adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায়, বিশেষতঃ শুভসংস্কারসম্পন্ন যারা। তবে এ-কথা ঠিকই—পিতামাতার শুভ-সংস্কার না থাকলে তুমি এখানে আসতে পারতে না। তোমার দীক্ষিত হওয়ার ভিতর দিয়ে বোঝা যায়—তোমার বাবা-মার ভিতরও সদ্‌গুরুগ্রহণের প্রবণতা অনুস্যূত আছেই। তাঁরা দীক্ষা নেন বা না নেন, তোমার চলন যদি তাঁদের বিক্ষুব্ধ না করে তবে তাঁরা দীর্ঘদিন তোমার প্রতি সৎসঙ্গী হওয়ার কারণে বিরক্ত থাকতে পারেন না। তোমার বাবা-মার কাছে আগে তোমার দাম যদি না বাড়ে, তবে আমার দাম বাড়বে না।

তোমার দাম বাড়া মানে, তোমার চলনের ফলে তোমার প্রতি তাদের একটা স্নেহল শ্রদ্ধার সৃষ্টি হওয়া। সেখানে যাজন হ'লো ঐ। তা' না ক'রে মুখে যদি কেবল ঠাকুর-ঠাকুর কর, তার মানে, তোমার ঠাকুরকে অশ্রদ্ধা করতে বলছো তুমি। ওকে যাজন বলে না, বলে গাজন।

সেরপুরের খগেন মালাকারকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কী রে! বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতিছিস তো?

খগেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব লাগাও। মানুষের প্রাণে-প্রাণে তুফান তুলে দেওয়া চাই। কথার সঙ্গে হাবভাব, ভঙ্গী, চাউনি, হাতনাড়া সমানতালে ঐ কথাই প্রকাশ করা চাই। তা'তে effect (ফল)-টা reinforced (আরোতর শক্তিশালী) হয়। নাম করা orator (বাগ্মী)-দের lecture (বক্তৃতা)-গুলি পড়তে হয়। আর, সবসময় মাথার জমিনে লাঙ্গল চালাতে হয়—কোন্ কথাটা কেমন ক'রে place (উপস্থাপন) করব। Reason, emotion, fact ও imagination-এর (যুক্তি, আবেগ, তথ্য ও কল্পনাশক্তির) happy blending (শোভন সম্মিলন) চাই। আর, একটা note-book (খাতা) সবসময় সঙ্গে রাখবি। পড়া, শোনা ও দেখার মধ্যে যা' ভাল পাবি, তা'তে তা' note ক'রে (টুকে) রাখবি। নিজের brain-এ (মাথায়) যদি কখনও কোন ভাল point (কথা) বা idea (চিন্তা) flash করে (দীপ্ত হ'য়ে ওঠে), তখনই তা' লিখে রাখবি। নিষ্ঠার সঙ্গে লাগা-জোড়া তীব্র অনুশীলন না করলে হয় না। করতে-করতে এমন একটা level (স্তর)-এ যাওয়া লাগে, যেখানে perennial current (বহতা স্রোত)-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইভাবে পাথর খুঁড়ে-খুঁড়ে এগুতে হয়। ভাল জল পেলে তখন গোঁফে তাও দিয়ে মজাসে মৌতাত কর। ভালোর উপরও আরো ভাল আছে, তাই চেষ্টা ও সন্ধান ছাড়তে নেই। এই ইন্টানুগ অতন্দ্র তপস্যাই জীবন। এটা খতম হ'লেই জীবনে ঘুণ ধ'রে যায়। লোকে মেয়েমানুষ চায়, টাকাপয়সা চায়, নামযশ চায়, কিন্তু কিছুতেই সাত্ত্বিক তৃপ্তি পায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তামাক খেতে-খেতে অরুণকে বললেন—কাজলা কেমন আছে দেখে আয়গা তো।

অরুণ (জোয়ার্দার) দেখে এসে বললো—এখন একটু ভাল। মাসীমার সঙ্গে মাষ্টি-নষ্টি করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে একটু হাসলেন। তারপর বললেন—মনুতে পিতা, মাতা ও আচার্য্য সম্বন্ধে অতি সুন্দর কথা আছে। কেষ্টদা একদিন প'ড়ে শুনিয়েছিল, বড় ভাল লেগেছিল। কোথায় আছে জানেন নাকি যোগেশদা?

যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী)—দ্বিতীয় অধ্যায়ে থাকবার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এনে শোনাতে পারেন নাকি? যদি খুঁজে না পান, কেষ্টদার কাছে জিজ্ঞাসা করেন যেন। ও! কেষ্টদা তো বোধহয় মিটিং-এ গেছে, তাহ'লে এখন আর বিরক্ত ক'রে কাম নেই। আপনি নিজেই খুঁজে দেখেন।

যোগেশদা কেষ্টদার বাড়ী থেকে মনুসংহিতা নিয়ে এসে দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়া থেকে পর-পর শ্লোকগুলি দেখে যেতে লাগলেন। শেষের দিকে এসে প্রয়োজনীয় কথাগুলি পেয়ে উল্লসিত হ'য়ে বললেন—এই বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়েন তো। পড়লি ঠিক পাবনে।

যোগেশদা—অপত্যজননে মাতা, পিতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, সন্তান শত-শত বর্ষেও সেই ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ঘাড় নেড়ে অনুমোদন সহকারে)—ঠিক জায়গাই বোধ হয় বার করিছেন। সবটা প'ড়ে যান। (পূর্ব্বোক্ত ভাইটির দিকে চেয়ে বললেন)—ভাল ক'রে শোন।

যোগেশদা—প্রত্যহ মাতা, পিতা ও আচার্য্যের প্রিয়কার্য্য করিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়া থেকে ফের একটানা প'ড়ে যান।

যোগেশদা প'ড়ে চললেন—অপত্যজননে মাতা, পিতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, সন্তান শত-শত বর্ষেও সেই ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যহ মাতা, পিতা ও আচার্য্যের প্রিয়কার্য্য করিবে। ইঁহারা তিনজনে তুষ্ট থাকিলে সমুদয় তপস্যা সফল হয়। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—পিতা, মাতা ও আচার্য্য এই তিনের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা। ইঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন ধর্ম্মকার্য্য করিবে না। ইঁহারা তিনজনই ত্রিলোকপ্রাপ্তির হেতু, ইঁহারা তিনজনই আশ্রয়লাভের কারণ, ইঁহারা তিনজনই ত্রয়ী বেদ, এবং ইঁহারা তিনজনই তিন অগ্নি। পিতাই গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্য্যই আহবনীয় অগ্নি বলিয়া অভিহিত—এই তিন অগ্নিই জগতে গরীয়ান্। যে ব্রহ্মচারী মাতা, পিতা ও আচার্য্য এই তিনজনের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ না করেন, তিনি ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হয়েন; এবং সশরীরে প্রকাশমান হইয়া সূর্য্যাদি দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। মাতৃ-ভক্তি দ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তি দ্বারা অন্তরীক্ষলোক এবং গুরুভক্তিবলে ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। যিনি পিতা, মাতা ও আচার্য্য এই তিনজনের আদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মকর্ম্মই ফলপ্রদ হয়। আর, যিনি এই তিনজনের অনাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানই বিফল হয়। যতদিন পর্য্যন্ত এই তিনজন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না। কিন্তু প্রতিদিন ইঁহাদের প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠানে রত থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করিবে। তাঁহাদিগের সেবাশুশ্রূষার ব্যাঘাত না করিয়া কায়মনোবাক্যে পারলৌকিক ফল লাভের জন্য যে কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে,

তৎসমুদয়ই "আমি এই কর্ম্ম করিয়াছি" বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন করিবে। যেহেতু এই তিনজনে উক্তরূপে শুশ্রূষিত হইলে, পুরুষের শ্রৌত, স্মার্ত্ত সমুদয় কর্ত্তব্যকর্ম্মই শেষ হয়, অতএব ইঁহাদের শুশ্রূষাই সাক্ষাৎ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অগ্নিহোত্রাদি অপর যে-কিছু ধর্ম্ম আছে, সে সকলই উপধর্ম্ম নামে কথিত।

যোগেশদা বেশ ভাবের অভিব্যক্তি-সহকারেই গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কথাগুলি পাঠ করলেন। পড়ার পর দেখা গেল, ঐ ভাইটির চোখ ছলছল করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বুঝলি তো?.................এখন ঐভাবে চলবি। পারিস তো কথাগুলি টুকে নিজের কাছে রেখে দিস ও মাঝে-মাঝে পড়িস।

ভাইটি বিনীতভাবে বললেন—আজ্ঞে তাই করব।

একটু পরে ঐ ভাইটি উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সমবেত সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—নিজের ভাল চায় না, এমন মানুষ খুব কমই আছে। কিন্তু আমরা জানি না, কেমন ক'রে নিভু-নিভু ভাল চাওয়াটাকে জ্বলন্ত ক'রে দিতে হয়। আর, ঐ চাওয়া-অনুযায়ী চলনটাকে উসকে তুলতে হয়। আগে ব্রাহ্মণরা ঘরে-ঘরে হানা দিয়ে নিজের দায়ে এই কাজটি করতেন। তাই সমাজ কতখানি সুস্থ, স্বস্থ থাকতো। আজ এই মৌলিক কাজটি বাদ দিয়ে হৈ-হুল্লোড় খুব করা হ'চ্ছে, তাই কোন কাজই দানা বেঁধে উঠছে না। সবই যেন ফাঁকা, ফাঁপা, তলাশূন্য। তাই তোমাদের এই ঋত্বিক্-আন্দোলন না দাঁড়ালে সমাজের নিস্তার নেই। এটা শুধু বাংলা বা ভারতের জন্য প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন প্রত্যেকটি দেশের জন্য। তাই তোমাদের অতো ক'রে কই, right instinct (খাঁটি সংস্কার)-ওয়ালা লোক যোগাড়ের কথা। যা' কই তা' যদি কর, তাহ'লে দেখবে, ভারত আবার দেবভূমি হ'য়ে উঠবে।

তাঁর চোখেমুখে যেন এক অন্তহীন আশা ও বিশ্বাসের ছবি ফুটে উঠলো। সেই মুখশ্রী দেখে সকলের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো।

৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪৯ (ইং ২৩।১০।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চে ব'সে আছেন। ঋত্বিক্-অধিবেশন চলছে ব'লে জায়গাটায় লোক গিজগিজ করছে। পাশে কয়েকজন দোকানদার তরকারি, পান, পাকাকলা ইত্যাদি নিয়ে বসেছে। একজন দোকানদার একটু অন্যমনস্ক হ'তেই তার বড় একছড়ি

মর্ত্তমান কলা বানরে নিয়ে উধাও হ'য়ে গেল। লোকটা হাউমাউ ক'রে উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহানুভূতির সুরে বললেন—কি রে, অমন করিস ক্যান্?

লোকটা বলল—ঠাকুর! আমার সর্ব্বনাশ হয়া গিছে। একছড়ি মর্ত্তমান কলা হনুমানে নিয়ে গেছে। মিটিংয়ের সময় আনিছিলাম, বেচে দু'পয়সা হবি আশায়, তা' আর হবার লয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একজনকে ইঙ্গিত করতেই তিনি দুটো টাকা ঐ দোকানদারকে দিয়ে দিলেন। দোকানদার খুশি হ'য়ে গেল। কারণ, কলা বিক্রয় ক'রে তার যা' হ'তো, তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছে সে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর কখনও অসাবধান হবি না।

পরক্ষণে তামাক খেতে-খেতে গল্প করছেন—অন্যমনস্কতায় যেমন ওর সামনে দিয়ে কলা নিয়ে গেল, অন্যমনস্কতায় প্রবৃত্তিও তেমনি আমাদের জাগা-ঘরে অহরহ চুরি ক'রে যায়। সবসময় হুঁশিয়ার থাকা লাগে যা'তে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একচুলও deviation (ব্যতিক্রম) না হয়। বেহুঁশ হ'লেই লোকসানে প'ড়ে যেতে হবে।

সুরেশদা (মুখোপাধ্যায়)—সব সময় হুঁশ রাখাই তো কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তো নাম খুব ক'রে করতে হয়। আসন ক'রে ব'সে যেমন নাম করতে হয়, চলাফেরা, কাজকর্ম্মের মধ্যেও তেমনি নাম করতে হয়। নামে সত্তা খুব সজাগ থাকে। আর, ইষ্টকেই একমাত্র স্বার্থ ক'রে নিতে হয়। যাই করি, ভেবে দেখব তা'তে আমার ঠাকুরের সুবিধা কী হ'লো, ঠাকুর তার মধ্যে কতখানি থাকলেন। আমি যদি দুনিয়াদারির মালিকও হই আর তা'তে যদি আমার ঠাকুরের সুখ-সুবিধা না হয়, প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহ'লে জানব, আমি কিছুই পেলাম না, ভূতের ব্যাগার খাটলাম, মিছেমিছি বঞ্চিত হলাম। আর, আমার লাখ কষ্টের ভিতর-দিয়েও, তথাকথিত লাখ লোকসানের ভিতর-দিয়েও আমার ঠাকুর যদি একটু তুষ্ট-তৃপ্ত হন, একটুখানি আসান বোধ করেন, আমি মনে করব, আমি স্বল্পমূল্যে বিরাট লাভের অধিকারী হয়েছি। কেষ্টদা কাল একটা বড় সুন্দর কথা শুনিয়েছে আমাকে। কোথায় জানি পড়েছে, "The absolute female has no ego." (পরিপূর্ণা নারীর কোন অহং নেই)। আমার মনে হয়, ভক্ত সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে—"The absolute devotee has no ego." (পরিপূর্ণ ভক্তের কোন অহং নেই)। অহং নেই মানে কী? ইষ্টের অহংকেই সে নিজের অহং ক'রে নিয়েছে। সেই অহংয়েরই যন্ত্র সে। তাঁর ইচ্ছা ও চাহিদাপূরণের জন্যই সদাজাগ্রত সে। আবার, তার মধ্যে কিন্তু নিষ্ক্রিয়তার নামগন্ধও নেই। ইষ্টের will (ইচ্ছা) fulfil (পরিপূরণ) করতে সে যেমন tremendous (প্রচণ্ড) হ'য়ে ওঠে, মানুষ উদগ্র

প্রবৃত্তির ঝোঁক পরিপূরণের জন্যও অতোখানি active (সক্রিয়) হ'য়ে উঠতে পারে না। প্রবৃত্তি বা খেয়াল-পূরণের নেশা মানুষের যত শক্তিমান, তার চাইতে ঢের বেশী শক্তিমান ইষ্টার্থপূরণী আগ্রহ।

বিজয়দা (রায়)—আমার লাভটাকে লোকসান ব'লে মনে করব, আর, আমার লোকসানটাকে লাভ ব'লে মনে করব কিভাবে, তা' তো বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য যা' তাই দিয়েই তো হবে আমার লাভ-ক্ষতির বিচার। একটা সতীনারীকে কেউ যদি বলাৎকার করতে আসে, তাহ'লে সে প্রাণের বিনিময়েও যদি সতীত্ব রক্ষা করতে পারে, সেইটেকেই মনে করবে সে তার লাভ। তার এই বোধ ও বিচারকে কি তুমি ভুল বলতে পার?

নগেনদা (বসু)—আপনার কথায় আমার একটা গল্প মনে পড়লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী গল্প কন না ক্যা?

নগেনদা—শ্রীবৎস-রাজার স্ত্রী চিন্তা একসময় সতীত্ব রক্ষার জন্য কুরূপা হবার বর প্রার্থনা করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোড়া পাড়ে সব গল্পটা ভাল ক'রে কন না ক্যা? খামচা-খামচা ক'লি কি বোঝা যায়, না তা'তে রস জমে? মাষ্টার মানুষ, ছাত্রীদের কাছে যেমন গল্প করেন, তেমনি ক'রে গল্প ক'রে শোনান।

নগেনদা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সুরু করতে যাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসন গেড়ে ব'সে নেন। এই দেবী! নগেনদাকে একখানা পিঁড়ি দে। তোদের যে না ক'য়ে দিলি কিছুই মাথা খাটায়ে করবার চাস না।

দেবী (চক্রবর্ত্তী) ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে একখানি পিঁড়ি এনে দিলেন কিশোরীদার ঘর থেকে।

নগেনদা পিঁড়িতে ব'সে বলতে সুরু করলেন—শ্রীবৎস ছিলেন রাজা। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল চিন্তা। একবার শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, তাঁদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে, এবং ন্যায়পরায়ণ শ্রীবৎসকে তাঁরা মধ্যস্থ মানেন। কে বড়, কে ছোট এ-কথা বলা অশোভন হবে মনে ক'রে তিনি সোনা ও রূপোর দুটি সিংহাসন তৈরী করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্মী এসে সোনার সিংহাসনে এবং শনি রূপোর সিংহাসনে বসেন। লক্ষ্মী খুশি হলেন, কিন্তু শনি কুপিত হয়ে রাজার অনিষ্ট চেষ্টায় ঘুরতে লাগলেন। কোন অনাচার বা ত্রুটি না পেলে তো শনি সেখানে ঢুকতে পারেন না। তাই তিনি সুযোগের সন্ধানে থাকলেন। একদিন শ্রীবৎস খাবার পর পা ধুতে ভুলে গেলেন। শনি সেই রন্ধ্রপথে তাঁর দেহে প্রবেশ করলেন। শনির প্রকোপে শ্রীবৎস নানা দুর্ভোগ ভুগতে লাগলেন, ক্রমে-ক্রমে তাঁর রাজ্যপাট সব চ'লে গেল। শেষে এক কাঁথার মধ্যে মণিরত্ন বেঁধে নিয়ে তিনি চিন্তাকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেলেন। পথে

শনি এক মায়ানদী সৃষ্টি ক'রে স্বয়ং একখানা ভাঙ্গা নৌকা নিয়ে ছদ্মবেশে এসে হাজির হলেন। ভাঙ্গা নৌকায় একটির বেশী জিনিস এক সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয় ব'লে শ্রীবৎস মাঝিকে প্রথমে কাঁথার বোঁচকাটি অন্য পারে রেখে আসতে বললেন। সেই বোঁচকা নিয়ে শনি নৌকাসহ অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। রাজা তখন হায়-হায় করতে লাগলেন। উপায়ান্তর না দেখে নিঃস্ব শ্রীবৎস সস্ত্রীক এক কাঠুরিয়ার বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন।

এতেও শনির রাগ যায় না। তিনি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একদিন শ্রীবৎস কাঠ কাটতে বনে গেছেন, এমন সময় এক সওদাগরের ডিঙ্গা চড়ায় ঠেকে যায়। শনি সেখানে দৈবজ্ঞের বেশে এসে উপস্থিত হ'য়ে বললেন, এক কাঠুরিয়ার বাড়ীতে এক সতী আছে, তিনি এসে নৌকো ছুঁলেই নৌকো আবার চলবে। সওদাগর তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। খুঁজে পেয়ে সব বৃত্তান্ত বললেন। চিন্তা ভাবলেন, দিনগত পাপক্ষয় ছাড়া কারও তো কোন উপকারে লাগতে পারি না। তা' যাই না কেন, লোকটার যদি তা'তে উপকার হয়। এই ভেবে তিনি নৌকো ছুঁয়ে দিলেন। যেমনি ছোঁয়া, অমনি আবার নৌকো চলতে লাগল। আবার যদি কোথাও নৌকো চড়ায় ঠেকে যায় এই ভয়ে সওদাগর জোর ক'রে তাঁকে নৌকোয় আটক ক'রে রাখলেন। সওদাগরের ভাবগতিক চিন্তার ভাল মনে হ'লো না। তিনি দেখলেন, তাঁর রূপ দেখে যদি সওদাগরের তাঁর দেহের প্রতি লালসা হয়, তাহ'লে তো তা' সমূহ বিপদেরই কথা। তাই তিনি সূর্য্যের স্তব ক'রে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন, যা'তে তাঁর অপরূপ রূপরাশি বিলুপ্ত হ'য়ে যায় এবং তিনি কুৎসিত-কদাকার রূপ ধারণ করেন। সূর্য্যদেব তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং কুরূপা হওয়ায় তাঁর আর সতীত্ব-নাশের ভয় রইল না।

নগেনদা এই ব'লে ক্ষান্ত হলেন। সবাই সাগ্রহে শুনছিলেন তাঁর গল্প, সেইটে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাকীটুকুও বলেন না! বেশ তো ভাল গল্প! আর কথক-ঠাকুরের মতো আপনার কওয়ার কায়দাও বড় সুন্দর!

নগেনদা উৎসাহিত হ'য়ে আবার বলতে লাগলেন—এদিকে শ্রীবৎস এসে চিন্তাকে না পেয়ে অধীর হ'য়ে পড়লেন। লোকের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি এক রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেই দেশের রাজকন্যা ভদ্রা প্রথম দর্শনেই শ্রীবৎসের প্রতি অনুরক্ত হলেন। শ্রীবৎস রাজকন্যার সাহায্যে নদীতীরে বাণিজ্য-তরীর শুল্ক সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হন। এই কাজে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি ঐ সওদাগরের নৌকোয় চিন্তার সন্ধান পান। চিন্তা শ্রীবৎসকে পেয়ে তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য সূর্য্যদেবের কাছে পুনরায় তাঁর রূপযৌবন ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। সূর্য্য-দেবও তাঁর নিষ্ঠা দেখে প্রীত হ'য়ে তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন। এরপর

লক্ষ্মীর কৃপায় আবার তাঁরা হারানো রাজ্য ফিরে পেলেন এবং রাজারাণী পরম সুখে কালযাপন করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখেন, সতীনারী কী চায়। রূপযৌবন যে নারীর এত কাম্য, এত প্রিয়—তাকেও সে কোন মূল্য দেয় না, যদি তা' স্বামীর সেবায় না লাগে। ভক্তও তেমনি কোন জিনিসকেই মূল্য দেয় না, যা' তার ইষ্টের সেবায় না লাগে। তার একমাত্র মূল্যমান হয় ইষ্টের প্রীতি, ইষ্টের স্বার্থ, ইষ্টের প্রতিষ্ঠা। ঐ মানদণ্ডে মেপে-মেপে সে যা'-কিছুর মূল্য নির্দ্ধারণ করে। অন্য কোন লোভ বা মোহ তার থাকে না। সে স্বতঃই হয় মুক্ত পুরুষ। তাই কয়, মুক্তি ভক্তির দাসী।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী)—মুক্তি বলতেই যেন মানুষের মনে কেমন একটা নৈরাশ্যের ভাব আসে, কিন্তু ভক্তির কথা শুনলেই মনটা সরস হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুক্তি বলতেই বুঝতে হবে, প্রবৃত্তি-পরায়ণতা থেকে মুক্তি, স্বার্থপর কামনাকলুষ থেকে মুক্তি। এ মুক্তির প্রয়োজন আছেই। এইদিক দিয়ে যে যতখানি মুক্ত, তার জীবন ততখানি দীপ্ত। নইলে প্রবৃত্তির ঠেলায় যার জীবনে যতই জেল্লা দেখা যাক না কেন, সেই আলোর মাঝেও থাকে একটা দুরপনেয় কালো। তাই জীবের সত্তাকে তারা সন্দীপিত ও সমুন্নত করতে পারে কমই। আর, সত্তাকে সন্দীপিত ও সমুন্নত করার সামর্থ্য যাদের যেমন, তাদের scale of evolution (বিবর্ত্তনের স্তর)-ও তেমন। তাই মুক্তি বলতে যে নৈরাশ্যের ভাব আসে, সেটা মুক্তি-সম্বন্ধে ভুল ধারণার দরুন। মুক্তির সঙ্গে মরণের কোন সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে জীবনের।

কিন্তু যুক্তি অর্থাৎ যোগ ছাড়া মুক্তি মেলে না। জীবন্ত ইষ্টে যে যতখানি প্রাণের টান নিয়ে যুক্ত হয়, প্রবৃত্তির বন্ধন তার ততখানি খোলে, দোষ-দুর্ব্বলতার নাগপাশ তার শিথিল হ'তে থাকে ক্রমে-ক্রমে। তাই সাধ্য অর্থাৎ সাধনীয় যদি কিছু থাকে তবে তা' ইষ্টানুরাগ। একেই বলে ভক্তি, ভক্তি ইতিমূলক। ভক্ত দেখে যে, ভগবানের যা'-কিছু করণীয়, সবই তার করণীয়। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হ'তে গিয়ে সে সবার সঙ্গেই যুক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের being and becoming-এই (সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়ই) actively interested (সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) হ'য়ে ওঠে। এস্তার জীবন এখানে। আর, এই জীবনের মধ্যেই আছে মুক্তি—প্রবৃত্তিপরায়ণতা থেকে মুক্তি, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি, আলস্য, অবসাদ ও অননুসন্ধিৎসা থেকে মুক্তি, অজ্ঞান থেকে মুক্তি, অপ্রেম থেকে মুক্তি, অপারগতা থেকে মুক্তি, অসাফল্য থেকে মুক্তি, ভীরুতা থেকে মুক্তি—মুক্তি না কোন্ দিকে? কিন্তু ভক্তি ছাড়া এই সর্ব্বতোমুখী মুক্তি কারও কোনকালে হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই।

নিবারণদা (বাগচী) তাহ'লে ভক্ত যে, তার তো সব দিক দিয়ে শক্তিশালী

ও কৃতকার্য্য হবার কথা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তো তা' দেখা যায় না। অনেকেরই দেখা যায়, দুঃখকষ্টে জীবন কাটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, ভক্তিরই খাঁকতি আছে সেখানে। আবার এমনতরও দেখা যায়—ভক্ত যে, সে বহুর সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে। আর, বহুর মঙ্গলের জন্য এই যে কষ্টস্বীকার, এতেই সে তৃপ্তিবোধ করে। ভক্ত যে, সে তাই কষ্টে থাকলেও নিরানন্দে থাকে না কখনও। অন্তর তার ভরপুর থাকে ইষ্টানন্দে মস্‌গুল হ'য়ে। ব্যথা তার জাগে সেইখানে যেখানে সে ইষ্টের ইচ্ছা পরিপূরণ করতে না পারে। ইষ্টের ইচ্ছা তো সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়—সে ইচ্ছা সারা জগতের প্রত্যেকটি সত্তার কল্যাণকে কেন্দ্র ক'রে। এটা একটা unending programme (অন্তহীন কার্য্যক্রম)। এই programme (কার্য্যক্রম) যারা accept (গ্রহণ) করে, তারা যতই করুক, ততই দেখে, করার অনেক কিছু বাকী। এইজন্য শান্তি ও সন্তোষের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের অন্তরে জড়িয়ে থাকে একটা eternal divine discontent (শাশ্বত ভাগবত অতৃপ্তি)। এই discontent (অতৃপ্তি)-ই তাদের উধাও আবেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলে আরো-আরোর পথে—একাগ্র ইষ্টার্থী-অভিগমনে। তাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলে—

এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্রে মিলন।

কথা একেবারে খাঁটি কথা। এই জ্বালা না থাকলে শুধু সুখস্বাচ্ছন্দ্য মহৎ তপস্যার দরজা খোলে না, আর তাতে মানুষ becoming (বিবর্দ্ধন)-এর মুখ দেখতে পায় না। এই মিলিটারীর বাজারে চাকরী তো কত সস্তা, কত আধুনা লোক বেশ দুপয়সা কামাচ্ছে। তোমার বৌ-ছাওয়াল যদি না খেয়েও থাকে, তাহ'লেও কি তোমার ঋত্বিকতার কাজ ছেড়ে চাকরীতে যেতে ইচ্ছা করে?

নিবারণদা—তা' ক'রে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ইচ্ছা করে না, তার কারণ তুমি জান—এই কাজ যদি তুমি কর, তাতে বহুর জীবন কল্যাণমণ্ডিত হবে, আমিও খুশি হব তাতে। তাই ইষ্টার্থে কৃচ্ছ্রতা বরণ ক'রে চলেছ তুমি। এই কৃচ্ছ্রতা ও অপারগতা কিন্তু এক জিনিস নয়। তবে তোমাদেরও যে অপারগতা নেই, তা' বলি না। কারণ, তোমরা যদি প্রকৃত ঋত্বিক্‌ হ'য়ে উঠতে পার, তখন দেখতে পাবে, তোমাদের সংস্পর্শ, সাহচর্য্য ও সেবায় কত মানুষ জীবন-সংগ্রামে সবদিক দিয়ে জয়ী হ'য়ে উঠবে। এই মানুষগুলিই হ'য়ে উঠবে তোমাদের asset (সম্পদ্)। তখন তোমাদের এই অবস্থা আর থাকবে না। কত লোককে পালতে-পুষতে পারবে

তোমরা। আর, বিপুল ঐশ্বর্য্য তোমাদের হাতে আসলেও নিজের ভোগসুখের জন্য অযথা বেশী ব্যয় করতে ইচ্ছা করবে না। ভাববে—ঠাকুরের কাজে কতটা লাগাতে পারি, পরিবেশের কতজনকে সেবা-সাহায্যে টেনে তুলতে পারি। কথায় বলে, লাখ টাকায় বামুন ভিখারী। বামুন তো শুধু নিজের কথা ভাবে না, তাকে ভাবতে হয় সবার কথা। সবার দায়কে যে নিজের দায় ব'লে মনে করে, তার অভাব ঘোচায় কে বল? কিন্তু এ অভাব অযোগ্যতা-জনিত অভাব নয়। তাই তার কোন দৈন্য থাকে না। সি, আর, দাশ—যিনি বছরে কত লক্ষ টাকা উপায় করতেন, তিনি কিন্তু দেশের কাজের জন্য ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরেছেন। তাঁর এই ভিক্ষাবৃত্তিকে তুমি কী বলবে? তাই প্রত্যেকটা জিনিস তলিয়ে বুঝতে হবে। তবে ভক্তি-সাধনার নামে যে অযোগ্যতা ও আলস্যের প্রশ্রয় দিয়ে চলে, ইষ্টভরণের ধান্ধার চাইতে আত্ম-ভরণের ধান্ধা যার প্রবল, ইষ্টার্থী পরার্থপরতাকে যে স্বার্থ ক'রে নেয়নি, সে যে ভক্তির আনাচে-কানাচেও ঢোকেনি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিবারণদা—ঠাকুর! আমার নিজের কথা বলছি না, কিন্তু কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই তো সাধ্যমত লোককে সেবা-সাহায্য করেন, কিন্তু কই সে সত্ত্বেও তো তাদের অবস্থার আশানুরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, এর প্রতিকার কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাওয়ার লোভে কাউকে সেবা-সাহায্য করতে গেলে প্রায়ই সে সেবা-সাহায্য নিষ্ফল হ'য়ে ওঠে। তাই প্রয়োজনক্লিষ্ট যে, কোনপ্রকার প্রত্যাশা না রেখে পরিচর্য্যায় তাকে তৃপ্ত ক'রে তুলো, অর্থাদির প্রয়োজন দেখলে, তোমার সাধ্যমত যা' পার তা' সংগ্রহ ক'রে দিও, প্রতিদানে কিছু পাবার লোভ রেখো না। আবার, তেমনি তোমাকে যদি কেউ সশ্রদ্ধ আগ্রহ ও অনুকম্পায় কিছু দেয়, তাও সুতৃপ্ত ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ ক'রো, ঐ অর্থই হ'চ্ছে সাত্ত্বিক অর্থ। ফলকথা, যাজন-সেবায় প্রত্যেকটি লোকের প্রাণনদীপনাকে উচ্ছল ও উত্তাল ক'রে তুলো, তাতে যদি আনন্দের সঙ্গে, তৃপ্ত অন্তরে তারা কিছু দেয়, তবে তা' নিও। তারা দেবে এমনতর প্রত্যাশা যদি অন্তরে পোষণ কর, তাহ'লে তাদের কাছ থেকে না পেলে অন্তর ক্ষুণ্ণ হবে, এবং তাতে তোমার করার ক্রমাগতি ছিন্ন হবে, আর মানুষের কাছে তোমার প্রত্যাশাপীড়িত রকমটাও ধরা প'ড়ে যাবে। তাতে তোমাকে দিতে আগ্রহ-উন্দাম হ'য়ে উঠবে না তারা। তাই প্রত্যাশার বালাই রেখো না। স্বভাবটাকে এমন ক'রে তোল যে, মানুষের জন্য না ক'রেই পার না। প্রত্যেককে বাঁচা-বাড়া ও উন্নতির পথে অবাধ ও এস্তার ক'রে তোলা, শান্তি ও সুস্থিতে অঢেল ক'রে তোলা—সেই-ই হ'চ্ছে কিন্তু সাত্বত তপস্যার বনিয়াদ। কায়মনোবাক্যে এই বাস্তব করণে ব্যাপৃত থাকতে হবে। যত পার এমনি ক'রে চলো। দেখো—কেউ যেন কোন রকমে দুঃখিত না হয়, কখনও আপদক্লিষ্ট না হয়। এইভাবে যদি চলতে পার, তাহ'লে তো ভালই। তা'-

ছাড়া, তোমার স্বভাব যেমনতরই হোক না কেন, তুমি তাই নিয়েই ইষ্টনিষ্ঠ হও, আর সে নিষ্ঠা যেন অচ্যুত হয়। আর, সবসময় উদ্দীপ্ত অন্তঃকরণে ঐ তোমার স্বভাব—তা' খারাপই হো'ক আর ভালই হো'ক—তা'দিয়ে যাতে তোমার ইষ্টকে সন্দীপ্ত ক'রে রাখতে পার, সন্তৃপ্ত ক'রে রাখতে পার, তা' করতে এতটুকুও পিছ-পা হ'য়ো না, তা' তোমার স্বভাব-সম্পদ্ যাই থাক না কেন। তোমার মন্দ যা'-কিছু আছে তা' দিয়েও তাঁর ভাল করতে চেষ্টা ক'রো, তোমার ভাল যা' আছে তা' দিয়েও তাঁকে নন্দিত করতে চেষ্টা ক'রো। এককথায়, তুমি তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে যাতে ইষ্টতৃপ্তিকৃৎ ও ইষ্টকর্ম্মকৃৎ হ'য়ে চলতে পার, তাই ক'রো। এই তপস্যায় আলস্য ও তন্দ্রার প্রশ্রয় দিও না। সঙ্গে-সঙ্গে আর সবাই যাতে তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে, সেদিকেও নজর রেখো। ইষ্টভৃতি ও মন্ত্রজপাদি অর্থাৎ নাম-ধ্যানাদি নিরিবিলিতেই হো'ক আর তোমার কর্ম্মের ভেতরেই হো'ক —তা' করবেই কি করবে। আর, ইষ্টভরণ ও ইষ্টকরণকে তোমার মূল জীবনদাঁড়া ধ'রে নিও। যদি এমন ক'রে চল, কিছুদিন চলতে-চলতে দেখবে—দোষগুলির নিরসন হ'য়ে গুণ-সমৃদ্ধিই তোমার চরিত্রগত হ'য়ে উঠছে, তোমার ঐ দেবদ্যোতনা কত হৃদয়কে যে উচ্ছল ক'রে তুলছে তার ইয়ত্তা নেই। ঐ ঊর্জ্জী দীপনা তোমার হৃদয়কে উচ্ছল ক'রে কৃতি-চলন-বিভূতি নিয়ে ইষ্টার্থে বিন্যস্ত হ'য়ে উঠুক, স্বভাব তোমার স্বর্গ-সুরভিতে ভ'রে উঠুক। চরিত্রগত এই সম্পদ্ই তোমার বস্তুগত সম্পদ্কে আবাহন করবেই কি করবে। আর, এতে শুধু তুমি বড় হবে না, পরিবেশ-শুদ্ধ বড় হ'য়ে উঠবে। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। পরিবেশকে যদি টেনে না তুলি, তাহ'লে পরিবেশই যে টেনে নাবাবে। একক উন্নতির তাই স্থায়িত্ব কি? বুদ্ধিমান যারা, তারা পাকাপোক্ত উন্নতির বনিয়াদই গেঁথে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ একটি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অমৃতি করে কী ক'রে রে?

মা-টি বললেন—তা' তো ঠিক জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আর কি করলি?.................এক মা একবার অমৃতি আনিছিল, যেমন খাস্তা, তেমনি ভিতরে রসে টাপুর-টুপুর। অমন অমৃতি আর খাইনি।

এরপর নানাস্থানের নানারকম মিষ্টি সম্বন্ধে রসাল আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। সকলেই মহাখুশি হ'য়ে অসঙ্কোচে নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা বলতে লাগলেন। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বৃদ্ধ, যুবা, অভিজাত, সাধারণ—সব ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হ'য়ে যেন এক অভিনব বৈশিষ্ট্যপালী সখ্যসেতু রচিত হয়েছে দয়ালের দরবারে। এই পরিবেশে তাই মানুষ সহজ হয়, সুস্থ হয়, হয় দৈন্যমুক্ত, আবরণ ও আভরণ-বজ্জিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দায় তক্তপোষে

উপবিষ্ট। লোকের ভীড় লেগেই আছে।

কানাইদা (গঙ্গোপাধ্যায়) বললেন—ঠাকুর! আপনি বলেন, initiation (দীক্ষা) আমাদের fundamental work (মূল কাজ), কিন্তু ইদানীং প্রত্যেক ঋত্বিক্-অধিবেশনে এতরকম কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় ঋত্বিক্দের উপর যে সেইসব দিকে লক্ষ্য দিতে গিয়ে initiation (দীক্ষা) আর হ'য়ে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, মাথার হজমশক্তি কমে গেলে এমনতর হ'তে পারে, নইলে তো এমনতর হবার কথা নয়। কাজগুলি interlinked (পরস্পর সম্বদ্ধ) ও interfulfilling (পরস্পর পরিপূরক)। প্রত্যেকটা কাজ করতে গিয়ে ভেবে দেখতে হবে, অন্য যা'-যা' করণীয় আছে, তা' তার ভিতর-দিয়ে কতখানি enhanced (অগ্রসর) হ'তে পারে। সব কাজের বেলায়ই এমনতর। এমনকি সাংসারিক কাজকর্ম্ম আপনারা যখন করবেন তার ভিতরও লক্ষ্য রাখবেন, তার ভিতর-দিয়ে আপনার ইষ্টার্থী করণীয়গুলির কতখানি সুসার ক'রে নিতে পারেন। হয়তো বাড়ীর জন্য কয়লা কিনতে গেছেন কয়লার গোলায়, দোকানদারের সঙ্গে ভাবসাব ক'রে এমনভাবেই হয়তো তাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত ক'রে নিলেন যে, তার মাধ্যমেই আশ্রমের জন্য অজস্র কয়লা সংগ্রহের একটা পথ ক'রে ফেললেন। শুধু কয়লা সংগ্রহ ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, লোকটার যাতে সত্যিকার উপকার হয়, সেইজন্য তাকে ইষ্টপথ অর্থাৎ মঙ্গলের পথ ধরিয়ে দিলেন। খেয়াল থাকলে এমন কোন কাজ নেই যা'র ভিতর-দিয়ে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা না করা যায়। সব সময় ঐ plane-এ (ভাব-ভূমিতে) থাকা লাগে। আমরা বৃত্তিসেবী যতক্ষণ, ততক্ষণ watertight compartment-এ (নীরন্ধ্র প্রকোষ্ঠে) ঘুরি। একটা নিয়ে থাকলে আর পাঁচটার খেই হারিয়ে ফেলি। সেই একটার ভিতর-দিয়ে আরো পাঁচটার সুরাহা কতখানি করা যায়, তা' আমাদের মাথায় খেলে না। তাই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন একপেশে নানা চিন্তা ও চলনে অভ্যস্ত হই। এতে জীবন-সম্বেগ, চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি সংহত হ'য়ে ওঠে না। ফলে, আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশও ব্যাহত হয়। কিন্তু কেউ যখন ইষ্টে with being (সত্তা নিয়ে) interested (অন্তরাসী) হ'য়ে ওঠে, তার এই খণ্ডিত চলন তখন ঘুচে যায়। সব সময়ই সে তখন ইষ্টের মানুষ, তাই প্রতিটি যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে ইষ্টার্থী সুযোগ-সুবিধা কতদিকে কতখানি ক'রে নেওয়া যায় এই ধ্যানই নিরন্তর চলতে থাকে তার মাথায়। তাই সে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর সম্ভাবনা দেখে। হতাশ হয় না কখনও। এইভাবে তার creative genius (সৃজনী প্রতিভা) evolve করে (বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে)। সে শুধু চিন্তায় চোস্ত হয় না, চিন্তাকে বাস্তব মূর্ত্তি দেবার জন্য তার motor nerves (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ুগুলি) এক পায়

খাড়া হ'য়ে থাকে। এইভাবে effective personality (কার্য্যকরী ব্যক্তিত্ব) যাকে বলে তাই হ'য়ে ওঠে মানুষ। স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগে মানুষ যেমন এমনতর হ'য়ে ওঠে, তেমনি আবার অনুরাগের ছিটেফোঁটাও যদি থাকে, এবং তাই নিয়ে যদি ইষ্টার্থী বহুমুখী গুরু দায়িত্ব উদ্‌যাপন করতে থাকে, তার ভিতর-দিয়েও মানুষ অজ্ঞাতে grow করতে (বাড়তে) থাকে।

করুণাদা (মুখোপাধ্যায়)—আমরা যে তাল সামাল দিতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদিনে কি পারা যায়? পারার চেষ্টায় থাকলে, তার ভিতর-দিয়েই পারার পথ খোলে। তোরা 'পারি না' 'পারি না' করিস, কিন্তু আমি তো দেখি, তোরা যা' পারিস, তার তুলনা হয় না। তবে পারার অন্তরায়গুলিকে ভিতরে পুষে রাখতে নাই কখনও। কোন্ deficiency (খাঁকতি)-র দরুন পারায় ব্যাঘাত ঘটছে, সেটা ধ'রে ফেলা চাই, এবং যেন-তেন প্রকারেণ তার প্রতিকার করা চাই। শালার 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। অরি বলতেই কিন্তু নিজস্ব দোষ, দুর্ব্বলতা ও খাঁকতি। এই অরিকে যদি কাবেজে আনতে পার, অরিন্দম যদি হ'তে পার, তাহ'লে অপরাজেয় কিন্তু তোমরা জগতে। তোমাদের অনেকের শরীর কিন্তু অপটু। বাইবেলে আছে, 'Spirit is willing but flesh is weak.' (আত্মা আগ্রহশীল, কিন্তু রক্ত-মাংস দুর্ব্বল)। Flesh (শরীর) weak (দুর্ব্বল) রাখলে চলবে না, তাকে strong (সবল) ক'রে তুলতেই হবে। চেষ্টা থাকলে শরীর অনেকখানি ঠিক ক'রে নেওয়া যায়। Active will-power-এ (সক্রিয় ইচ্ছাশক্তিতে) সব হয়।

অক্ষয়দা (পুতুতুণ্ড)—Active will-power (সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি) বলতে কী বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিল্বমঙ্গলের কথা জানেন তো? সে কেমন ক'রে ঝড়জলের রাত্রে মড়া ধ'রে নদী পার হ'য়ে গেল, বাড়ীর দরজা বন্ধ, শেষটা গবাক্ষের কাছে সাপ ঝুলছে, সেই সাপের লেজ ধ'রে গবাক্ষপথ বেয়ে চিন্তামণির কাছে যেয়ে হাজির হ'লো। এই অসম্ভবকে সে সম্ভব করলো কী ক'রে? এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারল, তার কারণ, ভাল হোক মন্দ হোক, চিন্তামণির প্রতি ছিল তার একটা একাগ্র সম্বেগ। এই সম্বেগে তার ইচ্ছাটা হ'য়ে উঠল অকাট্য—কোন বাধা সে মানতে নারাজ। ইষ্টের প্রতি ঐ-রকম নেশা হ'লে, অবাধ্য অনুরাগ হ'লে, শরীর তখন আপনা থেকে পথে আসে। তখন এমন একটা vital flow (জীবনী-প্রবাহ)-এর outburst (আবির্ভাব) হয় যে, চিমসে শরীরে যেন হাজার হাতীর বল দেখা দেয়। Unending energy (অফুরন্ত শক্তি)-র যোগান পায় সে। কিন্তু সবার তো এমনটি হয় না। তা' না হ'লেও, ইষ্ট ও ইষ্টকর্ম্ম যার প্রিয়, সে ইষ্টার্থে তার শরীর ধীরে-ধীরে সুস্থ ও সহনপটু ক'রে তুলতেই চেষ্টা করে। আহার, বিহার, চিন্তা, চলন এমনভাবে করে না,

যাতে অসুস্থ হ'য়ে পড়তে হয়। সুস্থ হওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন will to health and life (স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি আগ্রহ)। Will to illness (অসুস্থতার ইচ্ছা) আদৌ যদি না থাকে, তাহ'লে মানুষ অসুস্থ হয় কি-না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। Will to illness (অসুস্থতার ইচ্ছা) অনেকে inherit করে (পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত হয়)। তাদের mental make-up (মানসিক গঠন)-ই হয় অমনতর। তারা অল্পতেই ভেঙ্গে পড়ে, তাদের ইচ্ছা-শক্তি হয় দুর্ব্বল। সাধারণতঃই তারা রুগণ হয়। এই attitude (মনোভাব) overcome (অতিক্রম) করা কঠিন ব্যাপার। আবার, অনেকে সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রিয়জনের বেদরদী ব্যবহারে, আশাভঙ্গে, অবসাদে শরীর-মনে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে, তাদের বাঁচার আগ্রহ যায় শিথিল হ'য়ে, আহার-বিহার-চিন্তা-চলনে আসে অনিয়ম, এমনি ক'রে ধীরে-ধীরে তারা রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। বহুক্ষেত্রে এমনতর দেখা যায়। অবশ্য বাইরের আগন্তুক infection-এ (সংক্রমণে) এবং অজ্ঞতার দরুন শারীরিক বিধি পালন না করায় যে মানুষ অসুস্থ না হয়, তা' নয়। কিন্তু ইষ্টের প্রতি টান যাদের থাকে, health ও longevity (স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু) সম্বন্ধে serious (অবহিত) যারা, তাদের সে সম্ভাবনা কমই থাকে। তবে শরীর রুগ্ণ হ'লেও মানুষ যদি রোগমুক্ত হ'তে চায় আন্তরিকভাবে, এবং তাই-ই যদি ক'রে চলে যাতে রোগমুক্ত হওয়া যায়, তাহ'লে অনেকখানি সুস্থ যে হ'য়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়, যিনি যত বড় চিকিৎসকই হউন না কেন, তিনি যদি রোগীর willing co-operation (সক্রিয় সহযোগিতা) লাভ করার কৌশল না জানেন, তিনি যদি তার will to health (স্বাস্থ্যের প্রতি ইচ্ছা) excite (উদ্রিক্ত) করতে না পারেন, তবে তার চিকিৎসা স্থায়ী সুফল প্রসব করবে কমই। তাই ডাক্তারী course (পাঠ্য)-এর সঙ্গে practical psychology (বাস্তব মনোবিজ্ঞান) compulsory (আবশ্যক) হিসাবে পড়ানো উচিত। আবার, যতই পড়ুক, মানুষের প্রতি যদি দরদ না থাকে, তাহ'লে কিন্তু insight (অন্তর্দৃষ্টি) খোলে না।

পাবনা থেকে একজন ডাক্তারের কাজলকে দেখতে আসবার কথা। ভূপেশদা গাড়ী নিয়ে তাঁকে আনতে গেছেন। অনেকক্ষণ গেছেন এখনও ফেরেন না দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও প্যারী! ভূপেশ ফেরে না ক্যান্? ডাক্তারবাবু আসবি তো?

প্যারীদা (নন্দী)—না আসার তো কোন কারণ দেখি না। আর যদি না আসতেন তাহ'লে ভূপেশদা ফিরে আসতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও বটে।

প্যারীদা—ডাক্তার এসে নতুন কিছু বলার নেই। তবু আপনার satis-

faction (সন্তোষ)-এর জন্য আসাই ভাল। তবে কাজল এখন completely out of danger (সম্পূর্ণভাবে সংকটজনক অবস্থা থেকে মুক্ত)। আমি, মাষ্টারমহাশয় (শশিভূষণ মিত্র), ডাক্তারবাবা (গোকুলচন্দ্র মণ্ডল), কালীদা (সেন), জিতেনদা (চট্টোপাধ্যায়) thoroughly (ভালভাবে) দেখেছি ও নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি, কোন ব্যাপারে করার খাঁকতি যেন একচুলও না থাকে। কোন-কিছু সম্বন্ধে যখনই মনে হয়, এইটুকু করলে হ'তো, তখন সেটুকু ক'রেই ফেলতে ইচ্ছা করে। নইলে অন্তরে যেন খুঁতখুঁত করে। সম্ভাব্য করণীয় যা, তাতে এতটুকুও ফাঁক থাকে, সে আমার ভাল লাগে না। অনেকে মনে করে বাড়াবাড়ি। আমি ভাবি, অধিকন্তু ন দোষায়। মানুষের জীবনটা অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তায় ভরা। তাই বিধিমাফিক করার বাঁধন যত বেশী দেওয়া যায়, ততই ফস্‌কে যাওয়ার ভয় কম থাকে।

প্যারীদা—যত বেশী ভাবা যায়, ততই তো মানুষের উদ্বেগ বাড়ে। সেইজন্য যতটুকু করণীয় সেইটুকু ক'রে ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকাই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করণীয়-সম্বন্ধে বোধ ও জ্ঞান কিন্তু সবার সমান নয়। যার জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ যতখানি, করণীয়-সম্বন্ধে তার ধারণাও ততখানি। যার ধারণায় যতখানি ব্যাড়ে পায়, তার ততখানি করাই তো উচিত। ভগবানের এক নাম বিধি। বিধিকে আমরা যতখানি ভরণ করি, পূরণ করি, পালন করি, পোষণ করি—এক কথায় আমরা যতখানি বিধিমাফিক চলি, ততই আমাদের নির্ভরতা নিখুঁত হয়, এবং তখন তো আমরা বিহিত ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত বা নিশ্চিন্ত হ'তে পারিই। এর মধ্যে আলস্য বা অ-করার স্থান কোথায় তা' তো বুঝতে পারি না। পরমপিতার দয়ায় জগৎ বিধৃত হ'য়ে আছে, কিন্তু এই ধৃতির পিছনে আছে বিহিত কৃতি বা করণ। তাই, করণ ছাড়া ধরণ বা ধর্ম্ম নেই। ধর্ম্মরাজ্যে আলস্যের আসর নেই, ফাঁকিজুকির কারবার নেই। আছে continued, responsible, regulated, enthusiastic, active tenor (দায়িত্বপূর্ণ, উৎসাহদীপ্ত, অবিরাম, বিহিত কর্ম্মমুখরতা), and that to feed and fulfil the Superior Beloved (এবং তা' প্রেষ্ঠের ভরণ ও পূরণার্থে)।

কলকাতা থেকে সদ্য আগত একটি দাদা হাসতে-হাসতে বললেন—ঠাকুর! ভাবের ঘরে চুরি ক'রে যে মনে একটু সান্ত্বনা লাভ করব, তেমন একটু আশ্রয় পর্য্যন্ত আপনি আমাদের জন্য রাখছেন না। আপনি সব smash (ধূলিসাৎ) ক'রে দিচ্ছেন। এমন হ'লে আমরা কী নিয়ে থাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুরও সহাস্যে উত্তর দিলেন—তোমাদের থাকাটা যাতে পাকা হয়,

বালুর বাঁধের মতো তা' যাতে ধ্ব'সে যেতে না পারে, সেইজন্যই তো প্রচলিত ভ্রান্তির আবরণ আমার খুলে দিতে ইচ্ছা করে। পরমপিতার দয়া তো আছেই, তা' না হ'লে তুমি, আমি আছি কি ক'রে, আমাদের অস্তিত্ব সম্ভব হ'লো কী করে? সেই দয়ার দোহাই দিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে আমরা যদি অজ্ঞতা ও মূঢ়তার সেবা করতে থাকি, তাঁর দিকে উন্মুখ না হই, আমাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তন্মুখী চলনে যদি না চলি, তবে তাঁর দয়ার দরিয়ার মধ্যে ডুবে থেকেও তো তার একবিন্দুও আমরা গ্রহণ করতে পারব না। তাই এত ক'রে বলা, এত ক'রে সাবধান ক'রে দেওয়া। রামকৃষ্ণঠাকুরও নাকি বলতেন—তাঁর কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না! আমি বুঝি—ঐ পাল তুলে দেওয়ার মধ্যে আছে, আমাদের করণীয় যা' তা' করার কথা, তাঁর পালন-উচ্ছল হ'য়ে চলার কথা। না করলে কিছু হয়টয় না বাপু! তুমি যত বড় বিদ্বানই হও আর তোমার ছেলের প্রতি তুমি যত সদয়ই হও, তোমার বিদ্যাটাকে কি তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পার, যদি সে তোমার প্রতি উন্মুখ না হয় এবং বিদ্যার্জ্জনের জন্য যা'-যা' করণীয় তোমার কথামত তা' না করে? তাহ'লেই বোঝ—পরমপিতা তাঁর অফুরন্ত দয়ার ভাণ্ডার নিয়ে কতখানি কী করতে পারেন আমাদের।

গ্রামের কয়েকজন মুসলমান এসে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আশ্রম-প্রাঙ্গণে। শ্রীশ্রীঠাকুর এত লোকের মধ্যে তাদের লক্ষ্য ক'রে তাদের উদ্দেশ্যে দূর থেকে প্রীতিভরে উঁচুগলায় বললেন—কী রে! তোরা কিছু ক'বার চাস নাকি?

ওরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রীতিমধুর আত্মীয়সুলভ আহ্বান পেয়ে যেন বেঁচে গেল। কিছুসময় ইতস্ততঃ করছিল, বলবে কি বলবে না, এতলোকের ভিড় ঠেলে কিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে নিজেদের অভাবের কথা বলবে। এইবার ওদের প্রাণে জল আসলো। সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বলল—আমাদের বাড়ীতে সবার কাপড়-চোপড় ছিঁ'ড়ে গেছে। আপনি যদি দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সস্নেহে)—কতগুলি লাগে?

নিজেদের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি ক'রে ওরা প্রকাশ্যে বলল—ব্যাটাছাওয়ালের ৫ জোড়া আর মিয়েদের ৬ জোড়া হ'লে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অক্ষয়দাকে (পূতত্তুণ্ড) বললেন—দেখেন তো দেখি পারেন নাকি..............ওদের দিকে চেয়ে বললেন—যা', এই বাবুর সঙ্গে যা'। বাবুর বড় দয়ার শরীল।

ওরা খুশি মনে অক্ষয়দার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর দূরে দিগন্তের দিকে চেয়ে কিছু সময় চুপচাপ ব'সে রইলেন। বিশ্বদুনিয়ার জন্য তাঁর কত কী ভাবনা আমরা তার কী বুঝব? আমরাও ব'সে আছি চুপচাপ। ছেলেপেলেরা আশ্রম-প্রাঙ্গণে আনন্দে কলকল্প করছে। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বালকের মতো ঈষৎ একটু

হাসলেন। তাঁর মুখের কোণের শুভ্র সেই হাসির রেখাটুকু উপস্থিত সকলকে মুহূর্ত্তেই পুলকচঞ্চল ক'রে তুলল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল নয়, তা'ছাড়া অনেক সময় ধ'রে কথা বলতে-বলতে খানিকটা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন বিবেচনায় প্যারীদা তাঁর হাত-পা টিপে দিতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, আমাদের দেশে আগে ৬৪ কলার চর্চ্চা হ'তো। গা-হাত-পা টেপার কৌশলও নাকি সেই ৬৪ কলার অন্যতম। তখন জীবনের সমস্ত বিভাগেই চলত নিরন্তর গবেষণা ও অনুশীলন। প্রত্যেকটি দিককেই কতখানি উন্নত ক'রে জীবনের পক্ষে সুখাবহ ক'রে তোলা যায়, সেই ছিল চেষ্টা। উন্নতিমুখী সেই প্রয়াস আমাদের মধ্যে আজ কমই দেখা যায়। এটা হ'লো ধর্ম্মের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর, ধর্ম্ম মানেই ধারণ-পালনী বিধির পরিচর্য্যা।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—এইসব কলার চর্চ্চা আমাদের দেশে লোপ পেল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে ব'সে বললেন—জীবনের প্রতি অনুরাগ মানুষের যত ক'মে যায়, জীবনবর্দ্ধনী বহুমুখী অনুশীলনও তত স্তিমিত হ'য়ে ওঠে। মানুষের জীবনটা উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে প্রেষ্ঠ-প্রীতির সূত্র ধ'রে। এই শ্রেয়ানুরাগ মুখ্য না হ'য়ে জাতির জীবনে যখন কতকগুলি নেতিবাচক ভাবনা প্রাধান্য লাভ করে, তখন মানুষের কর্ম্মশক্তি পঙ্গু হ'তে থাকে। তারা উৎসাহ পায় না, আশা পায় না, ভরসা পায় না, কাজের সার্থকতা খুঁজে পায় না। শঙ্করের মায়াবাদ কী, তা' আমি ভাল ক'রে জানি না, যতটুকু শুনেছি তাতে ভাল ক'রে বুঝতেও পারি না। কিন্তু তা' যে আমাদের দেশে খুব সুফল প্রসব করেছে, আমার তেমনতর মনে হয় না। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বলে কিন্তু ব্রহ্ম যদি সত্য হন, তাহ'লে জগৎ মিথ্যা হ'তে যাবে কেন? জগৎ পরিবর্ত্তনশীল এ-কথা সত্য, কিন্তু যার গতি আছে, যে চলছে, সে অস্তিত্বহীন এ-কথা মানি কী ক'রে? তবে এভাবে যদি কেউ বলেন যে, চলার ভিতর-দিয়ে চলমান যে, সে বৃদ্ধির দিকে কতখানি এগুচ্ছে, এইটেই হ'লো আসল কথা। চলন যদি বর্দ্ধনের কারণ না হ'য়ে ক্ষয়েরই কারণ হয়, তবে সে-চলন নিরর্থক অর্থাৎ মিথ্যারই সামিল, তার মানে আমি বুঝতে পারি। ব্রহ্মের মধ্যে আছে বৃদ্ধি আর জগতের মধ্যে আছে গতি। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই কথার থেকে আমার ভাল লাগে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। জগতে বৃদ্ধির পরিপন্থী যদি কিছু থাকে তাকেও বৃদ্ধির অনুকূল ক'রে তুলতে হবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ-সৌকর্য্যে। তাকেই বলে ধর্ম্ম, তাকেই বলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন।

কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) যা' মূলতঃ বৃদ্ধির প্রতিকূল, তাকে কি কখনও

বৃদ্ধির সহায়ক ক'রে তোলা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন-কিছুর ভালমন্দ নির্ভর করে, তার প্রয়োগ বা ব্যবহারের উপর। প্রবৃত্তিগুলি কত অনর্থের সৃষ্টি করে, আবার, সেই প্রবৃত্তিগুলির যদি সুসমীচীন ব্যবহার করা যায়, তাহ'লে তারা কতখানি কল্যাণপ্রসূ হ'য়ে ওঠে। আপনার হয়তো দুঁদে স্বভাব, কিন্তু এই স্বভাবটা যদি অন্যায়, অসৎ বা কৃষ্টি-বিরোধী যা' তার নিরোধে লাগান, তার ফল কি খারাপ হবে? সাপের বিষ তো অত্যন্ত ক্ষতিকর, কিন্তু সেই সাপের বিষ আবার কতরকম ওষুধে লাগে —যা' একক্ষেত্রে জীবন নাশ করে, অন্যক্ষেত্রে তাই-ই আবার জীবন রক্ষা করে—নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান, সমাবেশ ও প্রয়োগের উপর নির্ভর ক'রে। ব্রহ্মজ্ঞানী সাজতে গিয়ে সব যদি আবার একাকার ক'রে ফেলেন তাহ'লে কিন্তু মুশকিল আছে। রামকৃষ্ণ-কথামৃতের গল্প শুনেছি। এক গুরু তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, সবই নারায়ণ। একদিন এক রাস্তা দিয়ে এক হাতী আসছে। হাতীটা ছিল বেশ রাগী। হাতীটাকে দেখে শিষ্য তো দূর থেকে উল্লাসে এগিয়ে আসছে। হাতী যখন নারায়ণ, তখন সে তো তার কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু মাহুত ওকে ঐভাবে আসতে দেখে দূর থেকেই সাবধান ক'রে দিচ্ছে, 'রাস্তা থেকে স'রে যাও! রাস্তা থেকে স'রে যাও। হাতী বড় রাগী, সামনে আস্‌লে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারবে।' সে কথা কে শোনে? সে ভাবে, গুরুদেব যখন ব'লে দিয়েছেন সবই নারায়ণ, সে-কথা কি কখনও মিথ্যা হ'তে পারে? এই ভেবে মাহুতের কথায় কর্ণপাত না ক'রে নাচতে-নাচতে হাতীর সামনে এগিয়ে এল। যেই সামনে আসা অমনি হাতীটা তাকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে মারল এক আছাড়। আছাড় খেয়ে উঠে গুরুদেবের কাছে যেয়ে অনুযোগ জানাল, 'ঠাকুর! আপনি বলেছেন সবই নারায়ণ, কিন্তু হাতী-নারায়ণ আমাকে এইভাবে আছাড় মারল কেন?' গুরুদেব তখন সব বৃত্তান্ত বিস্তারিত শুনে বললেন—'হাতী যদি নারায়ণ হয়, তাহ'লে মাহুতও তো নারায়ণ, মাহুত-নারায়ণ যে তোমাকে সাবধান ক'রে দিল, তার কথা কেন শুনলে না?' শিষ্য তখন নিরুত্তর। আমরাও যদি তেমনি যা'-কিছু ব্রহ্ম এই ভেবে প্রতিটি যা'-কিছুর শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-নির্দ্ধারিত বৈশিষ্ট্যজ্ঞান হারিয়ে বেহেড্ চলনায় চলতে থাকি, তাহ'লে তা' কিন্তু হবে সমূহ বিপদেরই কথা। সংস্কারের নাম ক'রে তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞানীরা যে অনেকে বর্ণগত বৈশিষ্ট্য, কুলগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে যথেচ্ছ বিবাহ ও একঢালা আচারের প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছেন, তার ফল কিন্তু আদৌ ভাল হয়নি। এর পিছনে কোন গভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আছে ব'লেও মনে হয় না। একটা কেমিষ্ট্রীর লেবরেটরীতে যদি একটা শিশুকে ছেড়ে দেওয়া যায়, এবং সে যদি খেলাচ্ছলে আপন মনে নানা বোতলের জিনিস ঢালাঢালি ক'রে মেশাতে থাকে, তাহ'লে তার ভিতর-

দিয়ে যেমন বিপর্য্যয়ী কান্ড ঘটতে পারে, অবাধ বিবাহপ্রথা যদি চালু হয় দেশে, তবে তার ভিতর-দিয়ে ততোধিক বিপর্যয় ঘটা অবশ্যম্ভাবী। Chemical combination (রাসায়নিক মিশ্রণ)-এর ব্যাপারে যেমন প্রত্যেকটি chemical substance (রাসায়নিক পদার্থ)-এর property (সম্পদ্) ও character (চরিত্র) জানতে হয়, এবং তারপর বিহিতভাবে সংমিশ্রণ ঘটাতে হয়, নারী-পুরুষের বিবাহ-ব্যাপারেও তেমনি উভয়ের কুলগত ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হ'য়ে তাদের মিলন কতখানি শুভাবহ হ'তে পারে এবং সুপ্রজননের দিক দিয়ে তা' কতখানি সার্থক হ'তে পারে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা ক'রে বিধিবদ্ধভাবে ঐ যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয়। বিবাহের সঙ্গে জড়ান আছে জনন ও জাতি। তাই, এই নিয়ে ছেলেখেলা করা সর্ব্বনাশা ব্যাপার। মাহুত-নারায়ণের কথা যেমন শোনা দরকার, শাস্ত্র ও বেত্তা-নারায়ণের কথাও তেমনি শোনা দরকার।

একটি মা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা সত্ত্বেও স্বামী যেখানে স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করে, সেখানে স্ত্রী কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কথাই তো বলছিলাম। প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য দেখে বিয়ে না দিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই জীবন বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়। তুমি তোমার ধারণা-অনুযায়ী হয়তো ভাল ব্যবহার করছ, কিন্তু স্বামীর হয়তো অনুযোগ—আমি যা' চাই, আমি যেমনটা পছন্দ করি, আমার স্ত্রী কিছুতেই তেমনভাবে চলে না, সে তার নিজের খেয়ালমত চলে, আমি তাকে নিয়ে আর পারি না। বড়জোর হয়তো বলবে, আমার স্ত্রী এমনি মানুষ ভাল, কিন্তু আমি কিসে খুশি হই, আমি কিসে ভাল থাকি, তা' বোঝে না। তার নিজের এক ধরণ আছে, সেই ধরণে চলে। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, স্ত্রীর মত স্ত্রীও খারাপ নয়, স্বামীর মত স্বামীও খারাপ নয়। উভয়েরই ভাল লোক ব'লে সুনাম আছে বাইরে, সবার সঙ্গেই তাদের ব্যবহার ভাল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে আর কিছুতেই বনিবনা হয় না। বিয়ে-থাওয়ায় এমনতর গরমিল যদি কোথাও ঘ'টে গিয়ে থাকে, সেখানে স্ত্রীর স্বামীর প্রকৃতিটা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত এবং স্বামীর যাতে ভাল লাগে ও ভাল হয় নিজের ব্যবহার সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করা উচিত। একটা জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, আমি ইট, কাঠ বা পাথরের সঙ্গে ব্যবহার করছি না। যার সঙ্গে ব্যবহার করছি তার একটা রুচি আছে, পছন্দ আছে, প্রকৃতি আছে, মেজাজ আছে, ধরণ আছে। বদ্যি যেমন নাড়ী টিপে ধাত বুঝে ওষুধ দেয়, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের দাওয়াইও তেমনি ধাত বুঝে প্রয়োগ করতে হয়। এক কথায়, মানুষের মন-মেজাজ বুঝে চলতে হয়। এমনটি যদি না চলতে পার তবে তোমার ভালোর ধারণা নিয়ে আবদ্ধ হ'য়ে থাকলে তুমি কিন্তু কখনও মানুষের মন পাবে না।

শুধু স্বামীর সঙ্গে ব্যবহারেই এমনতর নয়। প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহারেই চোখ, কান, মন খোলা রেখে চলবে। নজর করবে, কে কখন কী অবস্থায় আছে। তাই বুঝে যখন যা' বলার বলবে, যা' করার করবে। তুমি হয়তো মনে করে রেখেছ, স্বামীর কাছে সংসারের একটা প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আব্দার করবে। স্বামীর মন কেমন তা' লক্ষ্য না ক'রে তুমি তোমার চিন্তার সম্বেগ-অনুযায়ী এমন সময়ই হয়তো কথাটা তাকে বললে যখন তার মন নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। তখন সে তো চটবেই। আবার, তুমিও বলবে—আমি তো নিজের জন্য কিছু চাইতে যাইনি, সংসারের জন্য দরকার, সেই দরকারী জিনিসটার কথা বলতে যেয়ে কত কথা শুনলাম। যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। আমার ভাল কথাটাও তোমার গায় সয় না। এই বেধে গেল আর কি লাঠালাঠি। পরস্পর হিসাব ক'রে না চলার দরুন অনেক গোলমালের সূত্রপাত হয়। মেয়েদের বিশেষ-বিশেষ শারীরিক অবস্থায় বিশেষ-বিশেষ মেজাজের সৃষ্টি হয়, সেটা হ'লো সাময়িক ব্যাপার এবং শারীরিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত। পুরুষ-ছেলের এটা সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান না থাকে এবং তখনকার স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্যের দরুন যদি অযথা শাসন ও তাড়না করতে যায়, তাহ'লে কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটে। আবার, স্বামী হয়তো ফিট্‌ফাট, ছিমছাম থাকা পছন্দ করে, কিন্তু স্ত্রী হয়তো অগোছাল, অপরিচ্ছন্ন রকমে চলতে অভ্যস্ত। সেখানে স্ত্রীর ঐ চলনে স্বামীর তো অসন্তুষ্ট হবার কথাই।

মা-টি অকপটে বললেন—আমার ঐ দোষটি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষ যদি বুঝে থাকিস, তবে সেরে ফ্যাল্। যা'. করলে শরীর-মনের পক্ষে ভাল হয়, ছেলেপেলে ভাল থাকে, স্বামীরও মনোরঞ্জন হয়, তা' তো করাই লাগে। আর, তোকে একটা ছোট্ট তুক শিখিয়ে দিচ্ছি। স্বামীর কাছে সব সময় নত থাকবি। যুক্তিতর্ক দিয়ে কারও মন জয় করা যায় না। তোর যদি কখনও মনেও হয় যে, স্বামী তোর সঙ্গে অকারণ দুর্ব্যবহার করেছে, তাও বলবি—আমি কথাটা বলতে চেয়েছিলাম ভাল, কিন্তু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে না পারায় তোমার অশান্তির কারণ হয়েছি। ত্রুটি আমারই। এইরকম যদি করতে পারিস তাহ'লে দেখতে পাবি, স্বামীর সব রাগ গ'লে জল হ'য়ে যাবে। একটা জায়গায় কেবল স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারিস—অর্থাৎ যদি দেখিস, স্বামী তাঁর মা, বাবা বা গুরুজনের সঙ্গে অসমীচীন ব্যবহার করছে, সেখানে কখনও কিন্তু স্বামীর সমর্থন করতে যাবি না, শ্বশুর-শাশুড়ীর পক্ষ হ'য়ে সেখানে ন্যায্য প্রতিবাদ করবি। স্বামীর মঙ্গলের জন্যই এটা করা দরকার। অনেক স্ত্রী তাদের স্বামীকে তাদের গুরুজন ও আপনজন হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেদের আঁচলধরা ক'রে রাখতে চায়। ভাবে, আমরা স্বামী স্ত্রী ছেলে-

পেলেদের নিয়ে সুখে থাকতে পারলে হ'লো, আর চাই কী? কিন্তু এতে যে স্বামীর প্রতি ও নিজের প্রতি শত্রুতা করা হয়, এ-কথাটা বোঝে না। স্বামীর প্রতি শত্রুতা এইদিক দিয়ে যে, স্বামী যাদের দিয়ে, যাদের নিয়ে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যহীন ক'রে তুললে সে ধীরে-ধীরে অমানুষ হ'য়ে পড়ে, তার জগৎটা হ'য়ে যায় সংকীর্ণ; কারণ, যে নিজের মা, বাপ, ভাইবোনকে ভালবাসতে পারে না, তাদের প্রতি কর্ত্তব্য করতে পারে না, সে দেশ ও দশকে ভালবাসবে, তাদের জন্য করবে, এ একটা মিছে কথা। অমনতর যারা তারা বড় জোড় তথাকথিত politics (রাজনীতি) করতে পারে নাম-চেতানর জন্য, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। অন্তরের আসল বিস্তার তাদের কিছু হয় না। আর, এদের আত্মপ্রসাদ ব'লেও কিছু থাকে না। যাদের খুশি ক'রে, যাদের আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ লাভ ক'রে মানুষ বড় হবার প্রেরণা পায়, তাদের প্রতি টানই যদি ছিঁড়ে যায়, তবে তার সম্বল কি রইল জীবনে তা' তো বুঝি না। ওইভাবে রিক্ত ও নিঃসম্বল ক'রে দিল যে তাকে মনোজগতে, তার প্রতি একদিন তার আক্রোশ আসাও অসম্ভব না। তখন ঐ স্ত্রীকে সে হয়তো দুই চক্ষে দেখতে পারে না। ভাবে, ঐ ডাইনী আমার সর্ব্বনাশ করেছে। আমার মা-বাবা-ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে আমাকে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে ফেলেছে। ও আমাকেও চায় না। ও চায় আমাকে দিয়ে ওর নিজের খেয়াল পূরণ করতে। এটা প্রকারান্তরে নিজের প্রতি শত্রুতা করা নয় কি? তা' ছাড়া, যে ছেলেপেলের সুখসুবিধার দিকে চেয়ে অমন করে, তাদেরও কি ভাল হয়? যে সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দীক্ষা তাদের দেয়, তার ফলে তারাও তো পরস্পরকে ভালবাসতে শেখে না। কালে-কালে তারাও তো মা-বাবা ও ভাই-বোন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। যেমনতর বীজ বোনা যায়, তেমনতর ফলই তো ফলবে। তখন হয়তো দেখবে, তোমার একটি ছেলে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাচ্ছে আর একটি ছেলে পথে-পথে না খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে তাকে একমুঠি ভাত দিচ্ছে না। দিতে চাইলেও তার স্ত্রীর ভয়ে পারছে না। এই অবস্থা দেখলে তোমার কি ভাল লাগে? কিন্তু এই অবস্থাটার সৃষ্টি করলে তো তুমি!

মা-টি সঙ্কুচিত হ'য়ে বললেন—ঠাকুর! আপনি আর বলবেন না, শুনে বড় ভয় করে। মেয়েমানুষ বোকা জাত, তাদেরই কি যত দোষ? মেয়েমানুষ ভুল ক'রে যদি স্বামীকে বাপ-মার থেকে নিজের দিকে টানতে চায়, তাহ'লেই স্বামীও কি সেই ভুলে সায় দেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো দেওয়া উচিতই নয়। পুরুষেরই তো দায়িত্ব বেশী। সেই তো তার পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির দৃষ্টান্তে স্ত্রীকে তাঁদের প্রতি আরো শ্রদ্ধাপরায়ণ ক'রে তুলবে। যেখানে স্বামীর অতখানি দৃঢ়তা ও পৌরুষ নেই,

সেখানে সতী স্ত্রীর অনেকখানি করণীয় আছে। সে যদি স্বামীর ভালই চায়, তবে তাই করবে যাতে স্বামীর মঙ্গল হয়। স্বামী যদি তার মা-বাবার প্রতি কর্ত্তব্যচ্যুত হ'তে চায়, সে বরং তখন কলেকৌশলে চেষ্টা করবে যাতে বাপ-মার প্রতি তার টান বাড়ে এবং আবেগভরে সে তাদের সেবাযত্ন করে। মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ইত্যাদি বাড়াবার জন্য অনেক সময় দূতীগিরি করতে হয়। স্ত্রী হয়তো স্বামীকে বলল—বাবা-মা তোমাকে খুব ভালবাসেন। বলেন —ও রাগধাগ করলে কি হয়? মন ওর খুব ভাল। বাইরে আধিক্যেতা নেই। কিন্তু সকলের প্রতি অত্যন্ত টান। আবার, শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে হয়তো বলতে হয়—উনি সব সময় আমাকে বলেন, আমার কিছু করা লাগবে না তোমার। তুমি সব সময় দেখবা, বাবা-মার যাতে কোন কষ্ট না হয়। এইভাবে যদি কৌশলে দূতীগিরি করা যায়, তাহ'লে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভাব-সাব গজিয়ে দেওয়া যায়। এই তো সতী স্ত্রীর কাজ, লক্ষ্মী বৌয়ের কাজ। গড়া-সংসার ভাঙবে না সে, ভাঙা-সংসার গড়বে সে, জোড়া লাগাবে সে। মায়েদের তুই বোকা বলিস? বোকা হ'লে কখনও সন্তান পেটে ধ'রে মানুষ ক'রে তুলতে পারে? দে তো একটা ব্যাটাছাওয়ালের কাছে একটা মা-হারা শিশুকে মানুষ করার ভার! প্রায়ই হাগে-মুতে একশা ক'রে ফেলবেনে। কিন্তু মায়েরা কেমন অনায়াসেই করে তা'। তাই নিজেদের কখনও হীন ভাববি না। তোরাই তো বুদ্ধিস্বরূপিণী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী, দুর্গতিনাশিনী, দুর্ম্মতিদলনী দুর্গা! তোরা আছিস, তাই তো আমাদের আগলে রেখেছিস। নইলে আমাদের উপায় ছিল কী?

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ভাবাবেগে আরক্ত ও উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। সেই দিব্য ভাবের অপূর্ব্ব দ্যুতি দেখে দেহ-মন-প্রাণ স্বতঃই প্রণত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—বন্দে পুরুষোত্তমম্। মৌন বন্দনা জানিয়ে আভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম নিবেদন ক'রে অনেকেই উঠে পড়লেন। গোধূলির ম্লানিমা ঘনিয়ে এল, সেই আবছা আলো-আঁধারের মাঝে ভাবছেন সবাই—কবে এই আলোকোজ্জ্বল জীবন সব তমিস্রা ভেদ ক'রে সত্য ও নিত্য হ'য়ে ধরা দেবে আমাদের কাছে? না, আলো-আঁধারের দোটানার মাঝে হাবুডুবু খেতে হবে চিরটা কাল?

৭ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৪৯ (ইং ২৪।১০।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চে উপবিষ্ট। অধিবেশনের সময়, তাই চারিদিকেই লোক। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বীরেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—গোক্ষুরের কী-কী গুণ দেখেন তো?

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) কি একটা বই দেখে এসে বললেন—গোক্ষুর মূত্রকারক, রসায়ন, স্নিগ্ধকর ও বাজীকর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি তো chemist (রসায়নবিৎ), প্রত্যেকটা জিনিসের ভিতর কী-কী chemical properties (রাসায়নিক উপাদান) আছে, সেটা ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করবেন। সঙ্গে-সঙ্গে physiology (দেহ-বিজ্ঞান) ও bio-chemistry (জৈব-রসায়ন)-এরও চর্চ্চা করবেন, তাহ'লে শরীরের উপর কোন্ জিনিসটার কী গুণাগুণ, এবং তার কারণ কী, তা' বুঝতে পারবেন। বহু জিনিসই আমাদের ছেলেরা মুখস্থ ক'রে রেখে দেয়, কিন্তু কেন কী হয় তার যথাযথ কারণ জানে না। এতে প্রয়োগ-দক্ষতা বাড়ে না, নূতন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'লে ঘাবড়ে যায়। Mastery (আধিপত্য) ব'লে জিনিসটা আসে না। আমার একান্ত ইচ্ছা করে যাতে আমাদের দেশের education (শিক্ষা)-টা thorough (সুসম্পূর্ণ) হয়। কিন্তু সে education (শিক্ষা) দিতে গেলে যে teacher (শিক্ষক)-এর প্রয়োজন, তাই পাওয়াই হবে মুশকিল। কারণ, যারা ঐ ছাঁচের মধ্য-দিয়ে বারাইছে, তাদের ভিতর ঐ ছাঁচেরই ছাপ প'ড়ে গেছে।

অনন্তদা (ঢালী)—যে-শিক্ষা চলছে এবং আপনি যে-শিক্ষা চান তার মধ্যে তফাৎটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো ভাল ক'রে সবটা জানি না। কিন্তু দেখে-শুনে মনে হয়, আজকালকার শিক্ষাটা অনেকখানি ডিগ্রী ও চাকরীমুখী হ'য়ে আছে, পুরোপুরি জীবনমুখী হ'য়ে ওঠেনি। তা' যদি হ'তো তাহ'লে শিক্ষার লক্ষ্য হ'তো চরিত্রবান, হৃদয়বান, করিৎকর্ম্মা মানুষ গ'ড়ে তোলা যারা যে-কোন অবস্থার মধ্যে পড়ুক না কেন, ভেঙ্গে-গ'ড়ে নিজের ও পরিবেশের পক্ষে profitable (লাভজনক) কিছু ক'রে তুলতে পারে। তেমনতর মানুষই তৈরী হ'চ্ছে কম। তাই, আমার কেবলই মনে হয়, আমার ঋত্বিক্‌রা যদি প্রকৃত লোকশিক্ষক হ'য়ে গ'ড়ে উঠত, তাহ'লে বোধ-হয়, এ অবস্থার অনেকখানি প্রতিকার হ'ত।

প্রমথদা (দে) ঋত্বিক্‌রা তো আপনার বাণী ও উপদেশ সাধ্যমতো সর্ব্বত্র ছড়াচ্ছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাণী ও উপদেশগুলি মুখে-মুখে আউড়ে বেড়ালে তো আর সেগুলি ছড়ান হয় না। ওগুলি অভ্যাস, ব্যবহার ও চরিত্রগত ক'রে ফেলতে হয়, ওই সূত্র ধ'রেই ওরা বেঁচে থাকে ও বিস্তার লাভ করে। শুধু মুখের কথায় বা পুঁথির পাতায় ওদের অস্তিত্ব জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না। স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অনেক শেখা লাগে, অনেক সদভ্যাস করা লাগে, অনেক যোগ্যতা অর্জ্জন করা লাগে তা' না হ'লে কি প্রয়োজন-পীড়িত, জীবনবুভুক্ষু মানুষ-গুলিকে আশ মিটিয়ে সেবা করা যায়? আমি যতদিক দিয়ে যতখানি পারি

মানুষকে জীবনীয় সেবা জুগিয়ে, নানাভাবে প্রাণনপুষ্ট ক'রে ধন্য হব, আর এর ভিতর-দিয়ে নিত্য নূতনভাবে প্রীত ক'রে তুলব আমার পিতামাতাকে, আমার প্রিয় আচার্য্যদেবকে—এমনতর একটা আগ্রহ গজিয়ে দেওয়া চাই জীবনের প্রারম্ভে। এই আগ্রহ যদি থাকে, তাহ'লে মানুষের শিক্ষাগ্রহণ ও যোগ্যতা-অর্জ্জনের পালা কখনও শেষ হয় না। শিক্ষায় ক্লান্তিও আসে না তাদের। একটা অফুরন্ত অনুসন্ধিৎসা পেয়ে বসে। আর, সেবানুসন্ধিৎসা থেকে যাদের শিক্ষার উদ্বোধন হয়, তারা কখনও বেকার হয় না, অক্ষম হয় না। Invention (আবিষ্কার), research (গবেষণা) বা creative work (সৃজনধর্ম্মী কাজ)-ও সম্ভব হয় একমাত্র তাদের দিয়েই।

প্রমথদা—আমরা অনেক সময় পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হই, কিন্তু পরিবেশকে আমাদের ভাবে প্রভাবিত করতে পারি না—এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হ'লো দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। ব্যক্তিত্ব গজায় আদর্শ-প্রাণতা থেকে, আদর্শপ্রাণ মানুষ যাই করুক, যেখানেই থাকুক, তার লক্ষ্য থাকে, নিজে তো আদর্শ থেকে deviate (স্খলিত হওয়া) করবেই না, বরং অন্যকেও সেইদিকে টেনে আনবে। আর সে জানে, এই পথেই সে সপরিবেশ মঙ্গলের অধিকারী হবে। এই মঙ্গলবুদ্ধি থাকায় কাউকে তার অভিভূত করার প্রয়োজন হয় না, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত যে মঙ্গলচাহিদা আছে, তাই উস্কে দিয়েই সে তাকে আদর্শের পথে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। আর এক ধরণের মানুষ আছে, তারা প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, একগুঁয়ে, অহঙ্কারী মানুষ, তারা সব সময় মানুষের মঙ্গলের ধার ধারে না, কিন্তু তাদের বুদ্ধি থাকে মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার। দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন যারা, তারা অমনতরদের পাল্লায় পড়লে প্রায়ই অভিভূত ও আচ্ছন্ন হ'য়ে তাদের মতে সায় দিয়ে চলে। এতে যে তাদের ভাল লাগে বা ভাল হয় তা' কিন্তু নয়, কিন্তু কতকটা আবিষ্টের মতো ঐভাবে চলতে বাধ্য হয়। তাই, এইভাবে মানুষকে প্রভাবিত করার কোন দাম হয় না, কারণ এমনতরভাবে প্রভাবিত হয় যারা তাদেরও কোন কল্যাণ হয় না, এবং প্রভাবিত করে যারা তাদেরও কল্যাণ হয় না। কেউ কারও asset (সম্পদ্) হয় না, কারও সত্তানুকূল আত্মনিয়ন্ত্রণ হয় না। তাই, প্রকৃত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় না কারও। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ যাজনমুখরতার ভিতর-দিয়ে যে-প্রভাব হয়, তাতে যাজক ও যাজিত উভয়েই উপকৃত হয়, উভয়েরই আত্মনিয়ন্ত্রণ হয়, উভয়েরই বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, উভয়েই উভয়ের asset (সম্পদ্) হ'য়ে ওঠে, কারও দ্বারা কেউ overpowered (অভিভূত) হ'য়ে আছে, এমনতর বোধ করে না, একটা সাত্ত্বিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ উভয়কেই প্রসন্ন ও পরিতৃপ্ত ক'রে তোলে। অবশ্য, যাজন করতে গিয়ে মানুষের complex (বৃত্তি)-এর সঙ্গে যে conflict (দ্বন্দ্ব) না বাধে তা' নয়, কিন্তু যাজক যদি

আত্মস্থ থাকে, সে সুকৌশলে মানুষকে বোধ করিয়ে দিতে পারে তার সত্যিকার স্বার্থ কী ও কোথায়, এবং তাতে মানুষ complex-এ identified হ'য়ে (বৃত্তি-স্বারূপ্য লাভ ক'রে) complex (প্রবৃত্তি)-এর standpoint-এ (দৃষ্টিকোণে) rigid (নিনড়) হ'য়ে থাকার অবকাশ পায় না, নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। তাই conflict (দ্বন্দ্ব)-এর solution (সমাধান) হ'তে দেরী লাগে না, তখন পারস্পরিক হৃদ্যতা আরো জমাট হ'য়ে ওঠে। যাজক আদর্শপ্রাণতায় হবে uncompromising (আপোষরফাহীন), কিন্তু তার ego (অহং) হবে flexible (নমনীয়)। সে মানুষের কাছে যেয়ে দাঁড়াবে উপদেষ্টার বেশে নয়, পরমাত্মীয়ের বেশে, কিন্তু respectable distance (সম্মানযোগ্য দূরত্ব) বজায় রেখে চলবে, কখনও cheap (সস্তা বা খেলো) হবে না, এমনভাবে চলতে হবে তাকে যাতে যাজিতের মন তার প্রতি সহজ শ্রদ্ধায় উন্মুখ হ'য়ে থাকে। এই উন্মুখতাটা নষ্ট ক'রে ফেললে তার কথা কিন্তু তার কাছে বিকোবে না। আবার, এও লক্ষ্য রাখতে হবে তাকে যাতে তার অহমিকার সংঘাতে যাজিতের অহমিকা উদ্রিক্ত হ'য়ে না ওঠে। ইতর অহং যখন উগ্র হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ সাধারণতঃ কোন truth (সত্য) impart (দিতে) বা receive (গ্রহণ) করতে পারে না। তেজোদৃপ্ত দরদী বিনয় ব্যবহারই তাই যাজকের পক্ষে শোভন। ফলকথা, আপনারা সর্ব্বদা যদি যাজন-মুখর থাকেন—বাস্তব বাক্ ও ব্যবহার নিয়ে তাহ'লে আর কোন ভাবনা নাই।

মধুদা (ঠাকুরতা)—সবার কাছে তো যাজন করার প্রয়োজন হয় না। যারা আপনার কথা জানে না, তাদের কাছেই যাজন করার দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। যারা জানে তাদের পরস্পরের মধ্যেও আলাপ-আলোচনা যত বেশী হয়, ততই ভাল। জানাটার শেষ নেই, যত আলাপ-আলোচনা করা যায়, ততই fine points (সূক্ষ্ম বিষয়) বের হ'তে থাকে। আর সেইটে হ'য়ে ওঠে এক উপভোগ্য ব্যাপার। তাছাড়া ইষ্টপ্রাণ যে, সে পরিবেশের কাছে কখনও passive (নিষ্ক্রিয়) হ'য়ে থাকবে না। সৎসঙ্গীদের মধ্যেও বেফাঁস কথা, বেভুল ধারণা ও বেচাল চলনের অভাব নেই, সেগুলি যদি তখন-তখনই properly counteract (যথাযথভাবে প্রতিরোধ) না করেন, তাহ'লে কিন্তু আপনারাও educated (শিক্ষিত) হবেন না, তারাও educated (শিক্ষিত) হবে না। নিজেকে ও পরিবেশকে প্রতিনিয়ত adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার তালে থাকতে হবে। নিজেদের কারও ভিতর কোন undesirable knot (অবাঞ্ছনীয় গাইট) দেখা সত্ত্বেও যদি চুপ ক'রে থাকেন, স্থানকাল-পাত্র-অনুযায়ী তার নিরসনে যা' করণীয় তা' যদি না করেন, কিংবা তথাকথিত ভালমানুষের মতো সায় বা প্রশ্রয় দিয়ে যান, তাহ'লে কিন্তু আপনি নিজেই নিজের ক্ষতি করলেন। একদিন দেখবেন ঐ knot

(গাঁইট) আপনার অজ্ঞাতে আপনাকেই পেয়ে বসবে। আবার, যার knot (গাঁইট)-টা খুলে দিলেন না, সে তো কষ্ট পাবেই, এবং সেও আবার তার পরিবেশকে infect (সংক্রামিত) করতে থাকবে। এইভাবে সমাজে evil (দোষ) spread (বিস্তার লাভ) ক'রে চলবে। তাহ'লেই দেখুন, নিজেদের মধ্যেও প্রতিনিয়ত সজাগ যাজনের প্রয়োজন কতখানি। একটা মুহূর্ত্ত অসতর্ক ও অলস হ'য়ে আছেন কি শয়তান সেই মুহূর্ত্তেই তার জাল বিস্তার করতে-করতে এগিয়ে চলবে। আপনাদের তাই ঘরে-বাইরে অতন্দ্র ও অবিচ্ছেদ্যভাবে যজন, যাজন ও ইষ্টভৃতি ক'রে চলতে হবে, নইলে কালের কবল ও ছোবল থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর হবে। অনেক মানুষ অনেকদিন ধ'রে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি না করায় অনেক কিছু আজ ভগবানের বেহাতি হ'য়ে গেছে, আপনারা নিরন্তর কঠোর তপস্যা না করলে এ সঙ্গীন অবস্থার প্রতিকার হবে না।

একটা ছাগল সামনের দুই পা গাছের উপর তুলে দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডিস্পেন্সারীর পিছন দিকে একটা গাছের ডাল থেকে পাতা খাচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের হঠাৎ সেদিকে লক্ষ্য পড়তেই বললেন—দ্যাখেন! ছাগলটা কেমন ক'রে গাছের পাতা খাচ্ছে। গল্প শুনেছি, একজাতীয় হরিণ নাকি গলা উঁচু ক'রে গাছের পাতা খেতে-খেতে বংশানুক্রমে তাদের গলা ক্রমান্বয়ে লম্বা হ'তে থাকে এবং ঐ-জাতীয় হরিণই নাকি পরে জিরাফে পরিণত হয়। মানুষেরও তাই ভরসা আছে ঢের। বিহিত শিক্ষা, সাধনা ও বিবাহের ধারা যদি বংশ-পরম্পরায় অক্ষুণ্ণ ও ক্রমোন্নতিশীল থাকে, তাহ'লে মানুষের psycho-physical evolution (মানসিক ও দৈহিক বিবর্ত্তন) যে কি স্তরে উঠতে পারে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। ঘরে-ঘরে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব কথা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকভাইকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তোর বাবা কোনে?

অশোকভাই—বাড়ীতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী করে?

অশোকভাই—লোকজনের সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর ভাল তো?

অশোকভাই—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ?

অশোকভাই—পড়াশুনো হ'য়ে গেছে, এখন একটু খেলাটেলা করবো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। কিন্তু বাঁধের নীচেয় জলের দিকে যেও না।

অশোকভাই—আচ্ছা।

সুবোধদা (সেন) স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকার ধর্ম্মনীতি-অনুমোদিত যে আদর্শ, সে সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদরা বলেন যে, ওতে জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক

অবনতি আসে, কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে চাই জীবন-ধারণের মান-উন্নয়নের প্রচেষ্টা। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জীবনের মান-উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রবল, তাই সেখানে অর্থনৈতিক অভ্যুদয়ও যথেষ্ট হ'চ্ছে। কিন্তু জীবনের মান-উন্নয়নের নেশায় মানুষ সেখানে শান্তি ও সন্তোষ হারাচ্ছে, ভোগসর্ব্বস্ব হ'য়ে উঠছে। এ অবস্থায় ভারতে আমাদের কোন্ নীতি অবলম্বন ক'রে চলা উচিত যা'তে জাগতিক ও আত্মিক ঐশ্বর্য্যের সামঞ্জস্য-বিধান ক'রে উন্নতিমুখর হ'য়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Plain living and high thinking (সাদাসিদে জীবন ও উচ্চচিন্তা)-এর ideal (আদর্শ)-ই আমার কাছে ভাল ব'লে মনে হয়। অযথা প্রয়োজন বাড়াতে নেই, ওতে মানুষের বস্তুবশ্যতা বেড়ে যায়। ছিমছাম, সহজ, সুন্দর জীবনই ভাল। তাই ব'লে আমি দারিদ্র্যকে আঁকড়ে থাকার কথা বলি না। দারিদ্র্য হ'লো অধর্ম্মের লক্ষণ। অধর্ম্ম হ'লো তাই যা' আমাদের বাঁচা-বাড়াকে ক্ষুণ্ণ করে। প্রায়ই দেখো, যারা দারিদ্র্যহত, তাদের কতকগুলি চরিত্রগত খাঁকতি আছেই, যেমন আলস্য, অকৃতজ্ঞতা, আত্মম্ভরিতা, আত্ম-অবিশ্বাস, পরশ্রীকাতরতা, সেবাবিমুখতা ইত্যাদি। এইগুলিই হ'লো দারিদ্র্যের মূল নিদান। তাই বলছিলাম, দারিদ্র্য অধর্ম্মের লক্ষণ। জীবনের মান-উন্নয়ন বলতে আমি বুঝি চরিত্রের মান-উন্নয়ন, যোগ্যতার মান-উন্নয়ন, সেবা-সামর্থ্যের মান-উন্নয়ন। প্রত্যেকের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে যা'তে সে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী society (সমাজ)-এর পক্ষে most useful (সবচাইতে হিতকর) হ'য়ে উঠতে পারে according to the standard of being and becoming (বাঁচা-বাড়ার আদর্শ-অনুযায়ী)। নজরটা যদি এই দিকে থাকে, তাহ'লে প্রত্যেকের efficiency (দক্ষতা) ও wealth (ঐশ্বর্য্য) বাড়বে, কিন্তু তারা selfish, idle enjoyment-prominent (স্বার্থপর-অলস-ভোগপ্রধান) না হ'য়ে active service-prominent (সক্রিয় সেবাপ্রধান) হয়ে উঠবে, এবং সেইটেই enjoyable (উপভোগ্য) হ'য়ে উঠবে তাদের কাছে। ঐ নেশা থাকলে যে wealth (ঐশ্বর্য্য) তাদের হাতে আসবে, তাও তারা শুধু আত্মোপভোগে না লাগিয়ে দশজনের সেবায় ব্যয় করতে চাইবে। তাই স্বার্থপর ভোগসর্ব্বস্ব হ'য়ে অশান্তিতে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা কমই থাকবে। তাহ'লেই দেখ, being and becoming (বাঁচা-বাড়া)-এর Ideal (আদর্শ) যদি মানুষের মাথায় সজাগ রাখতে পার, তাহ'লে তাই-ই balancing factor (সমতা-সংসাধী উপাদান) হিসাবে কাজ করতে পারে। নইলে মানুষ unbalanced (সমতাহারা) হবেই। হয় সত্তাকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়বে, নয় সাত্ত্বিকতার নামে স্থবির হ'য়ে পড়বে, কিংবা নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে পরিবেশকে ভুলে যাবে বা পরিবেশের কথা ভাবতে গিয়ে আত্মরক্ষার

জন্য করণীয় যা' তা' বাদ দেবে—এইরকম একটা না একটা একপেশে রকম ধরবেই। তাই balance ও harmony (সমতা ও সামঞ্জস্য) যদি আনতে চাও ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে, তা' কি ভারতে বা ভারতের বাইরে, তাহ'লে inspire (সন্দীপিত) করতে হবে love for a living Ideal, who stands for the life and growth of all (সর্ব্বমানবের জীবনবৃদ্ধি-কামী জীবন্ত আদর্শের প্রতি অনুরাগ)। একেই বলে ধর্ম্মদান। এই ধর্ম্ম-দানই হ'লো জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। তোমরা ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজকরা হ'লে ধর্ম্মদাতা। তোমরা যদি তোমাদের কর্ম্ম নিষ্ঠাসহকারে করতে থাক, তাহ'লে দেখবে, বিভ্রান্ত জগৎ আপনা থেকে পথে আসবে। যে আদর্শনিষ্ঠ হ'য়ে সপরিবেশ নিজেকে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে-করতে এগিয়ে চলে, সে মহাকল্যাণকৃৎ। তাকে দেখলেও পুণ্য।

কথাগুলি ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসছেন। মুখখানিতে যেন আনন্দের ঢল নেমেছে। কেমন একটা আকুলকরা, পাগল-করা প্রীতির প্রাণময় মৌন স্পর্শ।—'বোঝে প্রাণ, বোঝে যার'।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করলেন—বাইরের বিরুদ্ধ শক্তি এত প্রবল যে, তার মধ্যে মুষ্টিমেয় দু'চারজন লোক সত্যিই যদি ইষ্টপথে চলে, তাতে কি আদৌ কোন কল্যাণ হয় পরিবেশের? বরং যারা সৎপথে চলতে চায় তাদেরই তো অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে পড়ে। জগতের দিকে চাইলে ঠিক বোঝা যায় না, ঈশ্বর ব'লে কেউ থাকলে তিনি কতখানি সক্রিয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎ-চরিত্রের দৃষ্টান্তে মানুষের কল্যাণ হয়ই। তবে সৎলোক যত শক্তিমান ও কৃতী হয় ততই ভাল। মানুষ চায় জীবন, জয়, যশ, ঐশ্বর্য্য, গৌরব। যদি দেখে, সৎপথে থেকে লোকে এগুলির অধিকারী হ'চ্ছে, তাহ'লে তাকে মূল্য দেয়। আবার যদি দেখে, কোন মানুষ ইষ্টকে নিয়ে আনন্দে বিভোর হ'য়ে আছে, জাগতিক লাভ-ক্ষতির কোন তোয়াক্কাই করে না, তাহ'লে তাকেও মনে-মনে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু যদি কাউকে দেখে যে, সৎপথে চলেছে অথচ জীবনে কৃতকার্য্য নয় এবং সেই অকৃতকার্য্যতার জন্য মনে-মনে আপসোস, তাহ'লে তার দ্বারা কিন্তু মানুষ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয় না। দেবগুণ যার চরিত্রগত, স্বভাবগত এবং শত সংঘাত সত্ত্বেও যার দেবগুণের ব্যত্যয় হয় না, আসুরিক বুদ্ধিসম্পন্ন যারা, তারা তার প্রতি অসূয়াপরবশ হ'লেও তাকে ভিতরে ভিতরে শ্রদ্ধা না ক'রে পারে না। তার উপর তারা আবার বেশী ক'রে দৌরাত্ম্য করে, কারণ, তারা জানে, সে যতটা সইবে, অন্য কেউ তা' সইবে না। তাই সৎলোক যারা, তাদের আবার আত্মরক্ষার জন্য খানিকটা পরাক্রম ও চাতুর্য্য থাকা চাই। নইলে টিকে থাকাই কঠিন হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অনেক উচ্চস্তরের পুরুষ থাকেন, যাঁরা Love incarnate (মূর্ত্ত-প্রেম) বললেই চলে, তাঁরা নিজেদের কথা ভাবেনই না। যেমন বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব ইত্যাদি। এমনতর মহান যাঁরা, তাঁদের রক্ষাভরণ, পালনপোষণ ক'রে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তাঁদের অনুগামী যারা তাদের। তারা যদি এ-বিষয়ে উদাসীন হয়, তা' সমূহ বিপদেরই কথা। তবে ইষ্টানুরাগী যে, তার দ্বারা লোকের কল্যাণ হয়ই। কারণ, সে জানে, কেমন ক'রে মানুষকে সৎ-এ আকৃষ্ট করতে হয়। ইষ্ট যার আনন্দের বস্তু, রসের বস্তু, জীবন যার সৎ-উদ্দীপনায় উদ্দাম, মানুষ আপনা থেকেই ভেড়ে তার কাছে স্ফূর্ত্তির আশায়, তার প্রাণোচ্ছল স্পর্শে প্রবুদ্ধ হবার আশায়। এ লোভ সকলেরই আছে। আর, এই মেলামেশার ভিতর-দিয়ে যতই তার উপর মানুষের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়, ততই তার পথের পথিক হ'তে থাকে। অনেকে আছে দুষ্ট-প্রকৃতির, তারা যেই বোঝে, কারও কাছে এগোতে গেলে নিজেদের প্রবৃত্তির গায় হাত দিতে হবে, অমনি সামাল হয়। তারা দরকার মতো সৎলোককে utilise (ব্যবহার) করতে চেষ্টা করে। পোঁদ পাছবেড়ায় গিয়ে না ঠেকলে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা ভাবেই না। সে যা' হো'ক, ইষ্টানুরাগী যারা, সৎ যারা, তাদের সংহতি যত বাড়বে ততই মানুষ ইষ্টীচলনের কল্যাণকর প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হবে। 'সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে'। সংঘশক্তির জয় সর্ব্বত্র। তোমরা বিচ্ছিন্ন থেকো না, প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে ওঠ, প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য কর, তোমাদের এই জমাটবাঁধা রকমটা দেখলে মানুষ ভরসা পাবে। জগতের মধ্যে ঈশ্বরের সক্রিয় অস্তিত্ব বেশী ক'রে অনুভব করবে।

শৈলমা একজন রোগীর শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়েছেন। সেখানকার নানা অসুবিধা-সম্বন্ধে অনুযোগ, অভিযোগ করছেন, বিরক্তি প্রকাশ করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একমনে ধৈর্য্যসহকারে সব শুনছেন। শুনে বললেন—তুই ব'লে পারিস, আর কারও পারার সাধ্য ছিল না।

শৈলমা (হাসিখুশী মুখে) তা' আপনার দয়ায় ঢের পারি। আমি ঐসব সোহাগী আতুসীদের মতো না। আপনাকে আমার কষ্টের ভিতর-দিয়ে পাওয়া..............হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে) তুমি মানুষের জন্য করতেও যেমন পার, আবার মানুষকে কথাও শোনাতে পার তেমনি। মানুষ টের পায়, তোমার service (সেবা) নেবার ঠেলাটা কী!

শৈলমা—তা' অন্যায় দেখলে বলব না?

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যায়টা কা'র তা' তো বোঝা দরকার। (এই ব'লে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শৈলমার দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থাকলেন, পরে আবার বললেন)—কাউকে সেবায় সন্তুষ্ট করতে গেলে তার জন্য হাসিমুখে কিছুটা কষ্ট সহ্য

করাই লাগে, কিন্তু সেবা দিতে গিয়ে যে কষ্ট, তা'তে যদি মানুষটার উপর বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠ, তাহ'লে সে-সেবাকে সেবা মনে না হ'য়ে মনে হয় শাস্তি। সেবার নামে মানুষকে যদি শাস্তিই দাও, অথচ সেবার বড়াই ক'রে চল, তার চাইতে তেমনতর সেবা না দেওয়াই ভাল। তাই দেখ—এত ক'রেও তুমি একটা মানুষকেও আপন করতে পারনি। সেবার অহংকার নিয়ে মানুষ যখন সেবা করে, তখন কাউকে আপন ক'রে তুলতে পারে না। দরদ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি সেবা করে, তাহ'লেই মানুষ আপন হয়।

শচীনদা (চক্রবর্ত্তী)—ম্লেচ্ছ বলে কাদের? ম্লেচ্ছ বলতে কি বিশেষ কোন জাতি বুঝায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ম্লেচ্ছ মানে আমার মনে হয়, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে অস্বীকার ক'রে চলে যারা। ম্লেচ্ছ সব জাতির মধ্যেই থাকতে পারে। ধার্ম্মিক যে, সে যে-জাতির মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে কখনও ম্লেচ্ছ নয়। ম্লেচ্ছত্বের প্রধান লক্ষণ হ'লো ঈশ্বরকে না মানা, প্রেরিতকে না মানা, কিংবা প্রেরিতগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা, পূর্ব্বতন কাউকে মানলেও বর্ত্তমান যিনি তাঁকে মান্য না করা বা তাঁ'তে আনত না হওয়া, পিতৃপুরুষ ও পিতৃপুরুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনী ঐতিহ্যকে উপেক্ষা ক'রে চলা, প্রতিলোম বিবাহ ও যৌনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। যে যত উচ্চকুলোদ্ভূতই হো'ক না কেন, এইসব কুলক্ষণ দেখলেই বুঝবে, সে ম্লেচ্ছাচারাক্রান্ত।

একটি ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! আমার গান শিখতে ইচ্ছা করে, classical (রাগসঙ্গীত) না modern (আধুনিক) কোন্‌টা শেখা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর যেটা ভাল লাগে সেইটে শিখবি। আর পারলে দুই রকমেরই চর্চ্চা রাখবি। কোনটার সঙ্গে কোনটার বিরোধ আছে ব'লে তো আমার মনে হয় না। আগে কঠিনটা শিখলে পরে সহজটা তো আপনিই ক'রে নেওয়া যায়। আবার, সহজটা নিয়ে মক্‌শ করতে-করতে interest (অনুরাগ) প্রগাঢ় হ'লে, তখন কঠিনটা সুরু করা যায়। যেভাবে যুত পাও, সেইভাবে করবে। উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে এবং ধৈর্য্যসহকারে practice (অনুশীলন) যদি কর systematically (বিধিবদ্ধভাবে), তাহ'লে তোমার মতো কৃতিত্ব তুমি অর্জ্জন করতে পারবেই। সঙ্গীত হ'লো গুরুগত বিদ্যা, তাই ভাল আচার্য্য ধরা লাগে। যারা শুধু mechanically (যান্ত্রিকভাবে) কসরত করে, তারা সঙ্গীতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। Science (বিজ্ঞান) হিসাবে খুঁটিনাটি যা'-কিছু analytically (বিশ্লেষণসহ) যত্নসহকারে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু শুধু তাতেই হবে না synthetically (সংশ্লেষণ-সহকারে) বিষয়ের মূলমর্ম্মে পৌঁছে তাতে একাগ্র ও তন্ময় হ'তে হবে। যারা উপরে-উপরে ভাসে, তারা কোন-কিছুর রস নিষ্কাশন করতে পারে না। কোন বিষয়

নিয়ে মজা চাই, মত্ত হওয়া চাই। অনেকে বাহবা বা পয়সাকড়ির লোভে এক-এক দিকে ঝোঁকে, কিন্তু সুদীর্ঘকাল অজ্ঞাত, অখ্যাত অবস্থায় নীরব তপস্যা করতে নারাজ। পরে বলে—ক'রে দেখেছি, ওতে কিছু হয় না। সেটা ছেড়ে দেয়, আর একটা ধরে। ভাবে, তাতে নগদা-নগদি কিছু মুনাফা হবে, তাও হয় না। তখন হয়তো আবার মত পরিবর্ত্তন করে। এইভাবে কিছুই জমিয়ে তুলতে পারে না। শেষটা অপরের দোষ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ রকমটা ভাল নয়। তাই সত্যিকার instinctive (সহজাত) ঝোঁক বুঝে জীবনে একটা পথ বেছে নিতে হয়, এবং তাই নিয়ে লেগে-প'ড়ে থাকতে হয়। প্রত্যেক জিনিসেই অসুবিধা আছে। অসুবিধার সম্মুখীন হ'লে যারা মনে করে, অমুকটা করলে এই অসুবিধা হ'তো না, তারা জানে না যে, প্রত্যেকটা ব্যাপারের সঙ্গেই কতকগুলি সুবিধা-অসুবিধা একসঙ্গে জড়ান থাকে; নির্ঝঞ্ঝাট, নিষ্কণ্টক, নিছক সুবিধা আছে, কোন দিক দিয়ে অসুবিধা ব'লে কিছু নেই—এমনতর কাজ জগতে নেই বললেই হয়।

ভাইটি বললেন—আমার ঐ দোষটি আছে। মতির স্থিরতা নেই। ভাবি, এইটে করলে ভাল হবে কিন্তু কিছুদিন করার পর ভাল লাগে না। তখন মনে হয়, আর একটা কিছু ধরি। তবে গানটা আমার সত্যিই ভাল লাগে। এখন আপনার উপদেশমত লেগে থাকতে পারলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল লাগলে কর। না করলে তো হবে না। এক-এক জনকে দেখলে ফকাৎ ক'রে কতকগুলি কথা বেরিয়ে যায়। সে হয়তো জিজ্ঞাসা করে এক কথা, আমি হয়তো কচ্ছি আর এক কথা। তখন ভাবি, অপ্রাসঙ্গিক কথা বললাম না তো? কিন্তু বহুক্ষেত্রেই পরখ ক'রে দেখিছি, কথাগুলি তাকে বলার দরকার ছিল। বুদ্ধি-বিবেচনা তো নেই। তাই পরমপিতা আপসে-আপ যেখানে যা' বলার বলিয়ে নেন, যেখানে যা' করার করিয়ে নেন। আমিও কই আছি ব'সে, যা' করাও তাতেই রাজী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব্ব শিশুসুলভ সারল্য দেখে সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত।

অতুলদা (পুততুণ্ড) অনিচ্ছাসত্ত্বেও তো অনেক সময় ভুল ক'রে বসি এবং তাতে অনেক ক্ষতি হয়। এ সম্বন্ধে কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর ভুল মানুষের হয়ই। ওতে ঘাবড়াতে নেই। এক ভুল যাতে বারে-বারে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। আর, ভুল করার ফলে যদি কোন অমঙ্গল ঘ'টে গিয়ে থাকে, তখন চেষ্টা করতে হয়, সেই অমঙ্গলকে কোনভাবে মঙ্গলে পর্য্যবসিত করা যায় কিনা। তা' যদি করতে পার, তখন ভুল আর তোমাকে ঠেকাতে বা ঠকাতে পারবে না। ভুলও তোমাকে wiser (আরও জ্ঞানী) ও more profitable (আরও লাভবান) ক'রে তুলবে। সর্ব্বাবস্থায় মঙ্গল প্রচেষ্টা নিয়ে চলাই চাই, তখন ভুল আর থামকে দিতে পারে

না। আমি তাই কিছুতেই হাল ছাড়ি না, ভাবি, বাঁচাটা যখন আমার গরজ, ভালটা যখন আমার স্বার্থ তখন যেন-তেন প্রকারেণ আমাকে ভালতেই যেয়ে দাঁড়াতে হবে যা'তে সুখে-সচ্ছন্দে বাঁচতে পারি পরিবেশকে নিয়ে। মঙ্গলের অধিকারী হওয়ার দায়টা যদি আমার না হ'তো তাহ'লে না হয় চুপচাপ থাকা চলতো। কিন্তু দায়টা যখন আমারই, তখন ব'সে থাকা চলে কী ক'রে?

অতুলদা—আমাদের যে হতাশা আসে। বার-বার অকৃতকার্য্য হ'লে তখন যে আপনা থেকেই মন ভেঙ্গে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ অবস্থায় মন কি আমারও ভেঙ্গে পড়তে চায় না? সে তো স্বাভাবিকই। কিন্তু ভেঙ্গে পড়লে শুনছে কে বল? বাঁচার চাহিদা ও প্রয়োজন শেষ পর্য্যন্ত অকাট্য ও অবাধ্য। মনকে বেশী দুর্ব্বল হ'তে দিলে পরে তার জন্য আবার নিজেরই প্রায়শ্চিত্ত করা লাগে। শরীর-মনের যে ক্ষয়-ক্ষতিটা হয়, নিজেরই আবার তা' make up (পূরণ) করতে হয়। তখন গলদ-ঘর্ম্ম হ'য়ে যেতে হয়। বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার যে বাস্তব পবিত্র প্রয়োজন, তার হাত থেকে যখন রেহাই নেই এবং সে-রেহাই থাকাও যখন বাঞ্ছনীয় নয়, তখন যত তাড়াতাড়ি আঘাত-ব্যাঘাত সামলে নিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাই-ই তো করা ভাল। ভুল-ভ্রান্তি, দুঃখ-দারিদ্র্য, আঘাত-ব্যাঘাত, রোগ-শোক—এগুলি সত্য, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করলে তো জীবন টেকে না, তাই এগুলির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম ক'রে জয়ী হ'তে হবে জীবনে। এগুলিকে পরাভূত করতে গিয়ে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পায়, আর তাই-ই হ'য়ে দাঁড়ায় তার asset (সম্পদ্)। তাই বাধাবিঘ্নের প্রয়োজন আছে জীবনে, নইলে মানুষের becoming (বৃদ্ধি) হ'তো না। Optimistic outlook (আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী) ও energetic will (উৎসাহদীপ্ত ইচ্ছা) নিয়ে চল, তখন সবই enjoyable (উপভোগ্য) হ'য়ে উঠবে। বাধা দেখলে মনে হবে—বৃদ্ধির সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে আমার কাছে। তাই ব'লে অযথা বাধা-বিরুদ্ধতা আমন্ত্রণ করার কোন মানে হয় না। সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে—আমি কতখানি নিখুঁত চলনায় চলতে পারি এবং পরিবেশকে কতখানি favourable (অনুকূল) ক'রে তুলতে পারি। এই চেষ্টা থাকলে চলন অনেকখানি সংযত ও নির্ভুল হ'য়ে ওঠে! আবার, চলার পথে ভুল কিছু হ'লেও তা' শুধরে নিতে পারি এবং ভুলটাকেও শুভাবহ ক'রে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

অতুলদা—ভুলটাকেও শুভাবহ ক'রে নিয়ন্ত্রিত করা ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, রাগের বশে তুমি কোন লোকের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করায় তার সঙ্গে তোমার শত্রুতা হ'লো, কিন্তু তুমি যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হ'য়ে আন্তরিকভাবে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং তার যাতে ভাল হয় সর্ব্বপ্রকারে তাই-ই করতে চেষ্টা কর, তাহ'লে হয়তো দেখবে, শত্রু-

ধীরে সে তোমার বন্ধু হ'য়ে উঠবে। এইভাবে অনেক ভুলেরই শুভনিয়ন্ত্রণ করা চলে। মানুষের হাতে এই ক্ষমতা আছে ব'লেই সে বাঁচতে পারে, নইলে তার উপায় ছিল না।

কুঞ্জদা (দাস)—আমার দুজন বন্ধুর মধ্যে একটা বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে বিরোধ বাধে এবং আমি মধ্যস্থ হ'য়ে তার মিটমাট করতে যাই, কিন্তু মিটমাট তো হয়ই না, বরং দুজনেই এখন আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। প্রত্যেকেই মনে করে, আমি তার স্বার্থের বিনিময়ে অন্যজনের স্বার্থ দেখতে চাই। আমি তো ভালোর জন্যই মিটমাট করতে গেলাম এবং উভয়েরই ভাল যাতে হয়, তাই-ই চাই, কিন্তু তা' সত্ত্বেও উভয়েই আমাকে ভুল বুঝলো কেন এবং দুজনকেই আমি হারাতে বসলাম কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু ভাল চাইলেই হবে না, ভাল করার একটা রীতি আছে, পদ্ধতি আছে, কৌশল আছে। যথাযথভাবে সেটা প্রয়োগ করা চাই, নইলে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। তোমারও হয়েছে তাই।

কুঞ্জদা—আমি কী করলে ঠিক হ'তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কোন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী যতই ভ্রান্ত বা নির্ভুল হোক না কেন, আদ্যোপান্ত ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা-সহকারে তা' তোমার শোনা, বোঝা ও জানা উচিত। প্রত্যেক পক্ষকেই এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় দিতে হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য তুমি যদি খুব ভাল ক'রে শোন এবং আনুষঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণসহ বাস্তব তথ্য নির্দ্ধারণ করতে পার, তখনই তুমি একটা সমঞ্জসা সিদ্ধান্ত করতে পার। কিন্তু শুধু একটা সমঞ্জসা সিদ্ধান্ত করতে পারলেই হবে না, উভয়ের মনে এমনতর আস্থা উৎপাদন করা চাই যে, তুমি নিরপেক্ষ এবং উভয়েরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহ'লেই তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় হবে তাদের কাছে। তাদের প্রত্যেকের এতখানি প্রীতি থাকা চাই তোমার উপর যে তাদের কেউ যদি মনে করে যে, তুমি যে সিদ্ধান্ত করলে তাতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথঞ্চিৎ হানি হ'লো, তাহ'লেও সে তা' হাসিমুখে মেনে নিতে পারে তোমার খুশির দিকে চেয়ে। তাই, বাইরে থেকে কেউ উপযাচক হ'য়ে মধ্যস্থতা করতে যাওয়ার চাইতে, সবচাইতে ভাল হয় যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় একমত হ'য়ে কাউকে মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করে। এবং তেমনতর ক্ষেত্রে ঐ নির্ব্বাচিত মধ্যস্থ নিজে কোন সিদ্ধান্ত না ক'রে উভয়পক্ষেরই স্বতঃস্বেচ্ছ ত্যাগপ্রবণতা, শুভবুদ্ধি ও মিলনাকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে যদি তাদের দিয়েই সামঞ্জস্য করিয়ে নেয়, তাহ'লে আরো ভাল হয়। এর ফলে এমনও হ'তে পারে যে, একপক্ষ হয়তো উদারতা বশে স্বেচ্ছায় আর একপক্ষকে অনেকখানি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু অপরপক্ষ হয়তো বলছে না, আমি যদি অতোখানি নিই, তাহ'লে তোমার প্রতি অবিচার করা হবে, তা' আমি নেব না, এইটুকু হ'লেই আমি খুশি। তখন শুধু বিবাদ-বিরোধ ও স্বার্থদ্বন্দ্ব মেটে

না, পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা হয়। মধ্যস্থতার কাজ বড় কঠিন কাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সাধারণতঃ বিবাদ বাধে উগ্র প্রবৃত্তির কার্য্যকারিতায়। মধ্যস্থ যে হবে তার ঐ ভাব-ভূমিটা বদলে দেবার ক্ষমতা চাই। সে হবে মহৎ প্রবৃত্তির উদ্যোতক। মহৎ-প্রবৃত্তি অল্পবিস্তর প্রত্যেকের ভিতরই সুপ্ত আছে, সেইটে উস্‌কিয়ে তোলা চাই। আবার, হীন প্রবৃত্তিরও রকমারি অভিব্যক্তি আছে। একজন হয়তো আর একজনকে down (খাটো) করতে চায়। সেই প্রবৃত্তি উস্‌কে দিয়ে তাকে দিয়ে এমন করান যায় যে, সে তখন লোকের সামনে demonstrate (প্রদর্শন) করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে যে, সে ঐ লোকটির থেকে অনেক বেশী মহৎ, উদার ও ত্যাগী—তার কাছে সে কোন দিক দিয়েই দাঁড়াতে পারে না। নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে যে চেনে ও masterfully handle (আধিপত্যের সঙ্গে পরিচালনা) করতে পারে, অন্যের প্রবৃত্তিগুলিকেও manipulate (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে সে সাময়িকভাবে ঈপ্সিত কাজ করিয়ে নিতে পারে। সাময়িকভাবে বলছি এইজন্য যে, মানুষ নিজে থেকে যদি আগ্রহশীল না হয়, তবে by induction (প্রবোধনার সাহায্যে) তাকে বরাবরের জন্য সৎ-চলনশীল ক'রে তোলা যায় না। সেইজন্য মানুষের ভাল করতে গেলে চাই ইষ্টে অটুট নিষ্ঠাসম্পন্ন হওয়া ও মানুষকেও তাই ক'রে তোলা। ইষ্টে যে অটুট নিষ্ঠাসম্পন্ন নয়, যার আত্মনিয়ন্ত্রণ নাই, ব্যক্তিত্ব যার গ'ড়ে ওঠেনি, তাকে দিয়ে মানুষের কোন মহৎ কল্যাণ হ'তে পারে ব'লে আমার মনে হয় না। কারণ, যে নিজের প্রবৃত্তির গায় হাত দেয়নি, সে অন্যের প্রবৃত্তির গায় হাত দিতে পারে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে গিয়ে খেপ্‌দার বারান্দায় বসলেন। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন বুঝে উপস্থিত জনতা তাঁকে আর অনুসরণ করলেন না।

একটি মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার একটু private (গোপন) কথা আছে।

প্যারীদা (নন্দী) বললেন—ঠাকুর সকাল থেকে কথা বলছেন, শরীর ভাল না। এখন একটু বিশ্রাম নিতে দেন। পরে আপনার কথা বলবেন। আর, ঠাকুরকে না ব'লে গোসাঁইদা, কিশোরীদা, কেষ্টদা বা সুশীলদা এঁদের কা'রও কাছে বললেও তো হয়। তাঁরা নিজেরাই হয়তো আপনাকে যা' বলার বলতে পারবেন, আর তা' যদি না-ও পারেন, ঠাকুরের কাছে শুনে আপনাকে ব'লে দেবেন।

মা'টি বললেন—আমার যা' কথা, তা' ঠাকুরের কাছে ছাড়া আর কা'রও কাছে বলা যাবে না। এখন না হয়, ঠাকুর যখন শুনতে পারেন, তখনই তাঁর কাছে বলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—তুই বয়, আমি একটু হাঁপ ছাড়ে নিই, তারপর

শ্নবো নে। আজকাল শরীরটা ভাল না, অল্পতেই যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তামাক খাওয়ার পর মা'টিকে বললেন—কি ক'বি, তাড়াতাড়ি ক'য়ে ফেল্।

মা'টি নিরালায় নিজের কথা বলতে লাগলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘ্রম থেকে উঠে বিকালে মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় এসে বসেছেন। লোকজন অনেকেই জড়ো হয়েছেন।

স্বরেনদা (বিশ্বাস)—কেউ যদি এক কথায় জানতে চায় সৎসঙ্গ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী, তাহ'লে তাকে কী বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো তোরা জানিস।

স্বরেনদা—তাহ'লেও আপনার ম্বখে শ্বনতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গ কথার মধ্যেই সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সৎ এসেছে অস্-ধাতু থেকে—অস্-ধাতুর মধ্যে আছে সত্তা, অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা। আর সঙ্গ এসেছে সন্জ্-ধাতু থেকে—সন্জ্-ধাতুর মধ্যে আছে আসক্তি, অন্বরাগ, মিলন ইত্যাদি। তাই সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য হ'লো সত্তান্বরাগী হওয়া—তা' নিজের ও পরের। সত্তান্বরাগী হ'তে গেলে সব সত্তার ম্বল উৎস যে পরম সত্তা, যাঁর ম্বর্ত্ত বিগ্রহ জীবন্ত সদ্গ্বর্—তাঁতে অন্বরক্ত হ'তে হবে। তখনই আসবে সবার সত্তার প্রতি অন্বরাগ। তখনই আমরা সবারই সত্তাপোষণী হ'য়ে উঠবো। প্রবৃত্তি-আসক্তি সত্তাপোষণায় ব্যাঘাত জন্মাতে পারবে না। এই ছাড়া কোন অস্তিত্বের আর কী চাইবার আছে? তাই প্রতিটি সত্তার শাশ্বত চাহিদা যা', সৎসঙ্গেরও চাহিদা তাই। এটা ব্বঝতে কা'রও কোন কষ্ট হবার কথা নয়। প্রত্যেকে নিজের দিকে চাইলেই এটা ব্বঝতে পারে।

সতীশদা (খাঁ)—শোনা যায়, ঋষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হ'য়ে ইন্দ্রের কাছে আয়্বর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং আয়্বর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে মর্ত্তলোকে ফিরে এসে ঋষিদের মধ্যে আয়্বর্বেদের জ্ঞান প্রচার করেন। তা' যদি সত্য হয়, তাহ'লে কি আমরা ধ'রে নিতে পারি যে, ভরদ্বাজ-গোত্রধারী যাঁরা, বিশেষতঃ ভরদ্বাজ-গোত্রধারী ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁদের চিকিৎসাশাস্ত্রে নৈপ্বণ্য লাভ করবার সম্ভাবনা বেশী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা য্বক্তিযুক্ত। তবে বংশপরম্পরায় অন্বশীলন না থাকলে instinct (সহজাত সংস্কার)-এ মরচে ধ'রে আসে।

সতীশদা—ডাক্তারীর চর্চা আমি তো নতুন ক'রে করছি, আমার বংশে এর আগে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য চর্চা এই বিষয়ে হয়নি। কিন্তু আমার তো ডাক্তারী এত ভাল লাগে যে মনে হয় এটা ই আমার জন্মগত জিনিস। আমার ভিতর এই অন্বরাগ জাগলো কী ক'রে? তাহ'লে কি ব্বঝতে হবে, আমার

রক্তের ভিতর এই জিনিসটি ছিল ? আবার, ডাক্তারি যদি না পড়তাম, তাহ'লে হয়তো বুঝতে পারতাম না, ডাক্তারি আমার কাছে এত প্রিয় জিনিস। অন্য কিছু নিয়ে থাকলে তা'ও হয়তো এমনতর ভাল লাগতো এবং তখন সেইটেকেই হয়তো মনে করতাম আমার জন্মগত চাহিদা। সত্যিই বুঝতে পারি না, কোন্‌টা আমাদের সংস্কারগত জিনিস, কোন্‌টা আমাদের সংস্কারগত নয়। এটা বোঝার কি কোন সহজ পথ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর এক-একজনের দেহ ও মনের এক-একটা ধরণ ও গঠন থাকে। সেই ধরণ ও গঠনের উপযোগী নানা কাজ থাকতে পারে, তার যে-কোন একটা কাজ যদি পায়, তাহ'লেই তার ভাল লাগে, মনে হয় এই কাজ আমার প্রকৃতি-গত কাজ। একটা মানুষ হয়তো normally inquisitive (স্বভাবতঃই অনুসন্ধিৎসু), সে যদি এমন কোন কাজ পায় যা' নিতান্ত গতানুগতিক, যার মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের অবকাশ নেই, তাহ'লে কিন্তু তার ভাল লাগবে না, যন্ত্রণাদায়ক মনে হবে। আবার, ঐ একই লোক হয়তো ডাক্তারী, ওকালতি, গবেষণা, নেতৃত্ব, শিক্ষকতা বা স্বাধীন ব্যবসায়—এর যে-কোন লাইনেই successful (কৃতকার্য্য) হবার মতো ক্ষমতা রাখে। কারণ, তারজন্য দেহ, মন ও অভ্যাসের যে মূলধন প্রয়োজন তা' তার আছে। তাই আমার মনে হয়, যার যে ধরণ তার সঙ্গে compatible (সঙ্গতিওয়ালা) যে-কোন profession (বৃত্তি) হ'লেই চলে। তোমার পূর্ব্বপুরুষ ধর কৃষি করেছেন এবং কৃষি করতে-করতেই তাঁদের ভিতর অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধির জাগরণ হয়েছে। গুণস্বরূপ তুমি পেয়েছ সেইটে, এখন যে কেবল কৃষির বেলাতেই সেইটে সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্য কোন কাজে তা' তুমি প্রয়োগ করতে পারবে না, তার কোন মানে নেই। যারা মনে করে, বর্ণধর্ম্মের মধ্যে কোন elasticity (স্থিতি-স্থাপকতা) নেই, নিত্য নূতন বিকাশের সম্ভাবনা নেই, তারা কিন্তু ভুল করে। তবে সমাজ-সংস্থিতির জন্য, বেকারত্বের নিরসনের জন্য আর্য্যরা বৃত্তিহরণ পছন্দ করতেন না। প্রত্যেকে তার বর্ণোচিত কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা আহরণ করবেন, এবং তার যদি বিশেষ কোন গুণপনা থাকে, তার সাহায্যে তিনি সমাজের আর দশজনকে free service (বিনামূল্যে সেবা) দেবেন, এই ছিল বিধান। এর ফলে সামাজিক কাঠামো ও ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশ দুই-ই অব্যাহত থাকতো। আজকাল আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দিতে যেয়ে সামাজিক বিন্যাস ও সমাজ-শৃঙ্খলাকে বিদায় দিতে বসেছি, কিন্তু তাতে ব্যক্তির বিকাশের পক্ষেই ক্ষতি হ'চ্ছে সব থেকে বেশী। কতিপয় বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ নয়। প্রত্যেকটি ব্যষ্টিই সমাজদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশেষ, এবং তাদের প্রত্যেকের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই চলতে হবে, যাতে প্রত্যেকে তার

বৈশিষ্ট্যানুগ সেবায় সমাজকে পুষ্ট ক'রে নিজের অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখতে পারে। তাই সমাজের বাঁধন এমন ক'রে আলগা করা ভাল নয় যাতে আপামর সাধারণের জীবিকা ও বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হ'তে পারে। বর্ণানুগ বৃত্তি ও জীবিকার বিধান যে আমাদের ছিল সে খুব ভালই ছিল। অবশ্য আজকাল অনেক ওলট-পালট হ'য়ে গেছে। কিন্তু তাও instinct (সহজাত সংস্কার)-অনুযায়ী বৃত্তিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে কারও আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। আর, ঋষির অনুশাসন, সমাজ-শাসন মেনে নিতে যদি আমাদের ঘোরতর আপত্তি থাকে, তাহ'লে হয়তো দেখব, তজ্জনিত অসামঞ্জস্যের নিরাকরণ-কল্পে রাষ্ট্রকে তখন নিত্যনূতন এত আইন প্রণয়ন করতে হবে যে, সেগুলি মেনে চলতে গিয়ে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাচ্ছন্দ্যের মর্ম্মই উপভোগ করতে পারবে না। রাশিয়ার কথা যা' শুনি, তা' যদি সত্য হয়, তাহ'লে তো মনে হয়, সেখানে প্রতিটি মানুষই রাষ্ট্রের দাস। পেটের ভাতের জন্য রাষ্ট্রের যাঁতাকলে ধাঁধা প'ড়ে গেছে প্রত্যেকে। তাদের আর নড়াচড়ার জো নেই। তারা এ কথাটাও বলতে পারে না যে, সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল। আমরা উপোস করব সেও ভাল, আমাদের একটু ছেড়ে দে, আমরা একটু নিজেদের মতো চলি। পেটের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রের কাছে যারা এইভাবে বন্ধক রাখল নিজেদের, তার চাইতে যদি সমাজের দশজনে মিলে স্বাধীনভাবে সাধ্যমত পরিশ্রম ও পারস্পরিক সহযোগিতা করার সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হ'তো, তাহ'লে কি তাদের দুটো পেটের ভাত জুটতো না? আমি সব ব্যাপার বুঝিও না, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর দিয়ে কাম কী? তবে মনে যেটা ঠেকে, তা' নিয়ে পচাল পাড়ি।

সতীশদা—এ সব অতি মূল্যবান কথা।

২০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪৯ (ইং ৬।১১।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বাঁধের পাশে তাসুতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), অনিলদা (গঙ্গোপাধ্যায়), বঙ্কিমদা (রায়), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), বীরেনদা (মিত্র), যোগেনদা (হালদার) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম সম্পর্কে কথা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ঋত্বিক্-সাথী নূতন ক'রে ছাপান ভাল। নূতন যে-সব নিয়ম প্রবর্ত্তন করছেন সেগুলি ঋত্বিক্-সাথীর ভিতর এক জায়গায় ছাপান থাকা ভাল।

কেষ্টদা—হ্যাঁ! ও যেমন দরকার, তেমনি block (ছবি) ও opinions (বিশিষ্ট লোকের মতামত) সহ activities pamphlet (কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি

সম্পর্কে পুস্তিকা)-ও বের করা দরকার, ওটা simultaneously (যুগপৎ) ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দী এই তিনটি ভাষাতেই প্রকাশ করা দরকার। আজকাল কর্ম্মীরা বাংলার বাইরেও নানাস্থানে যাচ্ছে, সেইজন্য ইংরেজী ও হিন্দীতে বের হওয়া একান্ত দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে খুব ভাল। একদল লিখিয়ে যোগাড় করতে হয়, আর তাদের দিয়ে শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, সমাজ-সংস্কার, স্বাস্থ্য, ও সদাচার, দৈনন্দিন সাধনা ইত্যাদি বিষয়ে বই লেখাতে হয়। বইগুলি হবে খুব ছোটোর মধ্যে, কোন্ বিষয়ে কী করণীয়, সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট করে লেখা থাকবে এবং কখন কী-কী করতে হবে তারও মরকোচ সহজের মধ্যে ভাঙ্গান থাকবে। Reason (কারণ)-টা unfold (প্রকাশ) করা না থাকলে মানুষের পক্ষে educative (শিক্ষাপ্রদ) হয় না। আপনি direction (নির্দ্দেশ) দিয়ে লেখাবেন, আবার নিজে সবগুলি দেখে দেবেন। ঐ ধরণের যে-কোন বই বের করেন তা' ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী তিন ভাষাতে বের করতে পারলেই ভাল হয়। ছড়াগুলিও বের করা লাগে। ওতে কিন্তু টোটকার মধ্যে আছে সব। আর, মানুষের মাথায় ধরেও খুব। স্বস্তি-বাহিনী সম্বন্ধেও একখানা বই বের করা দরকার। কী তারা করবে, কীভাবে চলবে, তাদের শিক্ষা ও সংগঠন কীভাবে হবে, আয়-ব্যয় কীভাবে নির্ব্বাহ হবে, ঋত্বিক্-সঙ্ঘের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি থাকবে বা থাকবে না ইত্যাদি কথা তাতে লেখা থাকবে।

কেষ্টদা—স্বস্তিবাহিনী সম্পর্কে সব কথা তো আপনি এখনও স্পষ্ট ক'রে বলেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Detail-এ (বিস্তারিতভাবে) না বললেও মূল কথাগুলি বলেছি। আমার উদ্দেশ্য কী তা'ও জানেন। সেই ছকে ফেলে লিখতে থাকবেন। তারপর খুঁটিনাটি ব্যাপারে যদি জিজ্ঞাস্য থাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেবেন। ....আপনারা যা' যা' করবেন ব'লে স্থির করেছেন, সেগুলি খুব তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলবেন। এরপর কিন্তু নাকে-মুখে পথ দেখার অবসর পাবেন না। যুদ্ধ যে এখনও ভারতের মাটিতে নেমে আসেনি, সে আপনাদের মহাভাগ্য। কিন্তু তাও নানারকম দুর্দ্দৈবের আশঙ্কা আছে। সেগুলির প্রতিকারের জন্য পরমপিতা আমার মাথায় যা'-যা' জোগাইছেন, তার একটা কথাও আপনাদের বলতে বাকী রাখিনি। এখন আপনারা সময়মত না করলে আমি কিন্তু নিরুপায়। মানুষ বিপদের সময় পরমপিতাকে যতই ডাকুক না কেন, সে ডাক কিন্তু কমই কাজে আসে যদি রক্ষার বিধিকে সে মেনে না চলে।

শরৎদা মানুষ যতই অন্যায় করুক না কেন, বিপন্ন অবস্থায় সে যদি অনন্যোপায় হ'য়ে পরমপিতাকে ডাকে, তখন কি পরমপিতার বিশেষ দয়া পায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া মানুষের তাঁকে ডাকা না ডাকার উপর নির্ভর করে না। সে দয়া নিত্য ও স্বতঃ। কিন্তু মানুষ যদি ব্যাকুল হ'য়ে তন্মুখী হয়, সেই concentrated earnestness (একাগ্র আগ্রহ)-এর ফলে তার receptivity (গ্রহণক্ষমতা) ও tuned activity (একতান সক্রিয়তা)-এর possibility (সম্ভাব্যতা) বেড়ে যায়! তার move (চলন) হয় তখন unblundering (নির্ভুল), এবং তার ফলেই সে হয়তো পরিত্রাণ পায়, যদি পরিত্রাণ পাওয়ার মতো scope (সুযোগ) আদৌ থাকে। সেইজন্য দেখা যায়, স্বভাবতঃই ভক্তি ও নতিসম্পন্ন যারা, তারা বিপদে-আপদে নানাভাবে saved হয় (রক্ষা পায়)। এর মূলে আছে কিন্তু তাদের unobsessed, surrendered mood (অভিভূতিহীন আত্মসমর্পণের ভাব)। Ego (অহমিকা) বা complex-এর (প্রবৃত্তির) obsession (অভিভূতি) নিয়ে থাকলে মাথাটা নীরেট হ'য়ে থাকে, বিপদের মধ্যে ত্রাণসূত্র লুকিয়ে আছে কোথায় তা' ধরতে পারে না। আবার, হয়তো এতই callous (বোধহীন) থাকে যে, বিপদকে প্রথমটা বিপদ ব'লে ধরতেই পারে না। তাই সাবধানও হয় না, পরে জালে জড়িয়ে যায়, কিন্তু তখন আর নিস্তারের পথ থাকে না।

কেষ্টদার বিশেষ কাজ থাকায় উঠে গেলেন। কথা হ'চ্ছে এমন সময় শরৎদা (কর্ম্মকার) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন—যুদ্ধের সময় বার্ম্মার সৎসঙ্গীরা যে প্রতি পদে-পদে আপনার অযাচিত দয়া কত পেয়েছে, তার তুলনা হয় না, সবার সব ঘটনাগুলি লিখে রাখলে একখানা বিরাট বই হ'য়ে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই পরমপিতার দয়া। গীতায় আছে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ!" যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি বিধিমাফিক করে যারা, তাদের ভিতর অজানতে যে কতখানি শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হ'তে থাকে, তা' সাধারণ অবস্থায় ততখানি বোঝা যায় না। Crisis (সঙ্কট)-এর সময় বিশেষভাবে বোঝা যায়।

যজন যাজন ইষ্টভৃতি
করলে কাটে মহাভীতি।

এ কথা ঠিকই। মানুষ ভাল ক'রে করে না, ব্যাগার শোধ দেওয়ার মতো করে, তাতেই এই। আর, নিষ্ঠাসহকারে যদি করতো, তাহ'লে এদের সামনে দাঁড়ান কঠিন ছিল। আর, ভাল সৎসঙ্গীদের মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা যা' শুনি, তাতে আশ্চর্য্য লাগে। অনেকেই নাম করতে-করতে বা নাম শুনতে-শুনতে পরমপিতার চিন্তা নিয়ে শান্তিতে যেন পরমপিতার কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। মৃত্যুকালে এইরকম উচ্চস্তরে মন বেঁধে রাখা বড় সহজ কথা নয়। তার মানে পরমপিতার দয়ায় এক জীবনেই তাদের কাজ অনেকখানি এগিয়ে যায়...............

হ্যাঁ! তবে বিস্ময়কর ঘটনাগুলি আপনারা যদি record (লিপিবদ্ধ) ক'রে রাখেন, সেগুলি একটা interesting study (সুখপাঠ্য বিষয়) হয়। ওগুলি লিখতে গেলে background (পটভূমি) সহ লিখতে হয়। কতকগুলি fact (ঘটনা) থেকে আবার একটা generalization-এ (সাধারণ জ্ঞানে) আসা যায়। সব ব্যাপারেরই একটা artistic approach (কলাগত অভিগম) ও একটা scientific approach (বিজ্ঞানগত অভিগম) আছে। দুটো দিক দিয়ে দেখলেই তখন দেখাটা পূর্ণতর হয় এবং তার থেকেই আবার further offshoot (আরো ডালপালা) বেরোয়। এইভাবেই জ্ঞানের পরিধি বিস্তারলাভ করে আর তার ভিতর-দিয়ে মানুষের জীবন সমৃদ্ধতর হ'য়ে ওঠে। আর, ইষ্টসার্থকতায় যতই সেগুলি unify (একীকরণ) ক'রে তোলা যায় ততই inter-relations of things (বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক) বোধগম্য হয়। এই conscious effort (সচেতন চেষ্টা) না থাকলে জানাগুলি disintegrated lumps-এর (বিচ্ছিন্ন পিণ্ড বা দলার) মতো থেকে যায়, সেগুলি আমাদের বোধ ও ব্যক্তিত্বের রস, রক্ত, মজ্জায় মেশে না। তাই নানারকম ভাবা আছে, শোনা আছে, করা আছে, পড়া আছে, জানা আছে অথচ সামনে কোন অখণ্ড এক নেই, যে একে সার্থক ক'রে তুলব এগুলি,—তাহ'লে কিন্তু বিচ্ছিন্ন, সঙ্গতিহীন বহু কলরবের মাঝে প'ড়ে জীবন একটা chaos (বিশৃঙ্খলা) হ'য়ে উঠবে। (শরৎ হালদার-দার দিকে চেয়ে)—আপনি কী কন এ কথার?

শরৎদা—আমি নিজের দিক দিয়ে এইটে দেখতে পাই যে, আগের বোঝা ও জানাগুলি যতই আপনার ভাবধারার সঙ্গে মিল ক'রে নিচ্ছি ততই যেন সেগুলি ভাল ক'রে বুঝতে পারছি। এইভাবে মিল ক'রে নিতে না পারলে যেন ভাল লাগে না। এখন নূতন কিছু পড়লেও লক্ষ্য থাকে ঐ দিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের কোন unifying stand (একীকরণী দাঁড়া) না থাকলে কিন্তু যতই পড়ে ততই গুলিয়ে যায়।

রত্নেশ্বরদা—ঠাকুর! অনেকেই আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে বলেন ঠাকুর যে পন্থা দেখিয়েছেন, সেটা খুব ভাল ও ঠিক, কিন্তু এই পথে দেশের সমস্যার সমাধান করতে অনেক দেরী লেগে যাবে। তার চাইতে দেশটাকে কোনভাবে স্বাধীন ক'রে নিতে পারলে, তখন অল্প দিনেই সব ঠিক করা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশটাকে স্বাধীন করতে গেলেই তারজন্য অনেকখানি করণীয় আছে। যে দোষে আমরা পরাধীন হয়েছি, সেই দোষের যদি নিরাকরণ করা না যায়, তাহ'লে সত্যিকার স্বাধীনতা আসতে পারে না। গোড়ার গলদ হ'লো চারিত্রগত গলদ, সেই গলদ দূর করা লাগবে। আমরা অপরের স্বার্থকে যতদিন নিজের স্বার্থ ব'লে ভাবতে না শিখব, ততদিন উন্নতি আমাদের সুদূরপরাহত।

নিজেদের মধ্যে পারস্পরিকতা চাই আর পারস্পরিকতার জন্য প্রয়োজন একাদর্শপ্রাণতা। সেই আদর্শ আবার এমন হওয়া চাই যাঁকে দিয়ে সবাই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী fulfilled (পরিপূরিত) হয় এবং তা' আবার যথাসম্ভব সর্ব্বতোভাবে। তাহ'লেই একটা common platform (সাধারণ মঞ্চ) হয়, unifying stand (একীকরণী দাঁড়া) হয়। তাতে national energy (জাতীয় শক্তি) এমনভাবে consolidated (দৃঢ়ীভূত) হয় যে তার মধ্যে কেউ দাঁত বসাতে পারে না। এখনও পর্য্যন্ত তো আমরা একগাট্টা হ'য়ে দাঁড়াতে পারছি না। পরস্পর-বিরোধী নানা দল, নানা মত, নানা পথ--পারলে একজন আর একজনকে ছোবল মারে। আপনি কি মনে করেন, ইংরেজরা এই বিরোধ ও বিভেদের সুযোগ নিতে চেষ্টা করবে না? আবার, এই বিরোধ ও বিভেদ দূর করতে গিয়ে আমরা যদি সত্তাসম্বর্দ্ধনী নীতি, কৃষ্টি ও আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে কতকগুলি pact-এর (চুক্তির) আশ্রয় গ্রহণ করি, তাতে কি আদৌ কোন সুবিধা হবে? বরং সবাই মিলে পথভ্রষ্ট হব তাতে। এমন কিছু থাকবে না আমাদের সামনে, যা' ধ'রে দাঁড়াতে পারা যায়। স্বাধীনতা চাই তো ভাল ক'রে বাঁচা-বাড়ার জন্য, কিন্তু গোঁজামিল দিয়ে মিল করতে গিয়ে যদি বাঁচা-বাড়ার ভিতটাকেই ক্ষয় ক'রে দিই, তাহ'লে বাঁচব কিসের উপর দাঁড়িয়ে? তাই আমি আদর্শপ্রাণতা চারিয়ে দেওয়ার কথা এত ক'রে বলি। আদর্শপ্রাণতাকে ভিত্তি ক'রে যে পারস্পরিক সেবাবুদ্ধি, আত্মীয়তাবোধ ও ঐক্যবদ্ধতা গজিয়ে ওঠে, সেইটেই হ'লো স্বাধীনতার মূল বনিয়াদ। আমার মনে হয়, this is the only right path (এই-ই একমাত্র ঠিক পথ)। এই পথ বাদ দিয়ে জলদিবাজী করতে গিয়ে আমরা যে-পথই ধরি না কেন, তাতে সুষ্ঠুভাবে শেষরক্ষা হবে কি-না সন্দেহ।

ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়) এসে বললেন—অধিবেশনের সময় বাইরে থেকে যে-সব দাদারা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, তাঁদের জ্বর এখনও ছাড়েনি, বোধ হয় টাইফয়েড, তাঁরা অন্যান্য সবার সঙ্গে এক ঘরে আছেন। লোকজন এখনও বেশ আছেন, কোন ঘরই খালি নেই। তাঁদের যে আলাদা একখানা ঘরে আলগা ক'রে রাখব, তাও পারছি না। আবার, সবার সঙ্গে একঘরে থাকা তাঁদের পক্ষেও অসুবিধাজনক এবং অন্য যাঁরা আছেন তাঁদের পক্ষেও নিরাপদ নয়। এখন কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Guest-house-এর (অতিথিশালার) বাইরে কাছাকাছি একটা ঘর খুঁজে নিয়ে সেখানেই রাখা ভাল। আর, তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য লোক মোতায়েন ক'রে রেখে দিতে হয়। ওদের ওষুধপত্র ঠিকমত দেওয়া হ'চ্ছে তো? প্যারীকে ডেকে নিয়ে যান।

ব্রজেনদা—প্যারীদা দেখেছেন। ওঁদের সঙ্গে লোক আছেন, তাঁরা দেখাশুনা

করছেন! আমিও খোঁজখবর রাখছি। এখন ঘর কোথায় পাওয়া যায়, তাই দেখতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর লোক লাগায়ে দেন আর নিজেও খোঁজ করেন। ঠিক জুটে যাবিনি। তবে সবচাইতে ভাল হয়, রোগীপত্রের জন্য যদি আলাদা একটা হাসপাতাল মতো করা যায়।

ব্রজেনদা প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে বললেন—দেখবেন, ওদের যেন কোন অযত্ন না হয়। টাকা-পয়সার দরকার হ'লে ভিক্ষা ক'রে যোগান দেবেন আর যখন ঠেকে পড়েন আমাকে কবেন।

ব্রজেনদা বললেন—আজ্ঞে তাই করব।

ব্রজেনদা চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইরে থেকে বিশিষ্ট লোকজন যাঁরা আসেন, তাঁদের জন্য একটা স্বতন্ত্র জায়গা যদি থাকে, তাহ'লে ভাল হয়।

শরৎদা বললেন—সেটা খুব দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সোল্লাসে)—গোড়ার কাজগুলি ক'রে ফেলেন, তখন ও-সব যা' দরকার এক ঠেলায় ক'রে ফেলবোনে। বাইরে যেয়ে খুব ক'রে হাউড় দেবেন, সবাইকে নাচায়ে তোলা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে উৎসাহের বিদ্যুৎঝলক। রত্নেশ্বরদার দিকে চেয়ে বললেন—আপনি আজকাল গানটান করেন না, কেমন যেন হ'য়ে গেছেন।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—শরীরটাও খুব ভাল নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (চকিতে মাজা দুলিয়ে ও হাতখানি ঘুরিয়ে)—নাচবেন, গাবেন, স্ফূর্ত্তি করবেন আর ডুগডুগি বাজায়ে ঘুরে বেড়াবেন। কোথায় অসুখ কোথায় পালাবে, তা' ঠিক পাবে না।

আসর জমে গেছে, তাই ক্রমাগত লোকের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। কা'রও-কা'রও কাজ থাকায় কেউ-কেউ আবার উঠে পড়ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব মনোহর ভঙ্গীতে গান ধরেছেন—

'সই লো সই!
মনের কথা কারে কই
কে বা বোঝে মরমের ব্যথা।'

—আনন্দে মাত ক'রে দিচ্ছেন সবাইকে।

এমন সময় ভবানীদা (সাহা) কাগজ নিয়ে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নাটকীয় ভঙ্গিমায় কাব্যচ্ছন্দে বললেন—এবে রণবার্ত্তা শোনাও সবারে!

ভবানীদা যুদ্ধের খবর প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। একটি সংবাদে

উত্তমাশা অন্তরীপের উল্লেখ আছে। সেইটে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন এটার এই নাম হ'লো কেন?

তখন একটা বই থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনান হ'লো "পর্তুগীজ-নাবিক বার্থোলোমি উডিয়াজ আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া এই অন্তরীপে উপস্থিত হইলে প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হন। এই কারণে তিনি ইহার নাম ঝটিকা-অন্তরীপ রাখিয়া চলিয়া যান। কিন্তু পর্তুগালের রাজা উহার নাম রাখেন উত্তমাশা-অন্তরীপ (Cape of Good Hope), কারণ, ঐ পথে যাইয়াই প্রথমে ভারতে আসিবার পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল।"

শ্রীশ্রীঠাকুর তারপর ভূ-চিত্রাবলী আনতে বললেন, ভূ-চিত্রাবলী এনে পৃথিবীর মানচিত্র বের ক'রে আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত উত্তমাশা-অন্তরীপ দেখান হ'লো। ওখান থেকে জলপথে কোন্ দিক দিয়ে ভারতে আসতে হয় তাও দেখে নিলেন। তারপর বললেন—জগতের সর্ব্বোত্তম বহু-কিছুর সঙ্গে জড়ান আছে ভারতের নাম। তাই ভারতের সন্ধান ও আশা পাওয়া গেছে যেখানে এসে, সেখানকে বলা হয়েছে উত্তমাশা। এইসব ব্যাপার থেকে বোঝা যায়, ভারতকে তখন জগৎ কোন্ চোখে দেখত। কেবল ভারতের ধনদৌলতের জন্য যে ভারতের সমাদর ছিল তা' নয় কিন্তু, ভারত এমন একটা কৃষ্টি ও সভ্যতার অধিকারী ছিল যে, তাকে সবাই দেবভূমি ব'লে শ্রদ্ধা করত।

নগেনদা (সেন)—ভারতের পূর্ব্ব-গৌরব আবার ফিরিয়ে আনা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যায় বই কি? তা'র জন্য খুব ভাল-ভাল কর্ম্মী চাই।

নগেনদা—ভাল কর্ম্মী বলতে আপনি কেমন চান? আমাদের কি ভাল কর্ম্মীর অভাব আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানকার কর্ম্মীদের মধ্যে ভালমানুষ ঢের আছে, কিন্তু ইষ্টপ্রাণ, চতুর-চৌকশ, প্রচণ্ড দক্ষতাসম্পন্ন শক্তিমান্ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন আজ খুব বেশী. নইলে এই জটিল পরিস্থিতি কাবেজে আনা কঠিন ব্যাপার। রামদাস স্বামী কর্ম্মীসংগ্রহ-সম্বন্ধে বড় সুন্দর বলেছেন। (প্রফুল্লকে বললেন)—এনে শোনা তো।

ঘর থেকে বই এনে প'ড়ে শোনান হ'লো—

"আগে-পিছু না ভাবিয়া, করিতে যাইবে যাহা
সকলি হইবে পণ্ডশ্রম।
সন্ধান করিয়া তাই, সংগ্রহ করাই চাই
চতুর ও বিচক্ষণ জন।
বাজারী বহুত মেলে, কিন্তু কাজ পেতে হ'লে
চতুর লোকের প্রয়োজন।

ধূর্ত্তই অন্তর চেনে, ধূর্ত্তই বাগাতে জানে
অলস বাজারী জন।
তাই, ধূর্ত্ত চতুর ধরিবে, কাজে তারে লাগাইবে
পাইবে বাজারী অগণন।
কিন্তু সাবধান, সব কথা রাখিবে গোপন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো তো কি আছে?—'বেছে-বেছে আত্মীয়-সন্তান।'

আবার পড়া হলো—

"বেছে-বেছে আত্মীয়-সন্তান, সহৃদয় বুদ্ধিমান
সযতনে কাছে ডেকে এনে, তুষিবে মিষ্টভাষে।
তার সংসার-সমাচার, শুধাইবে সবিস্তার
মনোযোগ ক'রে আদরে যতনে, উত্তর শুনিবে তার।
দুঃখের কথা অপরে বলিলে লঘু হয় দুঃখভার
দরদীর সাথে মৈত্রী ঘটিতে বিলম্ব হয় না আর।
মৈত্রী যখন জমিয়া আসিবে তখন বুঝাবে তারে
দেবতা ভুলিলে, ধর্ম্ম ভুলিলে দুঃখ আসিয়া ধরে।
সময় বুঝিয়া সাধনার পথ ধরাইয়া তারে দিবে
বাকী যাহা কাজ আমিই করিব, মোর কাছে পাঠাইবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেই বলে সহজ যাজন। এ না ক'রে যদি কতকগুলি তত্ত্ব-কথার আমদানী করা হয়, তাতে কিন্তু মানুষের অন্তর স্পর্শ করা যায় না।

বিধুদা (রায়চৌধুরী)—দেশের ঐক্যসাধনের ব্যাপারে সবচেয়ে প্রধান অন্তরায় তো সাম্প্রদায়িক সমস্যা, তার সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো আপনাদের কাছে বার-বার বলেছি যে, ধর্ম্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম্ম বরাবর এক এবং ধর্ম্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নেইকো। এক-একজন প্রেরিতপুরুষকে আশ্রয় ক'রে এক-এক সময়ে এক-এক দেশে ধর্ম্মের বিশেষ জাগরণ হয়েছে। তাঁদের কথাবার্ত্তার মধ্যে দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী বিশিষ্ট পরিবেষণ থাকলেও, প্রত্যেকেই মূলতঃ এক কথাই বলেছেন। তাই মহাপুরুষদের মধ্যে ভেদ করার বুদ্ধি ভাল না বরং পরবর্ত্তী মহাপুরুষের মধ্যে পূর্ব্বতন মহাপুরুষের অনুপূরণ কোথায় কীভাবে আছে, সেইটে খুঁজে বের করতে হয়। পূর্ব্বতন মহাপুরুষের প্রতি যার যত অনুরাগই থাকুক না কেন, সে যদি যুগ-পুরুষোত্তমের প্রতি সক্রিয় শ্রদ্ধা ও আনতিসম্পন্ন না হয়, তাহ'লে ঐ পূর্ব্বতনকেই প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্রাহ্য করা হয়। যুগ-পুরুষোত্তমকে উপেক্ষা ক'রে যে ধর্ম্ম হয় না, আবার যুগ-পুরুষোত্তমকে মানি অথচ পূর্ব্বতনদের মানি না, এটাও যে একটা স্ববিরোধী ব্যাপার ইত্যাদি

কথাগুলি খুব ভাল ক'রে চারান দরকার। আপনাদের নিজেদের পূর্ব্বতন প্রতিপ্রত্যেকটি মহাপুরুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'তে হবে—একত্বানুধাবনী অনুসন্ধিৎসা ও অনুরাগ নিয়ে, মহাপুরুষরা যে একবার্ত্তাবাহী, ঈশ্বর যে এক, ধর্ম্ম যে এক, এবং যুগ-পুরুষোত্তমের মধ্যেই যে আছে সবার জীবন্ত মিলনসূত্র, সেটা আপনাদের জীবন, যাজন ও চলন-চরিত্রের সাহায্যে সপ্রমাণ করতে হবে। তবে এ-কথা ঠিক জানবেন, প্রকৃত অবতার-মহাপুরুষ বা প্রেরিতপুরুষ যাঁরা, তাঁদের কেউ কখনও ব্যক্তিগত বা কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন না, বরং বৈশিষ্ট্যের পালন ও পোষণেই তৎপর থাকেন, আর পূর্ব্বতনের সঙ্গে তাঁদের কোন বিরোধ তো নেই-ই বরং পূর্ব্বতনদের প্রতিষ্ঠা ও পরিপূরণেই উদগ্র আগ্রহ তাঁদের। আমার তো মনে হয়, পরবর্ত্তী মহাপুরুষ না আসা পর্য্যন্ত পূর্ব্বতন মহাপুরুষের কদর ঠিক-ঠিক বোঝা যায় না। পরবর্ত্তীর ভিতর পূর্ব্বতনদের যেন একটা consummation (পরিণতি) দেখা যায়। জহুরীই জহর চেনে। পূর্ব্বতনের সমগ্র রূপটা ধরা পড়ে যেন পরবর্ত্তীর কাছে। আর, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁরা উভয়েই তো এক। কিন্তু দেহী অবস্থায় তো আর নিজের গুণপনা নিজমুখে ব্যক্ত করা যায় না। তাই পরবর্ত্তী হ'য়ে এসে পূর্ব্ববর্ত্তীর যাজন ক'রে পূর্ব্ববর্ত্তীকে proper perspective-এ (যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে) দেখতে ও বুঝতে সাহায্য করেন। এই নীতি ও উদ্‌গীতি তাঁদের স্বভাবগত। এইসব চরিত্রগত লক্ষণ যেখানে নেই, তাঁরা কখনও প্রকৃত মহাপুরুষ নন, এ-কথা হলপ ক'রে বলা যায়। আবার, প্রকৃত পূরকপুরুষের আবির্ভাব যেখানে, সেখানে কিন্তু ধীরে-ধীরে পূর্ব্বতনদের প্রতি প্রকৃত অনুরাগী যারা, তাদের প্রত্যেকেরই সমাগম হ'তে থাকে। প্রকৃতির টানেই তারা এসে মিলিত হয় ঐ যুগপুরুষেরই পদতলে। তাই দেখা যায়, যখনই তিনি আসেন তখনই নানামতের, নানাপথের, নানাভাবের অকৃত্রিম অনুরাগী যারা, এক কথায় প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী যারা, তারা এসে আপ্‌সে আপ জড়ো হয় তাঁর কাছে। এটা হ'লো বিধির বিধান। কিন্তু সবাই তো অমন আকুলভাবে খোঁজে না তাঁকে, তাই যাজনের ভিতর-দিয়ে পরমপুরুষের প্রতি ক্ষুধা জাগিয়ে দিতে হয় মানুষের অন্তরে। তখন ঐ বর্ত্তমানকে কেন্দ্র ক'রেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটা মিলন-ভূমির সৃষ্টি হয়, তারা যে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে বর্জ্জন করে, তা' কিন্তু নয়। বরং মুসলমান আরো ভাল মুসলমান হয়, খ্রীষ্টান আরো ভাল খ্রীষ্টান হয়। এইরকম আর কি! তবে এ-কথা খুব ঠিকই যে ঈশ্বর, প্রেরিতপুরুষ ও ধর্ম্ম ভাঙ্গান যাদের পেশা, ঐ ভাঙ্গিয়ে যাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে হয়, রুজিরোজগার করতে হয়, নাম-কাম করতে হয়, লোককে অজ্ঞ ক'রে রেখে তাদের উপর ছড়িদারী করতে হয়, এ-সব কথা খুব তাদের একটা গায় বসে না। তারা বরং উঠে-প'ড়ে লাগে যুগপুরুষের বিরুদ্ধে।

কিন্তু যুগ-পুরুষোত্তমে অনুরক্ত আচারবান্, ধীমান্, ভীমকর্ম্মা যাজক যদি কতকগুলি থাকে, তাহ'লে আস্তে-আস্তে ঐ-সব দলের মধ্যে পদ্মার ভাঙ্গনের মতো ভাঙ্গন ধ'রে যায়। মানুষ বুঝতে পারে, কোন্‌টা সাচ্চা, কোন্‌টা ঝুটো। তাই সব আপনাদের উপরই নির্ভর করে।.................সেবার মন্মথদা কচ্ছিল, বরিশালের কোন্ গ্রামে মুসলমানরা সৎসঙ্গের কর্ম্মীদের বক্তৃতা শোনার পর নাকি মৌলানাদের বক্তৃতা আর শুনবার চায় না। কয়, সৎসঙ্গের মৌলানারাই রসুল ও ইসলাম সম্বন্ধে জানে ভাল, বোঝে ভাল, কয় ভাল—তাদের বক্তৃতা শোনব আমরা। এই যুগেও তো এ-সব ব্যাপার ঘটে। তাই কাম করলেই হয়। আপনাদের ঘরে মাল আছে ঢের, পরিবেষণই যে করলেন না। যার যত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিই থাকুক না কেন, 'ইসলাম-প্রসঙ্গে' প'ড়ে ভাল লাগেনি, এমন লোকের কথা শুনিনি। কেষ্টদার কাছে যা' শুনি, মৌলানা আক্রাম খাঁর মতো লোকও নাকি ঐ বই পেয়ে ছাড়তে চান না। কিন্তু আমরা নিজেরাও এগুলি ভাল ক'রে পড়লাম না, দেশের দশের মধ্যেও চারালাম না। আমাদের মতো বেকুব কি আছে? পরমপিতার দয়ার দান নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলছি।

হরেনদা (বসু)—আপনি বলেছেন, 'প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রত্যেক হিন্দুই মুসলমান খৃষ্টান, প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রত্যেক মুসলমান-খৃষ্টানই হিন্দু'—এ-কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো আগেই বলেছি—ঈশ্বর এক, প্রেরিতপুরুষগণ একবার্ত্তাবাহী এবং ধর্ম্মও এক। ধর্ম্ম মানে সেই আচার, সেই চিন্তা, সেই চলন যা'তে মানুষ সপরিবেশ সর্ব্বতোমুখী বাঁচাবাড়ার পথে এগিয়ে যায়—দেশকালপাত্রানুযায়ী স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের অনুসরণে, তা'হলে একের ধার্ম্মিক চলনের সঙ্গে অপরের ধার্ম্মিক চলনের কোন মূলগত বিরোধ থাকতে পারে না, যদিও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী উভয়ের চলন স্বতন্ত্র হ'তে পারে। সে হিসাবে ধার্ম্মিক প্রত্যেকেই একপন্থী। তাছাড়া, কোন প্রেরিতপুরুষের প্রতি যদি কেউ নিষ্ঠা-সম্পন্ন হয়, একের ঐ নৈষ্ঠিক অনুসরণের ভিতর-দিয়ে তার অন্যান্য প্রেরিত-পুরুষগণকেও যুগপৎ অনুসরণ করা হ'য়ে থাকে। যেমন আমি যদি রামকৃষ্ণ-দেবকে অনুসরণ ক'রে চলি, তাহ'লে তাঁর ভিতর-দিয়েই আমার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যদেব সকলকেই অনুসরণ করা হয়। কারণ, এ'দের মূলনীতি এক। আর, প্রত্যেক মহাপুরুষেরই নির্দ্দেশ অন্যান্য মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে চলা। তাই আমি তাঁদের কাউকে যদি ভালবাসি, অন্য সকলকেও স্বভাবতঃই ভালবাসব তাঁরই বিভিন্ন মূর্ত্তি জেনে। আর, তাঁদের অনুগামী যারা, তাদেরও ভালবাসব আপনজন ভেবে। এই-ই তো স্বাভাবিক। তাহ'লে আর খাঁটি মুসলমান, খাঁটি হিন্দু, খাঁটি খ্রীষ্টানে ভেদ থাকে কোথায়? তবে প্রত্যেকেরই স্ব স্ব পন্থানুযায়ী খাঁটি হওয়া চাই এবং

অন্য সকলকেও তাদের আদর্শ-অনুযায়ী খাঁটি হ'য়ে উঠতে সাহায্য করা চাই। তখন একগুরুর নিষ্ঠাবান শিষ্যদের মধ্যে যেমন ভাব জমে ওঠে, বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকের মধ্যেও তেমনি ভাব জমে উঠবে। কেউ কাউকে পর ভাববে না, শত্রু ভাববে না বরং পরমাত্মীয় ব'লে জ্ঞান করবে। খলিলভাই তো মুসলমান, কিন্তু তাকে দেখলে কি তোমাদের পর মনে হয়? কিংবা সেও কি তোমাদের পর মনে করে? তাহ'লেই দেখ—বিধিমাফিক চললে একত্ব ও মিল হ'য়েই আছে। কিন্তু convert (ধর্ম্মান্তরকরণ) ক'রে যে মিল করার প্রচেষ্টা, ওর মধ্যে গোল আছে। ধর্ম্ম কখনও পরিপূরণী পিতৃকৃষ্টি ও পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করতে শেখায় না। এমনতর শিক্ষার ভিতর betrayal-এর (বিশ্বাসঘাতকতার) বীজ লুকিয়ে থাকে। তাই তাতে কখনও মানুষের মঙ্গল হয় না। ধর্ম্মের কাজই হ'লো মানুষকে স্ববৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, আত্মস্থ করা, তার ব্যত্যয় যদি কোথাও হ'য়ে থাকে তা' দূরীভূত করা।

প্যারীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ব্রজেনদা ব'লে গেল, গেষ্ট-হাউসে (অতিথিশালায়) দুটি ভাইয়ের নাকি টাইফয়েডের মতো হয়েছে—তুমি কিন্তু ভাল ক'রে দেখো। যেন কোন অযত্ন না হয়। অন্য কোন জায়গা দেখে সরিয়ে যদি রাখ তাহ'লে ভাল হয়।

প্যারীদা অভয় দিয়ে বললেন—এ-সম্বন্ধে যা' করবার আমরা করছি ও করব। আপনি চিন্তিত হবেন না, এমনিতেই আপনার শরীর ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ভরসা দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। (ব'লে একটু হাসলেন। পরে আবার বললেন)—যারা সেবা-শুশ্রূষা করে, তারাও যেন সাবধানতা অবলম্বন ক'রে চলে।

হেমগোবিন্দদা (মুন্সী) এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একটু পরে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। হেমগোবিন্দদা চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও কাজ-কাম করে আবার ফাঁকে-ফাঁকে এসে আমাকে দেখে যায়। ও নিজের ভাবে থাকে, খাওয়ার দিকে একটু নজর আছে, আর কোন বালাই নেই। আবার একটু পাগলাও আছে। মহাত্মাজী যখন আশ্রম দেখতে এসেছিলেন, ও ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে যেয়ে, বলা নেই কওয়া নেই মহাত্মাজীকে জড়ায়ে ধ'রেই দুই গালে দুই চুমো খেয়ে নিল। মহাত্মাজী তারপর যত সময় আশ্রমে ছিলেন, ওকে দেখলেই বিব্রত বোধ করতেন ভাবতেন, আবার জানি কি কান্ড ক'রে বসে।

বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেও হাসতে লাগলেন।

মালদহের একটি দাদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আজকাল সরকারী অফিসের গাফিলতির ও অব্যবস্থার ফলে লোককে যে কত বেগ পেতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবাবুদ্ধি নিয়ে তো চাকরী করে না, চাকরী করে পেটের ভাতের জন্য। তাই পেটের ভাতে যদি হাত না পড়ে, তাহ'লে আর কিছুতেই

চৈতন্যোদয় হয় না। এই অবস্থায় উপরিওয়ালারা যদি খুব সজাগ হয় এবং কর্ম্মচারীদের গাফিলতির ফলে লোকের অসুবিধা বা কষ্ট হ'লে যদি কঠোর হস্তে তার প্রতিকার করে, তাহ'লেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। পূর্ব্ব-কালের কোন-কোন রাজা ও রাজপুরুষেরা শুনেছি, ছদ্মবেশে রাজ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন, এবং সাধারণের উপর কোন অবিচার বা অত্যাচার হয় কিনা স্বচক্ষে তা' প্রত্যক্ষ করতেন। সে-সব রেওয়াজ তো আজকাল উঠেই গেছে। যদিও আজকাল লোকে গণতন্ত্রের কথা বলে, তাহ'লেও সহায়সম্বলহীন ব্যষ্টি তার ব্যক্তিগত অধিকার ও মর্য্যাদা কমই বোধ করতে পারে। কি স্বাধীন বা পরাধীন দেশে হোমরা-চোমরারা ক'জন কোথায় অগণ্য-নগণ্য ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ-ব্যথার কথা দরদভরে শোনে? তারা শোনে যখন জনমতের চাপ পড়ে। কিন্তু যারা হুজুগ ক'রে দল বাঁধতে পারে না, তাদের কি কোন কথা শোনবার নয়? ফলকথা, মানুষ-হিসাবে ব্যক্তির মর্য্যাদা আজ কোথায়, ব্যক্তির অধিকার আজ কোথায়? অথচ আমাদের দেশে একটা সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত রাজ্যে কোন অনাচার, অবিচার বা অঘটন ঘটলে রাজদরবারে গিয়ে তার কৈফিয়ত তলব করতে পারত।..................একটা মানুষ যে কত বড় মূল্যবান জিনিস, সে যে কতখানি শ্রদ্ধেয়, কতখানি আদরণীয়, সে অনুভূতি আমাদের দিন-দিন নীরেট হ'য়ে যাচ্ছে। নইলে ইচ্ছে ক'রে কেউ কারও অসুবিধার কারণ হয়, দুঃখের কারণ হয়? হৃদয়হীন বুদ্ধির কারসাজি আবার শিক্ষা?

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ করুণায়, মমতায় ছলছল করতে লাগল। কিছুসময় স্তব্ধ হ'য়ে থাকলেন। তাসুর দক্ষিণদিকের দরজার ফাঁক দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের পানে চেয়ে রইলেন। প্যারীদা তামাক সেজে সামনে এনে গড়গড়ার নলটা হাতে তুলে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কতকটা আনমনে তামাক খেতে লাগলেন।

পরে আবার আপনমনে সহজভাবে বললেন—মানুষের কাছে যদি মানুষের চাইতে টাকার দাম বেশী হয়, সেটা আমার কাছে বড় insulting (অপমান-জনক) লাগে। মানুষই তো লক্ষ্মী, মানুষই তো টাকা। টাকা কি টাকার স্রষ্টা? তবু সেই মানুষকে করবে অবহেলা? সাধারণতঃ চাকরীর ঐ একটা বড় দোষ। মানুষ ওতে অর্থ-স্বার্থী হয়, কিন্তু মানুষ-স্বার্থী হয় না। টাকা পেলেই তো হ'লো, মানুষ দিয়ে কি কাম? মানুষের আর কদর কী?

আশুভাই (ভট্টাচার্য্য) ঠাকুর! স্বাধীন ব্যবসায় যারা করে, তাদের অনেকেও তো মানুষের চাইতে টাকার মূল্য বেশী ক'রে দেয়। জিনিসপত্রে ভেজাল দিয়ে যে লাভ করতে চায়, তা' থেকে তো বোঝা যায় যে, তারা মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের চাইতে লাভটাকেই বড় ক'রে দেখে। তাই মনে হয়, শুধু চাকরীয়া নয়, বেশীর ভাগ লোকই আজ অর্থস্বার্থী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যা' বলছ, তা' হয়তো ঠিকই। কিন্তু তবু দোকানদার বলে, খদ্দের লক্ষ্মী। তাদের সঙ্গে যে ভদ্রব্যবহার করতে হয়, তাদের যে সমাদর করতে হয়, এ কথাটুকু অন্ততঃ তারা বোঝে। তারা এইটুকু জানে যে, খদ্দেরদের সহযোগিতা ছাড়া তারা অচল! সেইজন্য dishonesty (অসাধুতা) সত্ত্বেও মানুষকে তারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে কমই শেখে অন্ততঃ যাদের একটু বোধ আছে। ভাবে, দশজনে দয়া ক'রে তাদের দোকানে আসে, তাই তাদের পেট চলে, নইলে হাঁড়ি শিকেয় উঠবে। আর, ভাল ব্যবসাদার যারা তারা সব সময় সাধুতার উপর দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখন দিনকালই হ'য়ে গেছে খারাপ, পরিবেশের বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী যেখানে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানে ২।৪ জনের ইচ্ছা থাকলেও তারা সদ্ভাবে ব্যবসায় করবার সুযোগ পায় না। আর, প্রতিযোগিতায়ও তো টেকা চাই। খাঁটি ঘি দিতে গেলে হয়তো ১০ টাকা ক'রে সের বিক্রী করতে হয়। কিন্তু তুমি হয়তো ৫ টাকার বেশী দাম দিয়ে ঘি কিনতে প্রস্তুত নও, সেখানে ভেজাল দেওয়া ছাড়া উপায় কি? তুমি ৫ টাকা দিয়ে নেবে অথচ জিজ্ঞাসা করবে—খাঁটি ঘি তো? সে আর অগত্যা বলে কি! বলবে—হ্যাঁ বাবু! খুব খাঁটি। তুমি যে মনকে প্রবোধ দিচ্ছ, তা' কি তুমিই বোঝ না, আর যত দোষ হ'লো দোকানদারের! অবশ্য, দোকানদার যদি অকপটে বলে—'বাবু! খাঁটি ঘি যদি নিতে চান, তাহ'লে ১০ টাকার কমে দেওয়া সম্ভব নয়—অবশ্য ৫ টাকারও ঘি আছে, কিন্তু তা' খাঁটি হবে না', তাহ'লেই সব থেকে ভাল হয়। আর, ব্যবসায় করতে গেলে মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া চলে না, আমাদের দেশে এমনতর একটা ধারণা হ'য়ে গেছে। এই ধারণাটাই ভুল। এই ধারণার জন্য যে শুধু ব্যবসায়ীরাই দায়ী, তা' নয়, খদ্দেররাও দায়ী। খদ্দেররা অনেক সময় এত দরাদরি করে যে, দোকানদাররা যদি কিছু দাম বাড়িয়ে না বলে তাহ'লে পারে না। তবে দোকানদাররা যদি honest ও strict principle (সাধু ও কঠোর নীতি) নিয়ে চলে, খদ্দেররা সেখানে যেয়ে বাজে কথা বলতে সাহস পায় না। শুনেছি, কলকাতায় এবং মফঃস্বলে আজকাল বহু দোকান আছে যেখানে একদর। তারা একজনকে বোকা পেয়ে তার কাছ থেকে বেশী দরও নেয় না, আবার আর-একজনের হম্বিতম্বিতে কম দামেও জিনিস ছাড়ে না। আর, ও-সব দোকানে গিয়ে কেউ হম্বিতম্বি করতেও সাহস পায় না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধুতা যে একেবারে নেই, তা' নয়। তবে বহু লাখপতি, ক্রোড়পতি আছে, যারা জিনিসপত্রের প্রধান সরবরাহকারী। তাদের মধ্যে শুনেছি, অনেকে টাকার জন্য তঞ্চকতা করে, জিনিসপত্রের মধ্যে গোলমাল করে। সাধারণ ব্যবসায়ীদের সেখানে কী হাত আছে বল? একজন হয়তো একটা বিরাট সরষের তেলের কলের মালিক। সে যদি প্রথম থেকেই তেলের মধ্যে একটা গড়বড় ক'রে দেয়, তখন তুমি যদি

হিসাবে কী করতে পার? তাই ব'লে এ-কথা যেন মনে ক'রো না যে, আমি ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি সমর্থন করি। আমার কথা তা' নয়। আমার কথা হ'লো সাধারণ ব্যবসায়ীরা বহুক্ষেত্রে নিরুপায়। আর, আমরা সাধুচলনে চলবো না, শুধু ব্যবসাদারদের কাছ থেকে সাধুচলন দাবী করব, এ জিনিসটিও হয় না। ব্যবসাদারদের যেমন খরিদ্দারদের ঠকাবার বুদ্ধি আছে, খরিদ্দারদেরও আবার তেমনি ব্যবসায়ীদের ঠকাবার বুদ্ধি আছে। এই টানাপোড়েনের মধ্যে প'ড়েও অনেক গোলমাল হ'য়ে যায়। তাই বৃহত্তর পরিবেশশুদ্ধ পরিশুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। আর, কেউ যাতে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে, সরকারের তরফ থেকেও তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করা দরকার।

হরেনদা (বসু)—এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে, রুই-কাতলা যারা তারা অক্ষত থাকে, আর মরতে মরণ হয় চুণোপুঁটিদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সরকারী দুর্নীতি। যে সরষেকে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, সে সরষেকেই যদি ভূতে পায়, তাহ'লে ভূত ছাড়াবে কী ক'রে? কেষ্টদার মুখে শুনেছি, 'রাজা কালস্য কারণং।' ফলকথা, রাজশক্তি ও রাজকর্ম্মচারীরা যদি ধর্ম্মের প্রতিকূল হয়, তাহ'লে সর্ব্বসাধারণও সেখানে দুর্দ্দশাকবলিত হয়।

২৬শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪৯ (ইং ১২।১২।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। আশেপাশে বঙ্কিমদা (রায়), উমাদা (বাগচী), শশধরদা (সরকার), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি অনেকেই আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি বিষণ্ণ। ময়মনসিং জিলা থেকে আগত কিছু সংখ্যক হৈহয় ক্ষত্রিয় চ'লে গেছে, তাই মনটা ভাল নেই। বলছিলেন, আমি গোড়াতেই বলেছিলাম, এখানে লোক আনতে গেলে দেখেশুনে হিসাব ক'রে আনতে। কিন্তু সে-কথা তোমরা মাথায় রাখনি। দলের ভিতর থেকে ২।৪ জন যদি চ'লে যায়, তখন আর-সবারও মন ভেঙ্গে যায়। আগে থেকে এমন ক'রে তৈরী ক'রে আনা উচিত ছিল যে, শত কষ্ট হ'লেও এ জায়গা ছেড়ে যাবে না। এখানকার মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকবে। নিষ্ঠা বড় বড়জিনিস। আদর্শের প্রয়োজনে দুঃখ-কষ্ট কতটা হাসিমুখে সইতে পারে, তাতেও মন কতখানি অক্ষত থাকে, সেইটে হ'লো নিষ্ঠার একটা মস্তবড় পরখ। অহঙ্কার, অভিমানে ঘা লাগবে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত হবে, ছেলে-পেলে নিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করতে হবে, চতুর্দ্দিক থেকে পেষণ চলবে, ঘরের লোকে অনুযোগ, অভিযোগ করবে, তবু অচল, অটল থাকতে হবে। অতোখানি stamina (ক্ষমতা) দেখে লোক না আনলে শেষ পর্য্যন্ত টেকে না। প্রথমে worst picture (নিকৃষ্টতম ছবি) তুলে ধরতে হয়! তাতেও যারা

রাজী থাকে, রুখে ওঠে আসবার জন্য, তাদের আনতে হয়। সুখ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে আনলে মুশকিল। সে-কথা বাদ দিয়েও আমাদের আরো দোষ আছে। মানুষ যে হাসিমুখে দুঃখকষ্ট বরণ ক'রে নেবে, তার তো একটাকিছু পাওয়া চাই, তার তো পোষণ চাই। নইলে কেন অযথা কষ্ট করতে যাবে? কিন্তু কোন কষ্টকেই মানুষের কষ্ট মনে হয় না, মানুষ যদি ভালবাসার আকর্ষণে প'ড়ে যায়। তোমাকে ছেড়ে থাকাটাই তখন তার কাছে সবচাইতে কষ্টকর মনে হয়। কিন্তু তোমাকে পেলে কোন কষ্টই তার গায় বেঁধে না। আমি তো দিন-দিন অথর্ব্ব হ'য়ে যাচ্ছি। আগের মতো সব জায়গায় ছোটাছুটি করতে পারি না। তোমরা কি মানুষের সঙ্গে সেইভাবে মেশ? তাদের খোঁজখবর নাও? তোমাদের ভিতর-দিয়ে কি মানুষ এমনতর ভালবাসার স্পর্শ পায়—যে ভালবাসার দায়ে তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের তাগিদ অনুভব করে? একরকম আছে ঢলঢলে সহানুভূতি, তা' মানুষকে আরো ঢিলে ক'রে দেয়, সঙ্কল্পকে দুর্ব্বল ক'রে দেয়। মুখে বলা আছে ঢের, কাজে করা নেই কিছু, অথচ মুখের দরদে মানুষের অভাববোধ ও কষ্টকে আরো তীব্র ও অসহনীয় ক'রে তোলে। জনপ্রিয়তার লোভে যারা মানুষকে এমনতর নিষ্ক্রিয় দরদ দেখায়, অথচ তাদের বল দেয় না, আশা দেয় না, ভরসা দেয় না, চাঙ্গা ক'রে তোলে না, বাস্তবে তাদের দুঃখ লাঘব করার জন্য কিছু করে না, আদর্শপ্রাণতা ও ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে না, তারা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞাতে মানুষের ক্ষতিরই কারণ হ'য়ে থাকে। মানুষ খুব ইষ্টনিষ্ঠ না হ'লে মানুষকে সক্রিয়ভাবে ভালও বাসতে পারে না, তার ভালও করতে পারে না। হয় বৃত্তিতে তেল মালিশ ক'রে চলে, না হয় দম্ভ, দর্প, অভিমানে মানুষকে ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে, কিন্তু sweet (মিষ্ট) অথচ uncompromising (আপোষরফাহীন) হ'য়ে স্বীয় চারিত্রিক প্রভাবে তাকে benignly enchant (হিতপ্রসূভাবে মুগ্ধ) ক'রে রাখতে পারে না।

প্রফুল্ল—Benignly enchant (হিতপ্রসূভাবে মুগ্ধ) করার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর ধর, তোমার সেবা, সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহারে একটা মানুষ তোমার প্রতি মুগ্ধ হ'য়ে রইলো, কিন্তু এই মুগ্ধতা যদি ওখানেই লয় পায়, তুমি যদি তাকে শ্রেয়প্রসূ ক'রে তুলতে না পার, ঊর্দ্ধগামী ক'রে তুলতে না পার—তোমার শ্রেয়মুখীনতা ও ঊর্দ্ধগামিতার ভিতর-দিয়ে; তাহ'লে তা' অকল্যাণেরও কারণ হ'তে পারে। কারণ, সে হয়তো ঐ মুগ্ধতার বশে তোমার defect (দোষ) গুলিও imbibe (অনুসরণ) করবে। কিন্তু তুমি যদি সর্ব্বদা আদর্শানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত থাক এবং তার ভিতরও সেই প্রবোধনা যোগাও, তাহ'লেই সে বাস্তব মঙ্গলের অধিকারী হ'তে পারে। আর, যতই তুমি তার শ্রদ্ধাকে তোমাতে আবদ্ধ রাখতে না দিয়ে ইষ্টাভিগমে পরিচালিত ক'রে

দেবে, ততই দেখবে, তার শ্রদ্ধাও তোমাতে উত্তাল হ'য়ে উঠতে থাকবে। অন্যের শ্রদ্ধা লাভ ক'রে যারা সেই শ্রদ্ধাকে promote (উন্নীত) করতে পারে না, transfer (স্থানান্তরিত) করতে পারে না, তারা কিন্তু নিজেরাই নিজেদের কবর খোঁড়ে। মানুষের becoming (বিবর্দ্ধন)-এর চাহিদা inherent (অন্তর্নিহিত অর্থাৎ সত্তা-অনুস্যূত) তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ন্যস্ত ক'রে তোমাকে sincerely (অকপটভাবে) অনুসরণ ক'রেও যদি কেউ দেখে যে তার কোন বিকাশ হ'চ্ছে না, সে কিন্তু তখন ক্ষেপে উঠবে, তোমার দোষ-দর্শন ও নিন্দা সুরু ক'রে দেবে। যে ছিল তোমার অনুগত, সেই হ'য়ে উঠবে তোমার শত্রু। তাই হুঁশিয়ার হ'য়ে চলতে হয়।

বিলাতের war-tax (যুদ্ধ-শুল্ক) সম্বন্ধে কথা উঠলো। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন বড় কাজ করতে গেলেই স্বতঃস্বেচ্ছভাবে suffer (কষ্ট) করা লাগে। সমগ্র জাতির আত্মরক্ষার প্রয়োজনটা ওদের দেশের লোক ভাল ক'রেই বোঝে, তাই যুদ্ধের খরচ যোগাবার জন্য ওরা হাসিমুখে ত্যাগ স্বীকার করছে, নিজেদের কর্ম্মশক্তি বাড়িয়ে, আয়-উপার্জ্জন বাড়িয়ে, তার থেকে যত বেশী পারে তা' তো দিচ্ছেই, আবার ব্যক্তিগত প্রয়োজনও যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ক'রে তুলছে। ধর্ম্মের জন্য, কৃষ্টির জন্য, মাতৃভূমির জন্য, বৃহত্তর সমাজের জন্য অক্লান্ত শ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের আগ্রহ যদি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করা না যায়, তাহ'লে কিন্তু জাতি বড় হ'তে পারে না। এটা যে শুধু বিপদকালেই করণীয়, তা' নয়। এটা নিত্য করণীয়। তাই, আর্য্যদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান ছিল। এইগুলি অভ্যাসগত হ'য়ে গেলে, তখন আর কোন ভাবনা থাকে না। প্রত্যেকেই যদি মনে করে যে, সে বৃহত্তর পারিবেশের সেবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী, তাহ'লে সেই urge-এর (আকূতির) ফলে তার capacity (শক্তি) ও activity (কর্ম্মিষ্ঠতা)-ও unfurled (প্রসারিত) হয়, এবং সে আরো-আরো efficient (দক্ষ) হ'য়ে ওঠে। এতে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে যেমন বেড়ে ওঠে, জাতিগতভাবেও তারা তেমনি উন্নত হ'য়ে ওঠে। আবার, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের asset (সম্পদ) হয়। কেউ মনে করে না যে, সে একক ও অসহায়, 'আমি' বলতে মনে হয় এতজন, প্রত্যেকেই বুকে বল পায়, জোর পায়, ব্যক্তিত্বও বলিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। আর্য্যদের বিধানগুলি যে কি সুন্দর, আমি যত ভাবি, ততই মুগ্ধ হ'য়ে যাই। আমি মূর্খ মানুষ, আমার ভাষা নেই, তাই প্রাণ যেমন ক'রে চায়, তেমন ক'রে প্রকাশ করতে পারি না এদের মহিমার কথা। তোদের মতো লেখাপড়া জানলে দেখতিস, আমি দুনিয়ার কাছে কিভাবে হেঁকে-ডেকে বলতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে এক অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদী প্রেরণার উচ্ছ্বাস।

দেখে মনে হয়, ভারত-আত্মার গৌরব-দীপ্ত প্রাণচ্ছবি সম্মুখে বিরাজমান।

বঙ্কিমদা (রায়)—জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতায় রাষ্ট্রের হাতে বিপুল ধনবল সঞ্চিত হ'তে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা তাঁরা যদি সাধু-প্রকৃতির না হন, তাহ'লে ঐ ধনবলে লোকের কল্যাণ না হ'য়ে অকল্যাণও হ'তে পারে। মদমত্ততায় তাঁরা অনেক অপকর্ম্মও ক'রে বসতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো সেইজন্য বলি, যাকে-তাকে রাষ্ট্র-প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে কতকগুলি ছড়াও দিয়েছি।

প্রফুল্ল—ওগুলি এক জায়গায় সাজান আছে, নিয়ে আসব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আন্।

নিয়ে আসার পর পড়তে বললেন—

পড়া হ'লো—

যুগগুরু আর পূর্ব্বতনে
শ্রদ্ধানতি যার মলিন,
এমন জনায় প্রতিনিধি
নয়কো করা সমীচীন।

আদর্শেতে নয়কো রত
সার্থকযুক্ত নয় জীবন,
শুভাশুভ বুদ্ধিহারা
ব্যর্থ তাহার নির্ব্বাচন।

পূর্ব্বঋষির নিন্দা করে
বর্ত্তমানে নাইকো নতি,
দ্বন্দ্বভরা ধর্ম্মকথায়
রাষ্ট্র ভাঙ্গে মন্দমতি।

রাষ্ট্রশাসনদণ্ড দেশের
চললে শিথিল পায়,
শিষ্ট দলি অজ্ঞ বেকুব
লোকশাসনে ধায়।

সৎ-সংহতি ভাঙ্গন ধরায়
নির্ব্বাচনে এমন মত
সমর্থনেও পাপ উপজায়
বিপাক দশার সিধে পথ।

রাজশক্তি হাতে পেয়েও
সৎ-এর পীড়ক যারাই হয়,
দেশকে মারে নিজেও মরে
রাষ্ট্রে আনে তারাই ক্ষয়।

নীতির দানে রাজা যদি
মর্য্যাদা না দেয় মহৎ জনে,
রাষ্ট্রসমাজ ক্ষয়েই চলে
দুর্ব্বিপাকের উচ্ছলনে।

পূর্ব্বতনে শ্রদ্ধাভরা
দায়িত্বশীল স্বভাব-মন,
ইষ্টীপূত এমন জনই
প্রতিনিধির পাত্র হন।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যিনি নেতা হবেন, তিনি যদি ইষ্টানুসরণ না করেন, ইষ্টানুরাগে সুনীত ও সুনিয়ন্ত্রিত না হন, তবে তার নেতৃত্ব সমূহ বিপদেরই কথা। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে দেখতে হবে, তার প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য কতখানি, ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর তার নিষ্ঠা কতখানি, নইলে তার হাতে ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে।............... আর, যত রকমের system of government (সরকারী কাঠামো) আছে, আমার বিলাতের রকমটা ভাল লাগে। Constitutional monarchy (নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র) না কি বলে যেন?

বঙ্কিমদা—হ্যাঁ! Constitutional monarchy (নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে একটা automatic mutual check (স্বাভাবিক পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ) থাকে ব'লে মনে হয়। Healthy tradition (জীবনীয় ঐতিহ্য)-গুলিও বজায় থাকে, king-এর (রাজার) প্রতি allegiance (আনুগত্য)-এর ভিতর দিয়ে একটা emotional unification (ভাবগত ঐক্য)-ও অনুস্যূত থাকে সারা জাতির মধ্যে। জাতীয় জীবনের সংহতিকল্পে এই concentration of mass-sentiment-এর (জনগণের ভাবানুকম্পিতার একাগ্রতার) বিশেষ প্রয়োজন আছে। ঐরকম constitution-এর (শাসনতন্ত্রের) সঙ্গে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে precautions (সাবধানতা)-গুলির কথা বললাম, সেগুলি যদি বজায় থাকে, তাহ'লে আরো ভালো হয়। নচেৎ টাকার জোরে বা পার্টির জোরে বহু অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে

যেতে পারে। সব চাইতে ক্ষতি হয়, ধর্ম্ম-ও-কৃষ্টিহীন প্রবৃত্তিমূঢ় ইতর-অহংওয়ালা স্বার্থান্ধ লোক অধিক সংখ্যায় ঢুকলে। দুটো-চারটে টাকা যদি কেউ নষ্ট করে, সে ক্ষতি বরং পূরণ হয়। কিন্তু যাদের উপর দেশের আইন-প্রণয়ণের ভার ন্যস্ত, তারা যদি অদূরদর্শী হয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় এমন সব আইন প্রণয়ন করে যার ফলে যুগ-যুগবাহী সত্তাসম্বর্দ্ধনী আচার, নিয়ম, নীতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলোচ্ছেদ হয়, তা'হলে কিন্তু জাতির বহুপুরুষের সহস্র-সহস্র বৎসরের সাধনাকেই ব্যর্থ ক'রে দেওয়া হয়।

উমাদা—জাতির উন্নতির জন্য সবচাইতে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে কোন্ দিকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবচাইতে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে বিবাহ ও সুপ্রজননের দিকে। বিবাহ ও সুপ্রজনন যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে আর সব গজিয়ে উঠবে। মানুষ দুই-এক পুরুষ যদি লেখাপড়া না-ও শেখে, কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও যদি থাকে, সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ যদি আদৌ না দেখে, অথচ সে যদি সদ্বংশজাত হয় এবং তার কুলকৃষ্টি ঠিক থাকে, তাহ'লে কিন্তু তার উন্নতির ভূমিটা নষ্ট হয় না। আবার, ঐ উন্নতির ভূমিটা নষ্ট ক'রে দিয়ে তাকে যতই সুশিক্ষা, ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখা যাক না কেন, সে কিন্তু কিছুতেই মানুষ হ'য়ে উঠবে না।—মানুষ হ'য়ে উঠবে কে? সে তো অপহৃত হ'য়ে গেছে জননবিধির অনাচারে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খেয়ালের খেলায় সে হারিয়ে গেছে চিরতরে—

পাপাচারে, কদাচারে সঙ্কুক্ষিত যেথা
বিধিরোষ নিঃসন্দেহে জানিও তথায়,
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান্।

ভূপেশদা (দত্ত) একটা বই নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাতে কী রে?

ভূপেশদা গাড়ীর catalogue (তালিকা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর চশমাটা নিয়ে আয় তো।

সেবাদি চশমাটা এনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা প'রে পাতা উল্টে-উল্টে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে একটা গাড়ী সম্বন্ধে বললেন ডিজাইনটা বেশ।

ভূপেশদা আজকাল তো আর গাড়ীর পারমিট পাওয়া সম্ভব নয়। তা'ছাড়া দামও খুব বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর তোমরা ইচ্ছা করলে সব পার। তোমাদের অসাধ্য কাণ্ড নেই। ....……আমার নিজের গাড়ীতে চড়তে ইচ্ছা করে না, কিন্তু আর সবাই চ'ড়ে বেড়ায় তা' খুব ভাল লাগে।

ছোটমাসীমা পাশে বসেছিলেন, তিনি বললেন—তোমার তো ঐ নেশা, মানুষকে দিতে ভাল লাগে, খাওয়াতে ভাল লাগে, পরাতে ভাল লাগে। ওতেই তোমার সুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সুখ পাওয়া নিয়ে কথা, যার যাতে সুখ হয়। আমিও কি স্বার্থপর কম?

বহিরাগত একটি দাদা বললেন—আমার অবস্থা ভাল নয়, আমার একটি ছেলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, পড়াশুনোর উপরও তার বেশ আগ্রহ, নিজে-নিজেই পড়াশুনা করে, পরীক্ষায়ও মন্দ করে না, যেটা দরকার হয়, আমার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেয়। কিন্তু ওর মা ঠেলা ধরেছে—একজন প্রাইভেট টিউটর রেখে দিতে হবে। ছেলে নিজে বলে—আমার প্রাইভেট টিউটর লাগবে না, অথচ তার মায়ের ঐ জিদ। একে তো আমার সামর্থ্য নেই, তারপর আশেপাশে প্রায় বাড়ীতেই দেখি—যে-সব ছেলেদের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখে, তাদের নিজেদের পড়বার আগ্রহ ক'মে যায়, প্রাইভেট টিউটরের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে এবং মাষ্টারমহাশয় যত সময় থাকেন ততসময় বই নিয়ে বসে, তারপর আর পড়তে চায় না। যাহোক, প্রাইভেট টিউটর রাখা সম্বন্ধে আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর তোর স্ত্রী হয়তো ভাবে যে, প্রাইভেট টিউটর থাকলে ছেলের result (ফল) আরো ভাল হবে। তাই বলে। তবে এমনিই ছেলে যখন আগ্রহ-সহকারে পড়ে এবং প্রয়োজনমত তুইও যখন দেখিয়ে-শুনিয়ে দিস তখন আর আলাদা মাষ্টারের দরকার কী? বিশেষতঃ তোর যখন অবস্থায় কুলোয় না। তবে প্রয়োজন থাক বা না থাক, তুই রোজ কিছুসময় ছেলের পড়ার কাছে বসিস এবং দুটো-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করিস এবং যেটা না পারে, ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিস। তাতে মায়ের মনে হবে, ছেলের পিছনে যত্ন নেওয়া হ'চ্ছে। আর, ছেলের জন্য পারিস তো মাঝে-মাঝে এক-আধ কৌটো মাখন কিনে এনে তার মায়ের হাতে দিয়ে বলিস—ভাতের পাতে ওকে একটু মাখন দিও, তাতে ওর পড়াশুনোর মাথা আরো খুলে যাবে। এইরকম একটু তুকতাক করলে দেখবি মা খুশি হ'য়ে যাবে। মায়েরা সবসময় দেখতে চায় যে, তাদের ছেলেদের পিছনে special attention (বিশেষ মনোযোগ) দেওয়া হ'চ্ছে।.................... যাহোক, তোর কথা কিন্তু ঠিক। ছেলেপেলেদের শুধু মাষ্টার-মহাশয়ের উপর নির্ভরশীল হ'তে দেওয়া কিন্তু ভাল নয়। ক'রে জানার প্রবৃত্তিকে উসকে দেওয়া ভাল সবসময়। প্রধান জিনিস হ'লো, পড়াশুনোয় interest (অনুরাগ) গজান, যার দরুন ছেলেরা নিজেরাই পড়াশুনো করবে। একটা জিনিস বুঝতে পারে না, সেটা বোঝবার জন্য নিজে থেকে যদি চেষ্টা না করে, মাথা না খাটায়, কেবলই পাশে থেকে একজন যদি সাহায্য করতে থাকে, তাহ'লে তার কিন্তু

মাথা খোলে না, সে চিন্তা করতে শেখে না, সমস্যার সমাধান করতে শেখে না। জীবন-সংগ্রামেও তারা অনেক সময় ঠেকে পড়ে। ছেলের মৌলিকতার বিকাশই প্রধান কথা। নিজে থেকে মাথা না ঘামালে মৌলিকতার বিকাশ হয় না। মানে-বইও ছেলেরা যত কম ব্যবহার ক'রে পারে ততই ভাল। আর, পঠন যেমন প্রয়োজন, পাঠনও তেমনি প্রয়োজন। যে-জিনিস বুঝলো সেটা যদি অন্যকে বোঝায়, তাহ'লে বুঝ পাকা হয়। প্রত্যেকটি ছেলে তার ক্লাসের less advanced (কম অগ্রসর) দুই-একটি ছেলেকে যদি পড়াশুনায় সাহায্য করার দায়িত্ব নেয়, তাহ'লে আমার মনে হয়, সব থেকে ভাল হয়। ঐ গরজে সে thoroughly (পুরোপুরি) শেখে, এবং বোঝাতে গিয়ে নিজের বোঝায় ফাঁক কোথায় আছে, তা'ও বুঝতে পারে। ক্লাসে শিক্ষক নিজে উপস্থিত থেকে যদি ভাল ছাত্রদের দিয়ে মাঝে-মাঝে ক্লাস নেওয়ান এবং প্রয়োজনমত তাদের সাহায্য করেন, তাহ'লেও ভাল হয়। ঐ ছাত্রের কাছে শিক্ষকের আবার ছাত্রের মতো প্রশ্ন করা লাগে। এতে ছাত্রদের self-confidence (আত্ম-বিশ্বাস) খুব বেড়ে যায়।

১০ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪৯ (ইং ২৬।১২।৪২)

গতকাল বেলা বারটায় খলিলদা (রহমান) ইত্যাদি শুষ্ক চোখমুখ নিয়ে ভীতত্রস্ত, আর্ত্ত চেহারায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে উপনীত হ'য়ে জানালেন, তার আগের দিন রাতে কলকাতায় ও আশেপাশে বহু বোমা পড়েছে, ৩ টাকার টিকেট ১৫ টাকায় কিনতে হ'চ্ছে, ৫ টাকার কমে কুলি মালপত্রে হাত দিচ্ছে না, প্লাটফর্মে ঢুকতে শিয়ালদহ-ষ্টেশনের গেটে বহু টাকা দিতে হ'চ্ছে, মানুষ প'ড়ে গেছে, তার উপর দিয়ে লোক চ'লে আসছে, হাজার-হাজার মানুষ এইভাবে প'ড়ে আছে, তাদের জিনিসপত্র উধাও হ'য়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকে প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে কিন্তু অনেকেই ছেলেপেলে নিয়ে গাড়ীতে চাপতে পারছে না। মাষ্টার মহাশয় অতিকষ্টে ব্রেকভ্যানে ক'রে এসেছেন। সকলেরই চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই সেই থেকে সকলের নিরাপত্তার জন্য ভাবিত।

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই বলছেন—যে-সব জায়গায় বোমা পড়ছে, বোমা পড়বার সম্ভাবনা, সে সব জায়গা থেকে নিকটতম নিরাপদ এলাকায় লোকজন সরাবার ব্যবস্থা করা লাগে। গ্রাম এলাকা, যেখানে কোন military objective (সামরিক লক্ষ্যবস্তু) নেই, ইত্যাদি জায়গা নিরাপদ ধ'রে নেওয়া যেতে

পারে। আর যারা থাকবে, অন্যত্র যেতে পারবে না, তাদের মনোবল যাতে ঠিক থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। মানুষ nervous ও panicky (ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত) হ'লে ভুল চলনে চ'লে বিপদ ডেকে আনে বেশী ক'রে। মনের স্থৈর্য্য থাকে না, তাই কোনটাতেই আস্থা রাখতে পারে না, স্থির থাকতে পারে না, ঐ অবস্থায় কেউ-কেউ আবার ছটফট ক'রে ছুটোছুটি করতে থাকে, ওতেই আরো বিপদে প'ড়ে যায়।

কেষ্টদা- এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর- আমাদের weapon (অস্ত্র) হ'লো যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। যত গভীরভাবে ওর ভিতর ঢুকব, ততই বুদ্ধি-বিবেচনা পরিষ্কার হবে! ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, মনোবল বেড়ে যাবে, চলনটাও অভ্রান্ত হবে, এমন কি বিপদ আসবার আগেও টের পাওয়া অসম্ভব নয়। বার্ম্মায় এ-সব কাণ্ড কত ঘটেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। তবে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে নিবিড়ভাবে করা চাই। মানুষ যখন আর্ত্ত হয় তখন তার concentration (একাগ্রতা) ও surrender (আত্মসমর্পণ)-ও বোধ হয় deeper (গভীরতর) হয়। আবার, আশপাশের সকলকেও যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির আওতায় নিয়ে আসতে হয়, পরিবেশ ঠিক না হ'লে তারাই নিয়তির মতো কাজ করে।

কেষ্টদা—যদি অন্য কোন শক্তি এসে পড়ে আমাদের দেশে, আমাদের attitude (মনোভাব) তাদের প্রতি কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের attitude (মনোভাব) থাকবে religious (ধর্ম্মীয়), আমরা ঈশ্বর মানি, ধর্ম্ম মানি, প্রেরিত মানি, রাজাকে বা রাজশক্তিকে জানি ধর্ম্মরক্ষক ব'লে, আর ধর্ম্ম বলতে বুঝি—'যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ' (যাতে নিজের ও অপরের জীবন ও বৃদ্ধি ধৃত হয়, তাই ধর্ম্ম)। আবার, এ-কথাও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আমরা কা'রও prophet (প্রেরিত)-কে অস্বীকার করি না, বরং প্রত্যেককেই নিজের ব'লে জানি ও মানি। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকামী কা'রও সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। এতে কা'রও চটার কারণ থাকবে না।

কেষ্টদা- আপনি ইষ্টভৃতির উপর এত জোর দেন, কিন্তু কেউ যদি জেলে আটকা পড়ে এবং সেখানে কোন সুযোগ না পায়, তখন কী করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- ভাতের গ্রাসটা দেবে, ভাত যদি না পায় তবে জল নিবেদন করবে, জল যদি না পায় তবে সীতা যেমন বালির পিণ্ড দিয়েছিলেন, অগত্যা সেইরকমভাবে বালি বা মাটি দিয়ে ইষ্টভৃতি করবে, তা'ও যদি না পায়, পরমপিতার দান বাতাস তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, আর সর্ব্বশেষে মানস-উপচারে নিবেদন তো আছেই। সেখানেও চেষ্টা করতে হবে সক্রিয়ভাবে ইষ্টের

ইচ্ছা পরিপূরণের ভিতর-দিয়ে যাতে তাঁকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করা যায়।

দেড় বৎসরের উপযোগী ধান-চাল সংগ্রহ ক'রে রাখা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, আমি কতদিন আগে থেকে এ-কথা বলছি। এমন অবস্থা আসতে পারে যে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়তো একেবারে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে যাবে, ক্ষুধার অন্নও অমিল হ'য়ে পড়বে। কিন্তু পেট তো আর কা'রও কথা শুনবে না, দুটো দানা পেটে দেওয়াই লাগবি। তাই চালটা ঘরে থাকলে, আর কিছু না হোক, তা' ফুটিয়ে দুটো নুনভাত খেয়েও তো বেঁচে থাকা যাবে। ....ব্যক্তিগতভাবে জমি কেনা ও চাষবাসের দিকে নজর দেওয়ার কথা এই অধিবেশনেও আপনারা সবাইকে বলবেন। বিপদের দিনে পরস্পর পরস্পরকে যাতে দেখে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খোঁজখবর নেয় তা' কিন্তু করা একান্ত দরকার। কর্ম্মীরা নিজেরা তো এটা করবেই, আবার লক্ষ্য রাখবে, সৎসঙ্গীরাও auto-initiative responsibility (স্বতঃ-স্বেচ্ছ দায়িত্ব) নিয়ে এটা করে কিনা। সত্তা সংরক্ষণকল্পে এই fellow-feeling (পারস্পরিকতা) গজিয়ে তোলা চাই-ই। যারা নিজে থেকে না করে, তাদের দিয়ে করিয়ে-করিয়ে রপ্ত না ক'রে দিলে কিন্তু হয় না। শুধু service (সেবা) দেবার একটা বিপদ আছে। মানুষ তাতে মনে করে, তাদের কাজ হ'লো service (সেবা) নেওয়া, প্রত্যাশা বেড়ে যায়, এবং সেই প্রত্যাশা পূরণ না হ'লে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু অন্যকে যে সেবা দিতে হয়, সেটা মানুষকে দিয়ে করিয়ে-করিয়ে ধরিয়ে দিতে হয়। নইলে শুধু সেবা দিয়ে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয়। সেবার circulation (ব্যাপ্তি) হয় না, স্বার্থপর মানুষের স্বার্থের তলহা টানে তলিয়ে যায়। কিন্তু ভালমানুষ যারা, তারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়। তারা বরাবর অপরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে চলতে চায় না। অসময়ে অন্যের সাহায্য পেলে সেইটেই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। তাকে তো দেয়ই, আবার অসময়ের ঐ উপকারের কথা স্মরণ ক'রে অন্য কেউ বেকায়দায় পড়লে তাকেও প্রাণপণ সাহায্য ক'রে বিপন্মুক্ত করতে চেষ্টা করে। এই সব লোককে সেবা দেওয়া সার্থক হয়। অল্প একটু সেবা যে পৃথিবীতে কত সেবার আমদানী করে, তার লেখাজোখা নেই। মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনেছি। ছেলেবেলায় তিনি নাকি দরিদ্র ছিলেন, সেই অবস্থায় একজন প্রতিবেশী তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু ঐ কৃতজ্ঞতার ঋণস্বরূপ তিনি যে আজীবন ঐ পরিবারের জন্য কত ক'রে গেছেন তার ইয়ত্তা নাই। আবার, তাঁর ব্যক্তিগত দান-ধ্যানের তো তুলনাই নাই। এইরকম পরমস্ত প্রাণ যাদের তাদের সেবা করায় একটা আত্মপ্রসাদ আছে। এটা ব্যক্তিগত লাভের দিক দিয়ে বলছি না। তোমার সেবা সাহায্যে এমনতর একটা মানুষও যদি দাঁড়িয়ে যায় জীবনে এবং সে যদি আবার দেশের দশের উপকারে লাগে, তখন নিজেকেই ধন্য মনে হয়।

শরৎদা (হালদার)—ঋত্বিক্-অধিবেশনে দীক্ষাদান ও কর্ম্মিসংগ্রহের বিষয়ও তো জোর দিয়ে বলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষাদানের কথা তো বলবেনই, ঐই-ই তো মূল কাজ। দীক্ষা মানেই দক্ষতার অনুশীলন—যা' করতে-করতে সর্ব্বতোমুখী দক্ষতা স্বতঃই বেড়ে ওঠে। তবে দীক্ষিতের nurture (পোষণ)-এর জন্য কর্ম্মী চাই-ই। অগণ্য-নগণ্য লোকেরও প্রভূত দাম হয় যদি তারা ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধভাবে সুসংগঠিত হয়। শূন্য কামে লাগে যদি আগে থাকে এক। উপযুক্ত কর্ম্মী যদি হয়, সে যথাযথ সমাবেশ, যোজনা ও পোষণার ফলে একটা তথাকথিত অকর্ম্মণ্য মানুষকেও অনেকখানি করিৎকর্ম্মা ও উপযোগী ক'রে তুলতে পারে। মানুষ-গুলিকে কাজে লাগাবার মানুষ যদি থাকত, তাহ'লে অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত। নিজে থেকে ঠিকভাবে চলবার মতো মানুষ তো বেশী থাকে না। তাদের চালিয়ে-চালিয়ে চালু ক'রে দিতে হয়।

এরপর সৎসঙ্গের জন্য জমি-সংগ্রহের কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—

(১) প্রথমতঃ দেখতে হবে, যেখানে জমি সংগ্রহ করছি সে জায়গা আমাদের কাজের পক্ষে সুগম ও সুবিধাজনক কিনা। যদি সুগম ও সুবিধা-জনক হয় এবং profitable (লাভজনক) করার পক্ষে বিশেষ কোন বেগ পেতে না হয়, এমনতর জায়গায় জমি সংগ্রহ করা উচিত।

(২) জমি চাষ-আবাদ করতে হ'লে লোক-সংগ্রহ করতে হবে এবং তাদের বাসস্থানাদি ঐ জমিতেই করতে হবে। সে-দিক দিয়ে আমাদের পক্ষে সহজ ও সুবিধাজনক কী হ'তে পারে তদ্বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

(৩) তৃতীয়তঃ চেষ্টা করতে হবে, rent-free land (লাখেরাজ জমি) যাতে পাওয়া যায়। একদম rent-free (লাখেরাজ) যদি না হয়, তাহ'লে নামমাত্র খাজনায় লাখেরাজের মতো যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

(৪) চতুর্থতঃ, ঐ নামমাত্র খাজনা যা' আমাদের দেয়, তা' যে-বৎসর যতটা চাষ-আবাদ করতে পারি, ফসল পাওয়ার পর সেই বৎসর সেই পরিমাণ জমির জন্য দিলে যাতে চলতে পারে, তেমনতর চুক্তি করতে পারলে ভাল হয়। অর্থাৎ, জমিতে চাষ-আবাদ ও ফলন না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তার খাজনা দিতে বাধ্য থাকব না।

আর, স্মরণ রাখতে হবে, একলপ্তে যত বেশী জমি চাষ-উপযোগী করতে না চাষ করতে খরচ-খরচা যেখানে যত কম, সে জমি তত পছন্দসই।

খলিলদা এসে আশ্রম-প্রাঙ্গণে রোদ-পিঠ ক'রে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একগাল হেসে স্নেহভরে বললেন—আসেন, আসেন খলিলদা! আজ একটু চেহারাটা মানুষের মতো দেখাচ্ছে। কাল যেন চেনা যাচ্ছিল না—উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে কেমন জানি হ'য়ে গিছিলেন।

খলিলদা উপরে উঠে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খলিলদার কাছে কলকাতার অবস্থার কথা বিস্তারিত শুনতে লাগলেন।

পরে সহাস্যে বললেন—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যারা ঠিকমত করে, তাদের সব অবস্থায় মনে কিন্তু খুব বল থাকে। আর, পরমপিতার দয়ায় তারা অভাবনীয়ভাবে রক্ষাও পায় খুব। এর যে কি সুফল তা' যারা যতই করবে, তারা ততই বুঝতে পারবে। পরমপিতা মাল আমদানী করিছেন খুব ভাল।

১১ই পৌষ, রবিবার, ১৩৪৯ (ইং ২৭।১২।৪২)

ঋত্বিক্-অধিবেশন উপলক্ষে বাইরে থেকে দাদারা অনেকেই এসেছেন। কুষ্টিয়া থেকে অধ্যাপক অনিলদা (সরকার) একদল ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন তাঁরা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় তক্তপোষে ব'সে তাদের সঙ্গে হাসিখুশিভাবে গল্প করছেন। ভাইয়েরা সব মাটিতে বসেছেন। অন্যান্য লোকজনও আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমাদের এখানে কষ্ট হ'চ্ছে না তো? আমাদের এখানে অনেক অসুবিধা। থাকবার, খাবার, পায়খানার অনেক অসুবিধা আছে। এখন আবার লোকজনও অনেক এসে গেছে।

ভাইয়েরা একবাক্যে বললেন—আমরা ভালই আছি। আমাদের কোন অসুবিধা হ'চ্ছে না। একসঙ্গে সবাই মিলে আনন্দে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনন্দে থাকলেই হ'লো। তাতে অসুবিধাগুলি গায় লাগে না। আমার এখানকার লোকগুলি নাংলামতন, formality (লৌকিকতা) জানে না, কিন্তু প্রাণ আছে খুব, লোক পেলে খুশি হয়।

ভাইয়েরা—সেটা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করছি। সবার মধ্যে কেমন একটা আপন-আপন ভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা ও আত্মীয়তার ভাব যত থাকে, ততই জীবনটা উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে। ধন-দৌলত যাই বল, মানুষের মতো ধন আর কিছু নেই মানুষের।

একটি ভাই বললেন—আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এমনিতেই কথাবার্তা বলছিলেন, বেশ ছিল। উপদেশ দেওয়ার

কথা বললে আমার মুখে যেন কোন কথা জোয়ায় না। মানুষ আসে, সুখ-দঃখের কথা কয়, বিশেষ কোন সমস্যা থাকলে সে-কথা উত্থাপন করে, আমি যা' জানি, বুঝি, তা'ও বলি। এইভাবে কথাবার্ত্তা চলে। উপদেশ দেওয়া হিসাবে আমি কিছু বুঝি না। তবে অনেক সময় আপনা থেকেও অনেক বলা হ'য়ে যায়। লেখাপড়া তো জানি না, তাই বুদ্ধি ক'রে কিছু বলা হ'য়ে ওঠে না। পরমপিতার দয়ায় যখন যেমন হয়, তখন তেমন হয়। কোন লেখা দেওয়া হ'চ্ছে, একবার যেটা বলা হ'লো, তখন-তখনই যদি সেটা ধ'রে না নেয়, পরে জিজ্ঞাসা করলে প্রায়ই ঠিকমত বলতে পারি না। মুর্খের অশেষ দোষ।

ভাইটি বললেন—আপনি তো শুনেছি মহাজ্ঞানী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আমি জানি না।

ওদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন—ছাত্রদের প্রধান করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাত্রদের প্রধান করণীয় হ'চ্ছে, আদর্শনিষ্ঠ তৎপরতায় বৈশিষ্ট্যকে স্ফুরিত ক'রে তুলে পরিবেশের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সেবার জন্য নিজেদের শরীর, মন, মস্তিষ্ক, চিন্তা, চলন, অভ্যাস, ব্যবহার, কর্ম্মশক্তি ইত্যাদিকে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত ক'রে তোলা।

প্রশ্ন—আদর্শনিষ্ঠ-তৎপরতার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সত্তার একটা সম্বেগ আছে, সেই সম্বেগ নিয়ে কোন শ্রেয়পুরুষে যুক্ত হ'তে হয়, যেমন অর্জ্জুন হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণে, চন্দ্রগুপ্ত হয়েছিলেন চাণক্যে, বিবেকানন্দ হয়েছিলেন রামকৃষ্ণে। এইরকম কোন আদর্শ-পুরুষে মানুষ যদি যুক্ত হয় ও আপ্রাণ অনুরক্তিতে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলে, তাহ'লে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কল্যাণপ্রসূ ও সংহত হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে পারে। নচেৎ একটা মানুষ যদি লাখো-লাখো সৎকথাও জানে, তা'ও কোন কাজে আসে না, বরং ঐ-সব কথা ব'লে মানুষকে আরো ভাঁওতা দিতে পারে। সুতরাং চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মাঙ্গলিক নিয়ন্ত্রণে প্রথম জিনিস হ'লো ইষ্ট বা আদর্শ গ্রহণ অর্থাৎ দীক্ষা। তাই দীক্ষাহীন শিক্ষার কোন দাম ছিল না আমাদের দেশে।

প্রশ্ন—আমি যদি আদর্শের নীতিগুলি মেনে চলি, তাহ'লেই তো হ'লো, দীক্ষাগ্রহণের আর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা বলতে আমি বুঝি, তাঁকে পুরাপুরি গ্রহণ, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ও তার ভিতর-দিয়ে দক্ষতার অনুশীলন। নীতি যাঁর জীবনে মূর্ত্ত, তাঁকে বাদ দিয়ে যদি ঐ নীতিগুলিকে অনুসরণ করতে যাই, তাহ'লে তো ঐ নীতিগুলির নামে ঐগুলি সম্বন্ধে আমার মনগড়া ধারণাকেই অনুসরণ করতে থাকব। এতে স্ব-স্ব obsession (অভিভূতি) বা খেয়ালই গুরুপদবাচ্য হ'য়ে উঠতে পারে আমাদের কাছে। তাতে লাভ কতদূর হ'তে পারে—তা' তো বুঝি না। আবার, তাঁর প্রতি active attachment (সক্রিয় অনুরাগ) ও তাঁর

inspiration-এর (প্রেরণার) ভিতর-দিয়ে concentric self-adjustment (কেন্দ্রায়িত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ) যে কতখানি accelerated (তীব্রগতিসম্পন্ন) হয়, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। তুমি যদি তোমার মাকে ভালবেসে তাঁর নির্দ্দেশ মতো চল এবং তোমার মা যদি তোমাকে বাহবা দেন, উৎসাহ দেন, তাহ'লে সেই চলাটা তোমার কাছে কত সুখকর লাগে?

প্রশ্ন—আপনি জন্মগত বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের কথা বললেন, কিন্তু স্কুল-কলেজে তো সব ছাত্রদেরই একঢালা শিক্ষা হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—একঢালা শিক্ষা হয় ব'লেই তো বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয় না। তবে এর মধ্যেও যদি অভিজ্ঞ, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, বহুদর্শী শিক্ষক থাকেন, এবং তাঁর সঙ্গে যদি ছাত্রের স্কুল-কলেজের বাইরে ব্যক্তিগত মেলামেশা থাকে, তাহ'লে তিনি তাকে অনেকখানি বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী guide (পরিচালনা) করতে পারেন।

প্রশ্ন—লেখাপড়া শিখেও যে আমরা স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের কোন পথ করতে পারি না, এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা শিক্ষাব্যবস্থারই ত্রুটি। আমার মনে হয়, যে-কোন বিষয়ই পড়ানো হো'ক না কেন, তার economic, practical ও social aspect (অর্থনৈতিক, বাস্তব ও সামাজিক দিক)-গুলি ছেলেদের সামনে সুন্দর ক'রে পরিস্ফুট ক'রে তোলা দরকার। সর্ব্বস্তরে agricultural ও industrial training (কৃষি ও শিল্পগত শিক্ষা) হওয়া উচিত compulsory (অবশ্যপাঠ্য)। Science (বিজ্ঞান) পড়াতে গেলেই তার সঙ্গে যেখানে-যেখানে সম্ভব, সেখানে ঐ বিষয়-বস্তুর উপর ভিত্তি ক'রে mechanical, technological, industrial ও commercial adjuncts (যন্ত্রবিদ্যা, কারিগরীবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা ও বাণিজ্যবিদ্যা-সম্পর্কিত সংযোজন) জুড়ে দিতে হবে। ছাত্ররা পড়তে-পড়তেই পরিবেশের প্রয়োজনপূরণী কিছু ক'রে যাতে কিছু-কিছু আয়-উপার্জ্জন করতে পারে এবং স্বোপার্জ্জিত ঐ অর্থ দিয়ে ইষ্ট, পিতা, মাতা, শিক্ষক, পরিবার ও পরিবেশকে মাঝে-মাঝে কিছু উপঢৌকন দিতে পারে—তার ব্যবস্থা করা একান্তই সঙ্গত ব'লে মনে হয়। এতে তাদের একটা আত্মবিশ্বাস গজাবে এবং যে-পরিস্থিতির ভিতরই পড়ুক না কেন, তার ভিতরই উপযোগী কিছু ক'রে দাঁড়াতে পারবে। ছেলেদের independent power of observation ও thinking (স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তার ক্ষমতা) কতখানি বাড়ছে, তার একটা পরীক্ষা হওয়া দরকার। বাস্তব যে পরিস্থিতি ও পরিবেশের ভিতর তারা আছে, তার সমস্যা কী, প্রয়োজন কী এবং তার সমাধান কীভাবে হ'তে পারে—এ সম্বন্ধে কলেজস্তরের ছাত্ররা যাতে স্বাধীনভাবে খোঁজ-খবর নেয়, চিন্তা করে, আলাপ-আলোচনা করে, চেষ্টা করে,

তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। মানুষ-সম্বন্ধে, সমাজ-সম্বন্ধে অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে দিতে হবে শিক্ষার ভিতর-দিয়ে। সেটা শুধু academic interest (তত্ত্বগত অনুরাগ) হ'লে চলবে না। উদগ্র সেবাবুদ্ধি জাগিয়ে দিতে হবে। শিক্ষকরা যত এমনতর হবেন, ছাত্রদের ভিতরও তা' তত সংক্রামিত হবে। আর, শিক্ষার ব্যাপারেও প্রধান কথা জন্ম। শুভ-সংস্কার ও সম্ভাব্যতা-সম্পন্ন মানুষ যদি না জন্মায়, তবে শুধু শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর-দিয়ে মানুষ তৈরী হবে না।

বিশ্বনাথদা (দত্ত) বললেন—জন্ম তো ভগবানের হাত, তার উপর তো মানুষের কোন হাত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের কোন হাত নেই বলেন কি? বিধিমাফিক চললে বিহিত ফল পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? ভগবানের এক নাম বিধি, আর ভগবান মানে ভজমান, সেবমান। তাঁর বিধির সেবা করতে হবে, তবেই আমরা বাঞ্ছিত ফলের অধিকারী হব।

বিশ্বনাথদা—আমাদের কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে-থাওয়া ঠিকভাবে দিতে হবে।

বিশ্বনাথদা—বিয়ে-থাওয়ার রীতি যাদের মধ্যে যে-রকম তারা তো সেইভাবে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই রীতিটা ঠিক হওয়া চাই। বিয়েটা এমন ক'রে দিতে হবে যাতে দাম্পত্য প্রণয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরীরে, মনে ও চরিত্রে উৎকর্ষ লাভ করে এবং সন্তানসন্ততিও উন্নততর হয়। বংশপরম্পরায় মানুষ যদি বেড়ে না চলে, বাপের থেকে ছেলে যদি আরো বড় না হয়, আরো ভাল না হয়, তাহ'লে হ'লো কী? পাত্র ও পাত্রীর বংশ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, চরিত্র, ইষ্টপ্রাণতা, দক্ষতা, গুণপনা, বয়স, প্রকৃতি ইত্যাদি দিক দিয়ে সম্যক্ সঙ্গতি আছে কিনা ভাল ক'রে দেখা দরকার। প্রত্যেকের জৈবী সংস্থিতির একটা ঔপাদানিক সমাবেশ ও সংগঠন আছে, সেটা আবার সুস্থ, সতেজ ও তরতরে থাকে বৈশিষ্ট্যানুগ উৎকর্ষমুখী অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে, তার ভিতর-দিয়ে বংশানুগ ও ব্যক্তিগত সদ্‌গুণগুলি থাকে dominant (উচ্ছ্রয়মান) হ'য়ে। পুরুষের বংশানুক্রমিক ও ব্যক্তিগত গুণগুলি যেখানে dominant (উচ্ছ্রয়মান), নারীর বংশানুক্রমিক ও ব্যক্তিগত গুণগুলিও যদি সেখানে dominant (উচ্ছ্রয়মান) ও nurturing (পোষণী) হয়, আর উভয়ের psycho-physical constitution (দৈহিক ও মানসিক সংগঠন) যদি compatible (সামঞ্জস্যপূর্ণ) হয়, অর্থাৎ তারা যদি সমজাতীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কারসম্পন্ন অথচ ভিন্ন গোত্রীয় হয়, এক কথায় সদৃশ সম্মিলন যদি ঘটে, তাহ'লে তার ফলে সন্তানসন্ততির উন্নততর হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ, সেখানে স্ত্রীর ডিম্বকোষ ও পুরুষের

শুক্রকীটের structure, tone, tune and temper-এর (গঠন ও গতি-প্রকৃতির) মধ্যে এমনতর একটা affinity (মিল) থাকে যে, দুজনের highest ও best qualities (উচ্চতম ও সর্ব্বোত্তম) গুণগুলি যেন blend ক'রে (মিশে গিয়ে) এক হ'য়ে সন্তানে রূপ পরিগ্রহ করে। কারণ, সেখানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের fulfilling ও nurturing (পরিপূরণী ও পরি-পোষণী) এবং তা' biologically, genetically, socially, temperamentally, culturally (জীববিদ্যা ও জননবিদ্যার দিক দিয়ে, সামাজিক-ভাবে, প্রকৃতিগতভাবে, কৃষ্টিগতভাবে) সব দিক দিয়ে। আদত কথা হ'লো, sperm (শুক্রকীট) ও ovum-এ (ডিম্বকোষে) নিহিত gene-এর (জনির) ভিতর hereditary instinct (বংশগত সংস্কার)-গুলি supermicrospic granules-এর (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দানার) মতো থাকে, নারী-পুরুষের ঐ instinctive granule (সহজাত দানা)-গুলি সঙ্গতিশীল হওয়া প্রয়োজন এবং তেমনতর সংযোগেই সন্তান ভাল হ'তে পারে। কারণ, ঐ সঙ্গতিশীল সংযোগসম্ভূত জীবনকণাই হ'লো, তার inner core of being (সত্তার অন্তরমর্ম্ম)। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই harmony-এর (সঙ্গতির) অভাব যেখানে যত বেশী, সন্তানও সেখানে হয় তত অপকৃষ্ট। সেখানে সদ্‌গুণগুলি dominant (উচ্ছ্রয়মান) না হ'য়ে অবগুণগুলিই dominant (উচ্ছ্রয়-মান) হয় এবং সদ্‌গুণগুলি ক্রমশঃ recessive (অপসৃয়মাণ) হ'তে থাকে। কারণ, সদ্‌গুণগুলির বিকাশের জন্য যে nurture, affinity ও tuning (পোষণ, মিল ও একতানতা) প্রয়োজন, সেগুলির অভাব ঘটে সেখানে। তাই বিয়ে-থাওয়া খুব হিসাব ক'রে দিতে হয়, আর প্রত্যেক পরিবারে তাদের কুলগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী উৎকর্ষ-মুখী আচার, অনুষ্ঠান, নীতি, পদ্ধতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অনুশীলন যাতে পূর্ণমাত্রায় চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার। নারী-পুরুষের অন্তরে যদি একটা সক্রিয় সুনিষ্ঠ বৃদ্ধিমুখী সাধনার সুর নিরন্তর ধ্বনিত না হয়, তাহ'লে তাদের মাধ্যমে মহৎ মানুষের আবির্ভাব হ'তে পারে না। শুধু সবর্ণ বিয়ের বেলাতেই নয়, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের বেলায়ও নারী-পুরুষের বর্ণ, বংশ ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে তা' করতে হবে।

জগৎদা (চক্রবর্ত্তী) প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ কেন? এর বৈজ্ঞানিক কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর আমার মনে হয়, less evolved sperm (স্বল্পবিবর্ত্তিত শুক্রকীট) যদি more evolved ovum (অধিকতর বিবর্ত্তিত ডিম্বকোষ)-এর fertilising agent (উৎপাদক) হিসাবে কাজ করতে যায়, সেখানে biological law-এর (জীববিজ্ঞানসম্মত বিধির) উপর একটা outrage

(অত্যাচার) করা হয়। তাই ovum (ডিম্বকোষ) সেখানে sperm (শুক্র-কীট)-কে repel (প্রতিরোধ) করতে চায়, মিলনকালীন এই দ্বন্দ্বের ফলে মাতৃধাতু ও পিতৃবীজের বৈশিষ্ট্য বিধ্বস্ত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। সন্তান না পায় মায়ের ভালটা, না পায় বাপের ভালটা। সে একটা কিম্ভুত-কিমাকার পদার্থে পরিণত হয়। তার প্রকৃতি হয় সাম্যহারা, দ্বন্দ্ব-প্রবণ, পরিধ্বংস-প্রসূ। বিপর্য্যয়ী-স্বভাবের দরুন সে নিজের সঙ্গেই নিজে পেরে ওঠে না। যা' কিছু সুন্দর ও মহৎ, তার বিরুদ্ধেই হয় তার অভিযান। তার innate luxury (অন্তঃস্যূত বিলাস) হয় to discard the great (মহতের বর্জ্জন)। এক কথায়, প্রয়াস তার হয় শ্রেয়-বিরোধী, অস্তিত্ব-বিলোপী। যে-নীতি জাতির পক্ষে যত কল্যাণকর, সেই নীতির পরিপন্থী সে ততখানি। সে যে কতখানি অব্যবস্থ, সে যে কখন কী করবে, তা' সে নিজেই জানে না। এমন লোক আদৌ নির্ভরযোগ্য হ'তে পারে না, তারা বিশ্বাসঘাতক হবেই। বিরুদ্ধ সংযোগে রজোবীজের উপাদানের মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ও ভাঙ্গন সংঘটিত হয়, প্রতিলোম-জাতকের মধ্যেও ঐ বৈশিষ্ট্য তাই স্বভাবসিদ্ধ দেখা যায়। তারা যেখানে যাবে সংহতিতে ভাঙ্গন ধরাবেই। তারা যদি মহা genius (প্রতিভাধর)-ও হয়, তারও effect (ফল) হবে প্রায়শঃই destructive (বিধ্বংসী)। ফলকথা, তারা অপকর্ষী ব্যত্যয়ী চলনে না চ'লেই পারে না, এবং ওতেই গৌরব বোধ করে। ঐ চলনে চলতে না পারলে অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু সদ্বংশজাত কোন লোক অন্যায় করলেও সাধারণতঃ তার অন্তরে সেজন্য একটা জ্বালা ও ব্যথার কান্না লেগে থাকেই, তাই তার পরিবর্ত্তনও যে-কোন মুহূর্ত্তে হ'তে পারে। কিন্তু এদের পরিবর্ত্তন সহজে হবার নয়। এরা সব সময় extreme-এ (চরমে) চলে, কোন সময় হয়তো অত্যন্ত বদরাগী, আবার কখনও হয়তো মাত্রাছাড়া ঠাণ্ডা-মেজাজী, কখনও হয়তো উগ্র আসুরিক ভাব-সম্পন্ন ও অতিমাত্রায় তেজী, আবার কখনও হয়তো ম্রিয়মাণ, বিষণ্ণ ও কাপুরুষের মতো ভীতু ও দুর্ব্বল। কা'রও-কা'রও চরিত্রে আবার বিশেষ একটা extreme (চরম)-ই prominent (প্রধান) ও permanent (স্থায়ী) দেখা যায়। মোটপর, সাম্যসঙ্গত চলন এদের মধ্যে পাওয়াই দুর্লভ। আমার অনেক দেখা আছে। কয়েকটা মেয়ে আমার কাছে confess (স্বীকার) করেছে যে, প্রতিলোম কোন সংযোগ হবার সময় তাদের যেন জলে-ডোবা মানুষের মতো অবস্থা হয়। পূর্ব্বপুরুষগণ একযোগে যেন ত্রাহি-ত্রাহি চিৎকার করতে থাকেন, আর্ত্তস্বরে বলতে থাকেন "বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও। আমাদের এমন ক'রে সর্ব্বনাশ ক'রো না, এমন ক'রে অধোগামী ক'রো না।" বুক ফেটে যেতে থাকে তাদের, মৃত্যুযন্ত্রণার মতো মনে হয়। মনে হয় 'গেলাম, গেলাম'। অনেক সময় unconsciously (অজ্ঞাতসারে) লাথি মেরে বসে পুরুষটাকে। এই যে

লাথি মারে, সে তার সত্তা প্রতিঘাত করে ব'লে। পরে হয়তো blunt (ভোঁতা) হ'য়ে যায়। কিন্তু pure breed (খাঁটি জন্ম) হ'লে প্রতিলোম-সঙ্গতির বেলায় প্রথমটা সে কিছুতেই সায় দেবে না। আবার প্রতিলোম যৌন-সংশ্রবের ফলে প্রায়ই দেখা যায়, নারী-পুরুষ রুগ্ণ ও বিকৃতিগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে। পৃথিবীতে যদি কোন জিনিস থাকে যা' সর্ব্বৈব অকল্যাণকর, যার কোনদিক দিয়ে কোনরকম redeeming feature (উদ্ধারণী লক্ষণ) নেই, সে হ'লো প্রতিলোম। এমনতর একটি পাপ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সর্ব্বনাশ এর সর্ব্ব অঙ্গে।

বিপিনদা (সেন)—যাদের অনুলোম-প্রতিলোম সম্বন্ধে ধারণা নেই, তাদের মধ্যে প্রতিলোম হ'লে কি কিছু ক্ষতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরুদ্ধ সংযোগ ঘটায় biological plane (জীববিজ্ঞানগত স্তর)-এ যে-সব action, reaction (ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া) হবার তা' হয়ই। সন্তানসন্ততিও ভাল হয় না। আর, মূলগত অমিল যেখানে, মনের মিলও সেখানে হয় ব'লে মনে হয় না। মন তো শরীর, জীবন, কুলপ্রবাহিত সু-সংস্কার, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে নয়। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মিল বলতে পরস্পরের পরস্পরকে সওয়া-বওয়া ও ভাললাগার ব্যাপার আছে। শুধু পোষাকী মিল হ'লে হবে না।

রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—প্রতিলোম যৌন-সংশ্রব যখন এতখানি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার, তখন তার ভিতর-দিয়ে সন্তানের উৎপত্তি হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, উভয়েই মনুষ্যজাতিভুক্ত ব'লে সন্তান জন্ম-গ্রহণ করতে পারে কিন্তু মৌলিক নীতির ব্যত্যয় হয় ব'লে সন্তান জীবনীয়-গুণপনা ও সম্পদে সমৃদ্ধ হ'তে পারে না, বরং অস্তিত্ব-অপলাপী অসদ্‌গুণেরই প্রাবল্য দেখা দেয়। সমগ্র জাতির ভিতর এমনতর চলতে থাকলে, এর পরিণাম কী হ'তে পারে, তা' সহজেই অনুমেয়।

কালীষষ্ঠীমা ও কালীদাসীমাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—পৌষ-সংক্রান্তি কবে রে?

কালীদাসীমা—এখনও অনেক দেরী আছে।

কালীষষ্ঠীমা রহস্য ক'রে বললেন—পোষেলীর খোঁজ নিচ্ছেন কেন? পিঠে খাতি ইচ্ছে করে নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাপান যেমন বোমা ফেলতিছে, দ্যাখ্ কদ্দিন পিঠে খাবার দেয়।

কালীষষ্ঠীমা—আপনি থাকতি আমাদের কী করবি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো ঠুটো জগন্নাথ। আমার হাত-পা যারা, তারা নড়েচড়ে, তাহ'লে তো হয়!

তারাপদদা (রায়)—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে কি বিয়ে-থাওয়া হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ের মূল principle (নীতি)-গুলি fulfilled (পরিপূরিত) হয় যেখানে, সেখানেই বিয়ে হ'তে পারে। যারা ঈশ্বরকে মানে, প্রেরিত পারম্পর্য্য স্বীকার করে, পিতৃপুরুষকে স্বীকার করে ও তাঁদের নাম ভাঁড়ায় না, বর্ণ-ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে যারা অনুশীলন ক'রে চলে, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী শাশ্বত প্রাচীন বিধান ও কুলকৃষ্টিকে যারা পরিত্যাগ তো করেই না বরং তারই পরিপূরণতৎপর যারা, যারা নিজের বৈশিষ্ট্য হারায় না এবং অন্যের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করে ও পোষণ দেয়, যারা প্রতিলোম-পরিণয়, বিবাহ-বিচ্ছেদ বা আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে ছাড়া নারীর পত্যন্তর গ্রহণ অনুমোদন করে না, ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয় না যারা বরং নিয়ত পরিশুদ্ধি-প্রয়াসশীল, শুচিতা ও সতীত্ব সম্পূজিত যেখানে, সৎ-দীক্ষা ও সদাচার-অনুপালনশীল যারা, তারা যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হো'ক না কেন, তাদের পরস্পরের মধ্যে সদৃশ ঘরে ও সমীচীন অনুলোমক্রমে নারী-পুরুষের সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতি দেখে বিয়ে-থাওয়া চলতে পারে। একেই বলে compatible marriage (সুসঙ্গত বিবাহ)। কুলে, শীলে যদি মেলে তাহ'লে বৈষ্ণব ও শাক্ত পরিবারের মধ্যে কি বিয়ে-থাওয়া চলতে পারে না?

তারাপদদা—তা' চলবে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যদি চলে, তবে যেভাবে বললাম ঐভাবে মিল ক'রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধি-অনুক্রমিক বিবাহ চলতে বাধা কী? তাছাড়া আমার মনে হয়, বিবাহের শাস্ত্রসম্মত বিধিকে অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহ আমরা আশু প্রবর্ত্তন করতে পারি, অবশ্য সব দিককার compatibility-এর (সুসঙ্গতির) সঙ্গে একটা compatible sense of understanding (সুসঙ্গত পারস্পরিক বুঝ) যদি থাকে। তা' যদি দেখেশুনে করা হয়, আমার মনে হয়, গড়পড়তা স্বাস্থ্য, আয়ু, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য, কর্ম্মক্ষমতা বেড়ে যাবে। তাছাড়া, জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের দিক দিয়ে লাভ হবে। বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী, মাদ্রাজী, গুজরাটি, মারাঠী ইত্যাদির মধ্যে যদি বিধিমাফিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহ'লে পরস্পর পরস্পরকে আরো ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে। পরস্পর-পরস্পরের ভাষাও অনেকখানি শিখে ফেলবে, এবং তা'তে প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাই সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার আদিভাণ্ডার হ'লো সংস্কৃত। একজন যদি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করতে চায়, তাহ'লে তার স্বভাবতঃই নজর পড়বে সংস্কৃতের দিকে। কারণ, সংস্কৃতের সঙ্গে তার মাতৃভাষারও মিল

আছে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষারও মিল আছে। এই মিলটা খ‍ুঁজে বের করতে পারলে মাতৃভাষায়ও অধিকার বাড়বে। এর ভিতর-দিয়ে প্রাদেশিক ভাষাগ‍ুলি বজায় থেকেও সংস্কতচর্চা সারাভারতে ছড়িয়ে পড়বে। সংস্কৃতচর্চা যদি তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, একদিন সংস্কৃত সমগ্র ভারতের common language (সাধারণ ভাষা) হ'য়ে ওঠা অসম্ভব নয়। অবশ্য এগ‍ুলি consciously (সচেতনভাবে) guide (পরিচালনা) করা লাগে। সমাজের মাথা যারা, তাদের সব সময় ভাবা লাগে, চেষ্টা করা লাগে—কেমন ক'রে বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সংহতি বৃদ্ধি পায় সমাজে। মান‍ুষের প্রকৃত মঙ্গলের কথা কে ভাবে? বেশীর ভাগেরই দেখি, খেয়াল মাফিক হ‍ুজ‍ুগ ক'রে সস্তায় নাম কেনার মতলব।

অনিলদার ছাত্রদের মধ্যে একজন সশ্রদ্ধভাবে বললেন—আজ অনেক কথা শিখলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্মিত নয়নে চাইলেন তার দিকে।

১৩ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৯ (ইং ২৯।১২।৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাস‍ুতে আছেন। ১৯তম ঋত্বিক্-অধিবেশন। দাদারা সব জিনিসপত্র নিয়ে এসে প্রণাম করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিম‍ুখে কুশল-প্রশ্নাদি করছেন। শীতের দিন অনেকেই রাত জেগে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকেই ঠিকঠাক ক'রে নিতে বলছেন। তাই যে যা' এনেছেন, শ্রীশ্রীবড়মার কাছে পেশছে দিয়ে অনেকেই অতিথিশালার দিকে যাচ্ছেন। কেউ-কেউ আশ্রমের কোন বাড়ীতে যাচ্ছেন। আগেও অনেকে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছ‍ু লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন। সদ্য আগত দাদাদের সঙ্গে 'জয়গ‍ুর‍ু' ব'লে সম্ভাষণাদি করছেন। পরস্পর পরস্পরের খোঁজখবর নিচ্ছেন। বহ‍ুদিন পরে এক পরিবারের বিভিন্ন লোক বাড়ীতে এসে যেন সমবেত হয়েছেন। তাই আনন্দ আর ধরে না। প্রত্যেকেরই ব‍ুদ্ধি অপরের স‍ুখ-স‍ুবিধার ব্যবস্থা কতটা ক'রে দিতে পারেন। কলকাতা থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সবার ম‍ুখেই এক কথা—পরিবারবর্গকে নিরাপদে রাখা যায় কোথায়? এইসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হ'চ্ছে। কেউ-কেউ দাঁতন ক'রে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের পাশে কলতলায় গিয়ে ম‍ুখ ধ‍ুয়ে নিচ্ছেন। কেউ-কেউ রোদ পিঠ ক'রে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে নানাজন নানাভাবে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে স‍ুশীলদা (বস‍ু), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), জগজ্জ্যোতিদা (সেন), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী), হরেরামদা (চক্রবর্ত্তী), জ্ঞানদা (দত্ত), গৌরদা (দাস), বিল্টুদা (সিংহ),

করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), অনাথদা (মুখোপাধ্যায়), হেমকেশদা (চৌধুরী), লক্ষ্মীদা (দলুই), কিরণদা (ঘোষ), ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী), দুলালদা (নাথ), বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য), সহায়রামদা (নাথ), যতীনদা (নাথ), ক্ষেত্রদা (শিকদার), প্রিয়নাথদা (বসু), মণিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সুরেনদা (বিশ্বাস), সুবোধদা (সেন), ভজহরিদা (পাল), প্রবোধদা (মিত্র), ব্রজেনদা (ঘোষ), হিরণ্ময়দা (মুন্সী), গুরুদাসদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), মন্মথদা (দে), বিশ্বেশ্বরদা (দাস), জনার্দ্দনদা (বসু), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), বাসুদেবদা (গোস্বামী), জিতেনদা (মিত্র), কুঞ্জদা (দাস), প্রমথদা (দাশগুপ্ত), অভয়দা (ঘোষাল), কাশীশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), প্রভাতদা (দে), বিনয়দা (বিশ্বাস), রমণদা (পাল), সতীশদা (চৌধুরী), চতুর্ভুজদা (উপাধ্যায়), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা), চুনীদা (রায়চৌধুরী), ননীদা (দে), সত্যেনদা (মিত্র), মতিদা (চট্টোপাধ্যায়), শ্রীভূষণদা (মিত্র), বলরামদা (ঘোষ), হরেনদা (বসু), ভূপতিদা (সাহা), নৃপেনদা (বসু), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), ধীরাজদা (মুখোপাধ্যায়), স্মরজিৎদা (ঘোষ), হরিচরণদা (গঙ্গোপাধ্যায়), বৈদেহীদা (কর), ভোলানাথদা (সরকার), আশুদা (দত্ত), অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য), সন্তোষদা (রায়) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন।

সুবোধদা বললেন—আপনার কথা ও লেখার ভিতর-দিয়ে আপনার ভাবধারা মোটামুটি বোঝা যায়, কিন্তু সৎসঙ্গ-আন্দোলনের কর্ম্মপরিকল্পনা স্তর-পারম্পর্য্য আরো বিশদভাবে দেওয়া না থাকলে, আমাদের চোখের সামনে করণীয়-সম্বন্ধে একটা ছবি ফুটে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাস্তব অবস্থা কোথায়, কখন যে কী হবে সে-সম্বন্ধে একটা ছক বেঁধে দেওয়া যায় না। আমাদের গন্তব্য যদি ঠিক থাকে তবে অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা ক'রে গন্তব্যে যেয়ে পেঁছাতে পারি। বাস্তবতাকে বিবেচনা ক'রে তার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন-অনুযায়ী পরিকল্পনা তোমরা কর, তাই-ই ভাল। নচেৎ অনেক সময় super-imposition (উপর থেকে চাপান) হয়। তাই বিশিষ্ট বাস্তবতার বুকের উপর দাঁড়িয়ে, সমস্যা ও প্রয়োজনের সমাধান করতে গিয়ে plan (পরিকল্পনা) evolve করে (বিবর্ত্তিত হয়) সেই-ই ভাল। তার শিকড় অনেক শক্ত হয়। নচেৎ বহু অবাস্তবতার আমদানী হয়, যা' জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায় না। আমার প্রায় কথার মধ্যেই পাবে বৈশিষ্ট্যপূরণী। পৃথিবীর কোন দুটো মানুষ একরকম নয়, প্রত্যেকেই বিশিষ্ট, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। অবস্থা, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনও কোন দুজনের এক নয়। তাই বিশিষ্টতার বোধ না থাকলে, সবার জন্য আমার পছন্দ-অনুযায়ী একঢালা ব্যবস্থা করতে থাকব, তা'তে ভাল না হ'য়ে মন্দও হ'তে পারে। তোমার বাড়ীতে হয়তো বহুলোককে নিমন্ত্রণ করেছ, তুমি খুব ঝাল

খাও এবং সবাই তোমার মত ঝাল পছন্দ করে সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে যদি প্রত্যেকটি তরকারিতে অত্যধিক ঝাল দেবার ব্যবস্থা কর, তাহ'লে কিন্তু অনেকেরই খাওয়া আর হবে না, কারণ, সবাই অতো ঝাল খেতে অভ্যস্ত নয়। তাই মনগড়া ধারণার উপর দাঁড়িয়ে চলতে নেই, চলতে হয় বাস্তবতাকে অনুধাবন ক'রে, আর সেইটেই হ'লো বৈজ্ঞানিক চলন। তুমি যেমন ডাক্তারী পড়েছ, চিকিৎসা-সম্বন্ধে সাধারণ কতকগুলি নীতি ও জ্ঞান লাভ করেছ, কিন্তু রোগী চিকিৎসা করতে গেলে যার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন ও উপযোগী তেমনতর ঔষধই দাও, প্রত্যেকের জন্য এক prescription (ব্যবস্থাপত্র) কর না। তোমাদের যেমন যাজন করতে বলেছি, যাজন-সম্বন্ধে সাধারণ কিছু নীতি ও নির্দ্দেশ দেওয়া ছাড়া কি কোন বিশদ পরিকল্পনা দেওয়া যায়? প্রত্যেকটি মানুষের বেলায়ই তো procedure (পদ্ধতি) হবে স্বতন্ত্র। তাই আমার কতকগুলি কথা মাথায় রাখলে হয়—আমি চাই প্রেরিতদের স্বীকার ও অনুসরণ, তাঁদের মধ্যে ভেদ না করা, বর্ত্তমান প্রেরিত পুরুষের মধ্যে পূর্ব্বতনদের পরিপূরণ অনুধাবন করা, পিতৃকৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অনুসরণ, বর্ণাশ্রমের অনুপালন, দশবিধ সংস্কারের প্রবর্ত্তন, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচারের অনুষ্ঠান, বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহ, সুপ্রজনন, প্রতিলোমের একদম নিরসন, আদর্শমুখী, বৈশিষ্ট্যপালী, কর্ম্ম ও সেবামুখর শিক্ষা, উদ্ভাবনী, সেবাসুসন্ধিৎসু কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান, জাতির স্বাস্থ্য, আয়ু ও কর্ম্মশক্তির পুনরুদ্ধার, আপদ-ও-অসৎ-নিরোধী ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার প্রস্তুতি, পারস্পরিকতা, সৎ-সহযোগিতা, ইষ্টানুগ সংহতি, বড়কে ছোট করা নয়, ছোটকে বড় ক'রে তোলা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক তথা রাষ্ট্রীক কল্যাণের সমন্বয়-সাধন এক কথায় প্রয়োজনীয় যা-কিছুর সত্তাসম্বর্দ্ধনী বিন্যাস ও উন্নয়ন। এইগুলি করা চাই তা' যেখানে যেমন ক'রে সুবিধা হয়। তবে দেখতে হবে, আমরা যা' করতে চাচ্ছি, তা' যেন প্রতিক্রিয়াশীল না হয়। ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভিতর-দিয়ে কিছুই হবার নয়। মানুষকে ভয় দেখিয়ে বা বাহ্যিক শাসন ও পীড়নে স্তব্ধ ক'রে আপাততঃ দমিয়ে রাখা যায় কিন্তু তা'তে সত্যিকার প্রতিকার কিছু হয় না। সেইজন্য আদর্শানুরাগের ভিতর দিয়ে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ যা'তে হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য চাই অপরিসীম সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়—এই আমার মোক্ষা কথা।

সুরেনদা আপনি একবার বলছেন অসৎ নিরোধের কথা, আবার বলছেন, বাহ্যিক শাসন, পীড়ন বা ভীতি-প্রদর্শনে কিছু হবে না, ভালবাসা দিয়ে সব করতে হবে এ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর অসৎ নিরোধ মানে, শুধু বাইরে থেকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা নয়, তা'তে ভিতরের evil propensity (অসৎ-প্রবৃত্তি)-গুলি সাময়িক

suppressed (নিরুদ্ধ) হ'য়ে থেকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজতে থাকে। পরে আরো উগ্র, জটিল বা কুটিল রূপ নেয়। সমাজের স্থায়ী কল্যাণ হয় না তা'তে। অপরাধী কেন অপরাধ করে, সেটা বুঝতে হবে, এবং তার প্রতিকার যা'তে হয়, তা' করতে হবে। তার জন্য কোথাও গরম, কোথাও নরম হ'তে হবে—অন্তরে সহানুভূতি নিয়ে। ঘৃণা বা আক্রোশ নিয়ে মানুষের ভাল করা যাবে না। পাপের প্রতি থাকবে ঘৃণা, কিন্তু যে-ব্যক্তিকে পাপ আক্রমণ করেছে, তার প্রতি থাকবে সমবেদনা, তার ঐ ভূত ছাড়িয়ে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক ক'রে তুলতে হবে, রোগাক্রান্ত মানুষকে যেমন আমরা ক'রে থাকি। রোগের সঙ্গে আমাদের কোন আপোষ নেই এবং সেটা রোগীর স্বার্থেই। রোগকে মারতে চাই, কিন্তু রোগীকে বাঁচাতে চাই। অসৎ-নিরোধের বেলায়ও সেই মনোভাব চাই। অসৎ-নিরোধের প্রধান জিনিস হ'লো moral courage (সৎ সাহস), uncompromising attitude (আপোষরফাহীন মনোবৃত্তি) ও পরাক্রম subdued with love (ভালবাসায় সিক্ত)। আমরা যেটাকে অন্যায় অর্থাৎ ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ঐতিহ্য ও সত্তাবিরোধী ব'লে বুঝি, সেখানে যদি কাপুরুষতা, দুর্ব্বলতা বা স্বার্থবশতঃ চুপ ক'রে থাকি, সায় দিই বা প্রশ্রয় দিই, বিহিত বিক্রমে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ না করি, দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যয়ের ঘোষণা না করি, তাহ'লে অন্যায়কেই পুষ্ট ক'রে তোলা হয় সমাজে। ঐ ক্ষত দিন-দিন বেড়ে যায় সমাজে এবং তার ফলে সবাইকেই দুর্ভোগ ভুগতে হয়। অন্যায়ের প্রতিরোধ না করলে মানুষের ব্যক্তিত্বেও ক্ষতের সৃষ্টি হয়, দিন-দিন দুর্ব্বল, ভীতু ও দ্বন্দ্বপ্রবণ হ'য়ে পড়ে মানুষ। সপারিবেশ নিজের পরিশোধনের দায়—বিধিদত্ত দায় আমাদের উপর। এই দায়কে যে এড়িয়ে যায়, সে মহাদায়ে প'ড়ে যায়। ভগবানের দুয়ারে সে হয় মহা অপরাধী। তবে অসৎ বা অন্যায়ের নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নানা কৌশল আছে। সব সময় যে রুদ্রমূর্ত্তি ধরতে হবে, তার কোন মানে নেই। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন, সেখানে যদি রুদ্রমূর্ত্তি ধরতে না পার তুমি, তাহ'লে সেটাও কিন্তু তোমার দুর্ব্বলতা। পাছে লোকে কিছু বলে এই ভয়ে যদি তুমি পিছিয়ে যাও, তবে তুমি লোকনিন্দা ও আত্মগ্লানি কোনটা থেকে রেহাই পাবে না।

ক্ষিতীশদা—অসৎ-নিরোধের নানা কৌশল আছে কীরকম? সামনা-সামনি প্রতিবাদ না ক'রে তো পারা যায় না, আর প্রতিবাদ করতে গেলেই তো ঝগড়া লেগে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে না হারিয়ে, তেজবীর্য্য নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ইষ্টার্থে যদি রুখে দাঁড়ান যায়, সেখানে ঝগড়া বাধবে কেন? ঝগড়া করতে দুই পক্ষ লাগে, তুমি তো ঝগড়া করতে যাওনি, তুমি গেছ মঙ্গললিপ্সু হ'য়ে! কিন্তু তার ঝগড়ার সংঘাতে উত্তেজিত হ'য়ে নিজের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তুমি যদি

প্রতিক্রিয়াশীলতার অবান্তর উপপথে বিভ্রান্ত হও, তাহ'লে সেখানে তো তুমি হেরে গেলে। ইত্রেমি শোধরাতে গিয়ে তুমি নিজেই যদি ইত্রেমির কবলে প'ড়ে যাও, তাহ'লে ইত্রেমিরই তো জয়জয়কার হবে। তোমার কৃতিত্ব কোথায় সেখানে? তাই অসৎ-নিরোধ করতে গেলে self-control (আত্মসংযম) চাই। তেজ ও ক্রোধ কিন্তু এক জিনিস নয়। যাক সে অন্যকথা—নানা কৌশল সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা করছিলে সে-বিষয়ে আমার জীবনের কয়েকটা বাস্তব ঘটনা বলি। একজন ছিল চোর। আমি তা জানতাম। একদিন তার ও অন্য কয়েকজনের সামনে কথাচ্ছলে বললাম—কেউ অন্যায় কাজ করলে আমরা তাকে শাস্তি দি, কিন্তু আমরা কি কখনও ভাবি, সে কেন অন্যায় কাজ করে? ধর, একজন চুরি করে, চুরি করলে তাকে আমরা ধ'রে জেলে দিই, কিন্তু সে যাতে চুরি না ক'রে পারে, তার কি কোন ব্যবস্থা আমরা করি? তার হয়তো যোগ্যতা নেই, কিন্তু অযোগ্য মানুষের তো পেটে ক্ষিদে আছে, তার বাল-বাচ্চাও তো খেতে না পেলে কাঁদে, তাদেরও তো খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকতে সাধ যায়, জীবনধারণের এই সাধের মধ্যে কি অপরাধ আছে বল? এখন এই বাঁচার তাগিদে যদি সে চুরি করতে বাধ্য হয়, তা'তে তার দোষটা কী? আমরা কি তার যোগ্যতা বাড়াবার ব্যবস্থা করি, না তার বালবাচ্চা না খেয়ে থাকলে তাদের দুটো খেতে দিই? তার সুশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করব না, বিপদে-আপদে তাকে দেখব না, তাকে সৎপথে উপার্জ্জনশীল হ'তে সাহায্য করব না, অথচ জীবনধারণের জন্য গত্যন্তরবিহীন হ'য়ে যদি সে চুরি করে, তাহ'লে তাকে জেলে পুরব, এটা কি সঙ্গত কথা? ভালই হো'ক, মন্দই হো'ক, আমাদের প্রতিবেশী কেউ যদি সদ্ভাবে বাঁচার সুযোগ না পায়, সেখানে আমাদের কি করবার কিছুই নেই? দায়িত্ব কিছু নেই? ভালকে তো সবাই ভালবাসতে পারে, মন্দকে কি আমরা ভালবাসব না? মন্দ হ'য়ে কি সে পচে গেছে? মন্দ যে, সেও মন্দ থাকতে চায় না, সেও চায় ভাল হ'তে, অন্ততঃ ভাল ব'লে পরিচিত হ'তে, কিন্তু সে পথ পায় না। চোরকে যদি চোর বলা যায়, তাহ'লে কি তার ভাল লাগে? তাতেই বোঝা যায়, সে চোর হ'য়ে থাকতে চায় না। কিন্তু পারে না পোড়া পেটের জ্বালায়। আমরা যদি ঘৃণা না ক'রে সহানুভূতির সঙ্গে দেখি এদের, তাহ'লে এদের ভিতর থেকেও কত সোনার মানুষ বেরোতে পারে। এইভাবে অনেক কথা ক'লাম। তার অবস্থায় নিজেকে ফেলে যেমন ক'রে কওয়া আসে তেমন ক'রেই ক'লাম।..................

ঐদিন রাত্তির ১১।১২টার সময় ও চুপিচুপি এসে আমাকে বলল—বাবু! আজ যা' ক'লেন তখন, অমন কথা তো কা'রও মুখে শুনি না। বাবু! ঠিক কথা কইছেন আপনি, চুরি কেউ ইচ্ছে ক'রে করে না। পথ পায় না, তাই পেটের জ্বালায় চুরি করে। এই থেকে লোকটা আমার সঙ্গে ভিড়ে পড়লো।

আমি মাঝে-মাঝে বাবার পকেট থেকে নিয়ে ওকে সাহায্য করতাম। তাই দিয়ে কোনভাবে চালাত। রাত হ'লেই ওর চুরি করবার প্রবৃত্তি আসত। তখন আমার কাছে এসে ব'সে গল্প ক'রে রাত কাটিয়ে দিত। আমি এইভাবে রাতের পর রাত জেগেছি ওকে নিয়ে। পরে একদিন এসে আমার পা চেপে ধ'রে বলল —বাবু! আমার কথা কবেন না। আমি মহাপাপী, আপনি যে এমন মানুষ, আপনার বাড়ীতেও আমি চুরি করিছি। তার কিছুই নেই। আছে মাত্র কয়েকখানা পাথরের ও কাঁসার থালা। আপনি এইগুলি নেন বাবু! এই ব'লে কেঁদে ফেলল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—ওতে কি হইছে? তুই ও নিয়ে যা। আমিই দিলাম তোকে। আজন্ম চোর, চুরির অভ্যাস কি আর যায়? একদিন এসে বলল—মজুমদার বাড়ীতে ধান বেচে তিন হাজার টাকা আনে রাখিছে, সেটা আমার আনাই লাগবি। এত টাকা পালি ছাওয়াল-পাওয়াল খেয়ে বাঁচবি। আমার নিত্যি-নিত্যি চুরি করা লাগবি না। আমি ক'লাম, তাহ'লে আমিও যাব তোর সঙ্গে। সে বলে, না বাবু! আপনি যাবেন কি? সে হয় না। আমি বললাম—দেখব আমি, তুই কেমন ক'রে চুরি করিস।......... ও নিতে চায় না। আমি নাছোড়বান্দা। অগত্যা রাজী হ'লো। অন্ধকার রাত। নিজে কাল কাপড়-চোপড় পরলো, আমাকেও কাল কাপড়-চোপড় পরাল। ওর সঙ্গে তো গিছি। যেতে-যেতে বললাম তোর ঘরের দরজা ভিতর থেকে আটকান আছে তো? সে বলে—না বাবু! ঘরের দরজা আটকান থাকলে, তাড়াতাড়ি যেয়ে ঘরে ঢোকব কী ক'রে? বাইরে থেকে শিকল দিয়ে রাখিছি। আমি বললাম—তুই তো শিকল দিয়ে রাখে আইছিস। কিন্তু আজ বিকালে অমুককে (একজন জেলে) তোর বাড়ীর পাশে ঘুরতি দেখিছি। তুই চ'লে আইছিস, এই ফাঁকে যদি তোর ঘরে ঢুকে পড়ে।.....................লোকটাকে সে সন্দেহ করত, তার স্ত্রীর প্রতি কুনজর আছে ব'লে। যা' হো'ক, আমার ঐ কথা শোনার পর ও কেমন বিমনা হ'য়ে পড়ল। বলল—বাবু! আজ আর চুরি করা হবি না, মনে বল পাচ্ছি না, চলেন ফিরে যাই। ও যত ফিরে আসতে চায়, আমি তত জিদ করি—কেন যাবি না, চল! কিন্তু কিছুতেই গেল না। ঐদিন ওর কেমন জানি মাথায় ঢুকে গেল—আমি যেমন মানুষের সর্ব্বনাশ করি, মানুষও তো তেমনি আমার সর্ব্বনাশ করতে পারে। পরেও আসত আমার কাছে। মেলামেশা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে এইটে বুঝলো—চুরি চিরদারিদ্র্যের পথ, ওতে অভাব ঘোচে না অথচ স্বভাব নষ্ট হয়, যোগ্যতা নষ্ট হয়, আর চুরি করার প্রয়োজন মেটে না সারা জীবনেও। সব সময় ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়, সমাজে কোন সম্মান থাকে না, ছেলেপেলেগুলিও খারাপ হয়। এইসব বুঝে চুরি একেবারে ছেড়ে দিল। যা' পারত সদ্ভাবে তাই ক'রে কায়ক্লেশে জীবন চালাত। যখন অভাব হ'ত, আমাকে বলত, আমি সাহায্য করতাম।

পরে সে খুব বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছিল। তার কাছে যত টাকাই দেওয়া যাক না কেন, সে তার একটা পয়সাতেও হাত দিত না। আবার, চলাবলা দেখে লোক চিনত খুব। আমাকে সাবধান ক'রে দিত—বলত, দাদাঠাকুর! (পরে আমাকে দাদাঠাকুর ব'লে ডাকত) ঐ যে লোকটা দেখতিছেন, সাবধান থাকবেন, ও লোক ভাল না। প্রায়ই দেখতাম, ও যা' বলত তা' ঠিকই।..............আমাকে খুবই ভালবাসত, পরে সে অন্য মানুষ হ'য়ে গিয়েছিল। সহানুভূতির ভিতর-দিয়ে যদি না ঢুকতাম, তাহ'লে কিন্তু ওর চৌর্য্যপ্রবৃত্তির নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ বা নিরাকরণ যা'ই বল, তা' সম্ভব হ'ত না। হেম কবি যে অতো বড় মাতাল ছিল, আমি কিন্তু তাকে কোনদিন মদ ছাড়তে বলিনি। নিজে হাতে মদ খেতে দিয়েছি কত। মাঝে-মাঝে আক্ষেপ ক'রে বলত—ঠাকুর! আমি কি মদ ছাড়তে পারবো না, এমন বিশ্রী নেশা! আমি বলতাম, আপনার মদ ছাড়া লাগবে না, মদই আপনাকে ছেড়ে যাবে। জানতাম, ছাড়তে বললে আরো রোখ বেড়ে যাবে, তাই কখনও ছাড়তে বলিনি। কিন্তু পরে নাকি বলত—মদ খেলে মাথাটা কেমন হ'য়ে যায়, ঠাকুরের এমন মধুর কথা, তা' আর উপভোগ করতে পারি না, ও ছাই খাব না। শেষটা মদ আর খেত না। আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে, বৈকুণ্ঠপুরের এক মুসলমানের বাড়ীতে আমি একবার এক সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসার ভার নিই। ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আমি বললাম রোজ খবর দিতে। কিন্তু আর খবর দেওয়ার নাম নেই। আমি এদিকে দুশ্চিন্তায় অস্থির। ভাল ক'রে খেতে পারি না, শুতে পারি না। মনে-মনে খুব রাগ হ'লো লোকটার উপর। তিনদিন পর লোকটা আসলো খুশি মুখে রোগী অনেকটা ভাল! আমি যে ওকে কিভাবে বকলাম তার লেখাজোখা নেই, যা' মনে আসলো বললাম—তারই স্বার্থ ও সুবিধার দিকে চেয়ে। আমাকে তিন দিন ধ'রে ৩ যথা এত উদ্বেগে ভোগাইছে, ব'কে-ট'কে মনের কষ্ট মেটালাম। পরে যখন থামলাম, লোকটা ক'লো—ডাক্তারবাবু! আপনি আর-একটু গালান, গাল যে এত মিষ্টি লাগে, এর আগে জানিছিলাম না। আপনি যা' কইছেন, এর সিকি কথা অন্য কেউ যদি ক'তো, তার ঘাড়ডা আমি ছিঁড়ে ফেলতাম না এতক্ষণ? কিন্তু আপনার মুখের গালও কত ভাল লাগে। সত্যি আমার ঘাট হইছে। তাই অবাঞ্ছনীয় যা', তার নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের নানারকম কৌশল আছে। গোড়ায় চাই দরদ ও মঙ্গল বোধ। আবার এ জায়গায়ও আছে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বিনিয়োগ।

কাজকর্ম্ম-সম্বন্ধে কথা উঠল। সতীশদা (চৌধুরী) বললেন—কীভাবে কাজ করলে সবগুলি করণীয় ঠিকভাবে করা যায় তার কায়দা পেয়ে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব ধ্যান করতে হয়। ধ্যান মানে ইষ্টানুগ সার্থক চিন্তা। ওতে হয় brain materialization (মস্তিষ্কে বাস্তবীকরণ)। মাথায় যখন

বেড়ে পাওয়া যায়, তখন সেই অনুযায়ী কাজ করতে হয়। করণীয়গুলি co-ordinated way-তে (সমসূত্রতায়) মাথায় integrated, adjusted ও assimilated (সংহত, বিন্যস্ত ও আত্মীকৃত) না হ'লে, বাস্তব করার ভিতর-দিয়ে ওগুলি আয়ত্তে আনা যাবে না। কাজগুলি হওয়া চাই inter-fulfilling (পারস্পরিক পরিপূরণী)। একটা করতে যেয়ে যদি আর পাঁচটা করণীয় ভুলে যাই, তাহ'লে কিন্তু হবে না। সবগুলি সমানতালে বনবন ক'রে ঘোরা চাই মাথায়। করণীয়গুলি নিজের খাতায় লিখে রাখতে হয় এবং রোজই সেগুলি দেখতে হয়। কতদূর করলাম কতদূর করা হয়নি। যেখানে সাফল্য-লাভ করেছি সেখানে কি-ভাবে করেছি, যেখানে সাফল্যলাভ করতে পারিনি, সেখানে কেন পারিনি, তা' বিচার, বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয়।

বৈদেহীদা—কাজগুলি inter-fulfilling way-তে (পারস্পরিক পরিপূরণীভাবে) করতে হয় বললেন—তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ধর, তোমাদের কৃষি ও জমি চাষবাসের কথা বলা হ'চ্ছে, আবার দীক্ষার কথাও বলা হ'চ্ছে, স্বস্তিসেবকের কথাও বলা হ'চ্ছে। তোমরা যদি এমন শ্রেণীর মধ্যে দীক্ষা দাও যা'তে যুগপৎ তিনটি কাজের পক্ষেই সহায়ক হয়, তাহ'লে কিন্তু একটা কাজ করতে গিয়ে আর দু'টো কাজ বাদ পড়ে না। সব কিছুই adjustment (সমাবেশ)-এর ব্যাপার। কাজগুলি মাথায় রেখে পরস্পর একসূত্রসঙ্গত ক'রে ভেবে দেখতে হবে, একঢিলে কত পাখী মারা যায়। নইলে প্রত্যেকটা কাজের জন্য স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হ'লে খেই হারিয়ে যাবে। আর, শুধু চাষবাস ও স্বস্তিসেবকের কথা ভাবলে হবে না। তোমাদের কাজের জন্য সব রকমের লোক প্রয়োজন। জমি সংগ্রহ করতে গেলে চাই জমিদার, জোতদার, মানুষকে service (সেবা) দিতে গেলে না চাই কী? ডাক্তার চাই, উকিল চাই, ইঞ্জিনীয়ার চাই, শিল্পপতি চাই, কয়লা খনির মালিক চাই, বৈজ্ঞানিক চাই, কারিগর চাই, শিল্পী চাই, রাজমিস্ত্রী চাই, কাঠের মিস্ত্রী চাই, ছাত্র চাই, শিক্ষক চাই, অধ্যাপক চাই, ভাল চাকরে চাই, চাষীবাসী চাই, ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন লোক চাই, ব্যবসায়ী চাই, সর্ব্বোপরি ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক হবার মতো লোক চাই ভূরি-ভূরি। তাই, প্রধান কাজ হ'লো, balanced comprehensive initiation (সমতাযুক্ত ব্যাপক দীক্ষা)। এই সর্ব্বতোমুখী লোকসংগ্রহ ও লোক-পোষণার ভিতর দিয়েই সব কাজ এগিয়ে যাবে। Determined (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) হ'য়ে লাগা লাগে কেষ্টঠাকুর যেমন বলেছিলেন 'সব তুরঙ্গিণী এই প্রতিজ্ঞা আমার, ছলে বলে কৌশলে রাখিব এই পণ!' ছল, বল, কৌশল যা' কিছু খাটাতে হবে, কিন্তু ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় আত্মস্বার্থে নয়।

আমাদের কতিপয় কর্ম্মী বন্যার্ত্তদের সেবাকার্য্যে গিয়েছিলেন। সেখানে যাজনের ভাল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, বহুলোক উদ্বুদ্ধ হ'য়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, এই সংবাদ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে যত সেবাই দেওয়া যাক, আদত সেবা হ'লো তার মনের সেবা। আশা, ভরসা, উদ্দীপনায় মানুষকে যদি ভরপুর ক'রে তোলা না যায়, তার আত্মবিশ্বাস ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা যদি উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা না যায়, তাহ'লে লাখো সেবা কোন কাজে আসে না। প্রকৃত দীক্ষায় মানুষের ভিতর দক্ষতার সঞ্চার হয়, অবশ্য যদি ঠিকমত অনুশীলন করে। আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধিটা প্রবল। না-ক'রে অলৌকিকভাবে প্রত্যাশা-পূরণের ধান্ধা থেকে যদি মানুষ দীক্ষা নেয়, তাহ'লে কিন্তু কিছুই হয় না। ওতে মানুষ আরো অকর্ম্মণ্য ও অলস হ'য়ে পড়ে। তা'ছাড়া, প্রত্যাশার মাধ্যমে ইষ্ট ধরলে প্রত্যাশা হয় মুখ্য, ইষ্ট হন গৌণ। ইষ্ট যদি গৌণ হন, তাঁকে অনুসরণ করার বুদ্ধি হয় না। তাই মানুষের becoming (বৃদ্ধি)-ও হয় না। তাই দীক্ষার সময় বিশেষ ক'রে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হয় যা'তে ইষ্টের অনুসরণ ও অনুপূরণকেই মুখ্য ক'রে ধরে। তা' না হ'লে কিন্তু মঙ্গল নেই।..................যাজক নিজে যদি প্রত্যাশা-পীড়িত হয়, তাহ'লে তার যাজনে অহৈতুকী অনুরাগের উদ্দীপনা কমই সৃষ্টি হয়। অহৈতুকী অনুরাগ মানে, আমি তাঁকে ভালবাসি, কিন্তু কেন ভালবাসি তা' জানি না। ভাল না বেসে পারি না, তাই ভালবাসি। আর কোন উদ্দেশ্য নাই। 'আমার স্বভাব এই—তোমা বই জানি না।' ইষ্টে এই অহৈতুকী ভক্তি বা অনুরাগের চাইতে বড় জিনিস নেই মানুষের জীবনে। এ যার হয়, তার আপনি হ'য়ে যায়।

শরৎদা—তাই বোধ হয় বলে, 'কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ, কভু সাধ্য নয়।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্ণপ্রেম কেন, সব প্রেমই নিত্যসিদ্ধ। Libido (সুরত) হ'লো ভগবদ্দত্ত সম্পদ্, ঐ সম্পদ্ ও সম্বেগ নিয়ে যাকেই ভালবাসতে চাই তাকেই ভালবাসতে পারি। ভালবাসার এই স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে ভগবান কখনও আমাদের বঞ্চিত করেন না। তাই প্রেম আমাদের জীবনে নিত্যসিদ্ধ, এখন তাকে আমরা যেখানেই প্রধাবিত করি। তবে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

(অব্যক্তে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়, এবং দেহধারিগণ অতিকষ্টে ঐ বিষয়ে নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন।) সেইজন্য জীবন্ত সদ্‌গুরুকে যারা পায়, তাদের পক্ষে সুবিধা হয়।

নিবারণদা যা'-কিছু করতে যাওয়া যাক, প্রায় ব্যাপারেই টাকার কথা ওঠে,

মানুষের কাছে টাকার কথা বলতে ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, ঐ ব্যাপারে তুমি দুর্ব্বল আছ। মুসোলিনী তো কী বলে?

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—When money alone is concerned I am anything but a wizard, but I always deal with the spiritual essence and political necessity of things and money flows spontaneously. (শুধু অর্থের প্রয়োজন যেখানে সেখানে আমি আদৌ যাদুকর নই, কিন্তু আমি সর্ব্বদা প্রত্যেক ব্যাপারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য ও রাজনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং অর্থ আপনা থেকেই আসে)। আমার সঠিক মনে নেই, তবে কথাটা এই জাতীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই দেখ, তোমরা যদি করণীয়গুলির তাৎপর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হও ও আদর্শানুরাগে উদ্বুদ্ধ থাক, তাহ'লে অন্যকেও উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পার। তখন তারা প্রাণের আবেগেই দিতে চাইবে, দিয়ে কৃতার্থ হবে।

নিবারণদা—অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই তো ভাল না, দেবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবার ধান্ধা ও দেবার প্রয়োজন-বোধ যদি গজিয়ে দিতে পার, তবে ঐ urge (আকূতি) থেকে তার creative activity (সৃজনী কর্ম্ম-প্রতিভা) বেড়ে যাবে। ওর ভিতর-দিয়ে তার অবস্থাও ফিরে যাবে। অভাবের চিন্তায় কা'রও কোনদিন অভাব মোচন হয় না। Higher urge (উচ্চতর আকূতি) গজিয়ে দিতে হয়, তার ভিতর-দিয়েই deeper layer of energy (শক্তির গভীরতর স্তর) activised (সক্রিয়) হয়। তাই মানুষকে দিয়ে তার ততখানি উপকার করা যায় না, যতখানি উপকার করা যায় lovingly (ভালবাসার সঙ্গে) তার কাছ থেকে নিয়ে। নিতে গেলে মানুষের জন্য আবার করা লাগে। সে যা'তে ঠিক থাকে সেইজন্য তাকে পোষণ দিতে হয়। নেবার সময় নিচ্ছি কিন্তু সে যখন বেকায়দায় পড়ে, তখন যদি তাকে না দেখি, তাহ'লে কিন্তু হবে না।

গুরুদাসদা—ইষ্টের জন্য যদি নিই, সেখানে কি আবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে মানুষের কাছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট চাইলেন, তাই ইষ্টের নাম ক'রে যদি ভিক্ষা কর, তাহ'লে কিন্তু যোগ্যতা বাড়ে না। তোমার মানুষের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ থাকা চাই, তাদের জন্য এতখানি করা থাকা চাই যে তোমাকে দিতে পারলে তারা যেন কৃতার্থ হ'য়ে যায়। আর, ইষ্টার্থে নিলেও, যার কাছ থেকে যতটুকুই নেও না কেন, তাকে উপচে দেওয়ার বুদ্ধি যদি না থাকে, তাহ'লে তার দেওয়ার ক্ষমতা তো বাড়ে না। অর্থ মানে সুনিয়ন্ত্রিত শ্রম। একজন অনেকখানি খাটুনি দিল তোমাকে,

তুমি যদি কোন-না-কোনভাবে তার পূরণ না কর, যার ফলে অধিকতর উৎসাহ নিয়ে খাটতে পারে সে, তাহ'লে সে কিন্তু exhausted (অবসন্ন) হ'য়ে পড়বে। এইভাবে কাউকে হীনবল হ'তে দেওয়া মানে নিজেই হীনবল হ'য়ে পড়া। সেই হিসাবে অবশ্যই দায়িত্ব আছে। কিন্তু সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, কা'রও কোন দান, সাহায্য বা দয়ার জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা দেখাতে গিয়ে ইষ্টের ব্যাপারে যেন আপোষরফা না করা হয়। ভীষ্ম যে দুর্য্যোধনের অন্নগ্রহণ করতেন ব'লে যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগদান করলেন, শ্রীকৃষ্ণের পাশে এসে পাণ্ডবপক্ষে দাঁড়াতে পারলেন না, এটা লোকধর্ম্মের দিক দিয়ে সমর্থনীয় হ'লেও শাশ্বত ধর্ম্মাদর্শের দিক দিয়ে অনুমোদনযোগ্য নয়। সব ব্যাপারে ঐ দিকে শ্যেনদৃষ্টি রেখে চলা লাগে।..................

ঋত্বিক্‌-অধিবেশনে যেতে হবে ব'লে অনেকেই উঠে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর 'ও রে বাবা' ব'লে হঠাৎ কঁকিয়ে উঠলেন। সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে পড়লেন। পরে জানা গেল--একভাবে অনেক সময় ব'সে থাকায় তাঁর ডান পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরেছে। এখন পা নাড়তে পারছেন না। ইঙ্গিত ক'রতেই একযোগে কয়েকজনে মিলে পা-টা টেনে সোজা ক'রে দিলেন। অমরবাঞ্ছিত ঐ চরণ-কমল স্পর্শ করতে পেরে ভক্তগণ পরম-পুলকিত।

তাঁদের মধ্যে নবাগত একজন খুসীতে ডগমগ হ'য়ে বাইরে এসে বলছেন - দয়াল অন্তর্য্যামী, তা' না হ'লে কি ক'রে জানলেন যে, তাঁর চরণ-স্পর্শের জন্য আমার মন এতখানি লালায়িত হয়েছিল? আর সে সুযোগ তিনি দয়া ক'রে নিজেই দিলেন। আজ আমার জীবন ধন্য।

ও-কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না, কারণ, দাদাটি দূরে দাঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে বলছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বললেন--চরণ-পূজো মানে চলন-পূজো। ইষ্টের চলনটাকে নিজের জীবনে আয়ত্ত ক'রে ঐ চলনের প্রসারতা ও সম্বর্দ্ধনা যদি না ঘটাই বাস্তবে, তাহ'লে কিন্তু তাঁর চরণ-পূজো সার্থক হয় না। (সহাস্যে) আমরা ফাঁকতালে কাম সারতে চাই, কিন্তু বিধি বড় কঠিন বান্দা, কোন চালাকি চলে না তার কাছে।

১৬ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৪৯ (ইং ১।১।৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে, বকুলতলায় একখানি হাতলওয়ালা বেঞ্চে ব'সে আছেন উত্তরাস্য হ'য়ে। শীতের দিন, তাও শুধু কাপড়ের খোঁটটি গায়। পূব দিক দিয়ে একটু-একটু রোদ আসছে জায়গাটায়। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুটা আরাম বোধ করছেন। নীচেয় আশে-পাশে গাড়ু, গামছা, গড়গড়া, তামাক, টিকে, দেশলাই, জলের ঘটি, সুপারির

কৌটা ইত্যাদি সাজান আছে। লীলামা তামাক, জল, সুপারি ইত্যাদি দিচ্ছেন। ঋত্বিক্-অধিবেশনের সময়, তাই কাছে লোকের ভিড় লেগেই আছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) কয়েকটা ভাল ক্যালেন্ডার নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা চোখে দিয়ে একটা ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে-উল্টে ছবি দেখতে লাগলেন। পর-পর সবগুলি ক্যালেন্ডারই দেখলেন। তারপর বললেন—একটা আমার ঘরে রাখবেন, একটা বড়বৌকে দেবেন, একটা কাজলের মাকে, একটা খ্যাপাকে, একটা বড়-খোকাকে, একটা মণিকে।

কেষ্টদা বললেন—আচ্ছা।

এরপর রতিপুরের জমি-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জমি পেলে ছাড়বেন না। সৎসঙ্গীদের মধ্যে অনেকে জমি কিনতে চায়, প্রয়োজন হ'লে তাদের দিয়ে কেনাবেন। দেশে বহু জমি অনাবাদী অবস্থায় প'ড়ে আছে, কিন্তু সেগুলির পিছনে যদি কিছু খরচ করা যায়, তাহ'লে চাষের উপযুক্ত ক'রে নেওয়া যায়। হয়তো কোথাও একটু জলের ব্যবস্থা করা লাগবে, কোথাও কিছু চাষীর ব্যবস্থা করা লাগবে, কোথাও কিছু বীজধান, লাঙ্গল-গরু ইত্যাদির ব্যবস্থা করা লাগবে, যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমন ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক জমি উঠিত হ'য়ে যায়, তা'তে ফসলও বাড়ে, দেশের খাদ্য-সমস্যারও অনেকখানি সমাধান হয়, আর জমিদার ও প্রজা উভয়েই উপকৃত হয়।

কেষ্টদা—Cultivable waste land reclaim (আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি পুনরুদ্ধার) করা যে-রকম খরচসাপেক্ষ ব্যাপার, এই কাজে Government (সরকার) ও জমিদার, জোতদাররা যদি সমবেত চেষ্টায় planned way-তে (পরিকল্পিত পন্থায়) লাগে, তাহ'লেই successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে) সাত মণ তেলও পুড়বি না, রাধাও নাচবি না। যুদ্ধের বাজারে গভর্ণমেণ্টের এখন মাথার ঘায় কুকুর পাগল। আর, গভর্ণ-মেণ্টের তো লোকের দুঃখে চোখে ঘুম নেই! এই অষ্টবজ্র মিলন করে কে বলেন? তাই ও-সব প্রত্যাশা না ক'রে 'বলং বলং বাহুবলং' ক'রে নিজেরা লাগেন। এই নেংটেদের অসাধ্য কান্ড নেই। আপনারা একটা নজির দেখালে, তাই দেখে হয়তো অনেকে শিখবে।

কেষ্টদা যে-কোন বিশেষ ধরণের কাজ করতে গেলেই, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ দক্ষ কর্ম্মী প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সব বিষয়ে সবার অভিজ্ঞতা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি বুদ্ধিমান ও চতুর হয় ও সেই সঙ্গে sincerity (আন্তরিকতা) থাকে, তাহ'লে নূতন কাজের মধ্যে পড়লেও সেটা দেখেশুনে pick up ক'রে (ধ'রে) নিতে পারে। যার প্রবৃত্তিগুলি যত সুনিয়ন্ত্রিত, এক কথায় সমস্ত বৃত্তিপ্রবৃত্তি যার যতখানি

ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠান্বিত, তার কাছ থেকে ততখানি ভাল কাজ আশা করতে পারেন। ক্ষমতা এক-একজনের নিতান্ত কম থাকে না, কিন্তু মানুষ যত প্রবৃত্তি-ঝোঁকা হ'য়ে থাকে, ততই তার ক্ষমতার অপব্যয় হ'য়ে যায়। ফুটো কলসী ভ'রে জল রাখলে, ফুটো দিয়েই ক্রমাগত জল বেরিয়ে যায়, তেষ্টার সময় জল খেতে যেয়ে হয়তো দেখা যায়, জল নেই বা কমই আছে। প্রবৃত্তি-ঝোঁকা মানুষেরও তেমনি প্রবৃত্তির ফুটো দিয়ে শক্তি-সামর্থ্যের অযথা অপচয় হ'য়ে যায়, ইষ্টার্থে তা' কমই কাজে লেগে থাকে। সেইজন্য কাজ যে করবে, তার মনটা আগে ইষ্টঝোঁকা হওয়া চাই। ব্যক্তিত্ব যদি ঐ ভাবে রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে, তখন প্রবৃত্তিগুলিও তার পিছু-পিছু হাঁটে, তাদের এক-একজন এক-এক মতলবে যার-যার মতন এক-একদিকে চলতে সুরু ক'রে অন্তর্নিহিত শক্তিকে শতধা খণ্ডিত ও দুর্ব্বল ক'রে তোলে না। তাই কাজে তখন দ্রুত হয়। নদীর স্রোত এবং পালের হাওয়া দুই-ই যদি গন্তব্য-অভিমুখী হয়, তাহ'লে নৌকো কেমন তর্‌তরে ক'রে চলে দেখেননি?

কেষ্টদা—দেখেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকম হয়। তাই ইষ্টঝোঁকা মানুষ জোগাড় করতে হয়। নইলে যে যত বড় কর্ম্মবীরই হো'ক, প্রবীরের মতো পতন হ'য়ে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্ত্তে। তাই তার উপর নির্ভর করা চলে না। আর money incentive (অর্থ প্রেরণা) যাদের, তারাও এ-কাজ পারবে না। জীবনধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কারও কর্ম্ম যদি অর্থের যোগানের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহ'লে অমনতর কর্ম্মীও নির্ভরযোগ্য হয় না। কর্ম্মী যে, সে নিজের দায়িত্ব নিজে তো বহন করবেই, আরো পাঁচ-জনকে চালিয়ে নেবে। তার মানে, চরিত্রবল ও লোকসম্পদ্‌ই হবে তার প্রধান সম্পদ্। সে হবে নিরাশী, কোন প্রত্যাশা রাখবে না। আপনি দিলেন, তা'তেও খুশি, না দিলেন, তা'তেও খুশি। Allowance (ভাতা) দিয়ে মানুষের প্রত্যাশার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং effort (চেষ্টা) ক'মে গেছে। আপনি যদি allowance (ভাতা) নিতেন, তাহ'লে এই জেল্লা থাকতো না। আমার কোন দিনই allowance (ভাতা) করবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার অসুখের সময় খ্যাপা ওরা ক'রে ফেলল। আর, ওই বা কী করবে? কর্ম্মীরা পেরে ওঠে না, তাদেরও একান্ত আগ্রহ, ও-ও করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এখন আর allowance (ভাতা) না নিয়ে চলার কথা কেউ ভাবতে পারে না। যার যা' আছে, তা'তে চলে না, প্রত্যেকে ভাবে, allowance (ভাতা) আরো বাড়া দরকার। চাকা এখন ঘুরে গেছে। যা' পায়, তার উপর দাঁড়িয়ে স্বীয় চেষ্টায় যে কিছু আয় বাড়াবে, তা' আর করে না। নিজের পায় নিজে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা তো দূরে থাকুক, institution (প্রতিষ্ঠান)-কে profitable (লাভবান)

ক'রে তোলার বুদ্ধিও সবার মধ্যে দেখা যায় না। কিছু-কিছু লোকের মনে চাকুরিয়া মনোবৃত্তি ঢুকে যা'চ্ছে। নিজেদের প্রয়োজন-সম্বন্ধে সজাগ, কিন্তু যেখান থেকে অন্ন-সংস্থান হয়, সেখানকার পরিপুষ্টি ও উন্নতি সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ। এখনও অনেকে এর থেকে মুক্ত আছে, জীবনধারণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় টাকা নিলেও ভাবে, সৎসঙ্গকে কতখানি লাভবান ক'রে তোলা যায়। অধিকাংশের মনে এই ভাব থাকলেও বাঁচোয়া, কিন্তু কিছু লোক এমন চাই-ই যারা টাকার উপর দাঁড়াবে না, দাঁড়াবে মানুষের উপর।

কেষ্টদা--মুষ্টিমেয় দুই-একজন যারা আপনার এই ইচ্ছা পূরণ ক'রে চলতে চায়, তাদেরই তো অস্তিত্ব বিপন্ন হবার উপক্রম হয়। কারণ, এই প্রচেষ্টাকে তো মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। ভাবে, এটা অপারগতার লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর--মানুষের উপর দাঁড়ান যে কতখানি পারগতা ও মর্য্যাদার ব্যাপার, তা' লোকে পরে বুঝবে। মানুষের জন্য অনেকখানি করা না থাকলে, এবং inferiority (হীনম্মন্যতা) থেকে খানিকটা মুক্ত না হ'লে, মানুষ এটা পারে না। তবে এ-কথা ঠিক জানবেন মানুষের যত wealth (সম্পদ্) থাক, পারস্পরিকতার মতো wealth (সম্পদ্) কমই আছে। আপনারা লক্ষ-লক্ষ লোক আজ একানুপ্রাণনায় একটা বিরাট cluster (গুচ্ছ) form (গঠন) করেছেন; আপনাদের মধ্যে interchange of service (সেবাবিনিময়) ও mutual fulfilling urge (পারস্পরিক পরিপূরণী আকূতি) যদি গজিয়ে তুলতে পারেন, তাহ'লে তার ফলে কী যে হ'তে পারে, তা' কি কল্পনা করতে পারেন? এইটে expand (বিস্তার) ক'রে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ক'রে ফেলতে পারেন। ইষ্টানুগ বৈশিষ্ট্যপালী পারস্পরিক সক্রিয় সেবা ও প্রীতির ভিতর-দিয়ে না হ'তে পারে এমন কিছু নেই।

কেষ্টদা--এগুলি ক'রে তোলাই বড় কথা।

এরপর কেষ্টদা অন্য কাজে গেলেন।

সুধীরদা (সাহা) জিজ্ঞাসা করলেন--একটা মানুষের কাছে যাজন করতে গেলে প্রধানতঃ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর--প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখতে হবে তার মানসিক ভাবভূমির উপর। তার তৎকালীন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যদি বোধ না থাকে, তাহ'লে কিন্তু কতকগুলি নীতি বা তত্ত্বকথায় কাজ হবে না। মনের অবস্থা বুঝে কথা বললে মানুষ সাধারণতঃ টক ক'রে interested (অনুরাগী) হ'য়ে ওঠে। শুধু যাজনের বেলায় নয়, মানুষ নিয়ে চলতে সব সময় এদিকে লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন--রাসবিহারী ওরা লাঠি আনতে গেছে কবে?

বীরেনদা--দিন চারেক হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা আজকাল সবাই ভদ্রলোক হ'য়ে গেছি। একটা কুকুর এসে যদি তাড়া করে, তাও জানি না, কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে। প্রত্যেকে যা'তে লাঠি ব্যবহার করে এবং বিপদে-আপদে আত্মরক্ষা করতে শেখে, তার অনুশীলন প্রয়োজন। সব ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকব, নিজে কিছু করতে পারব না, এই অবস্থাটা ভাল না। ওতে অনেক faculty (ক্ষমতা) submerged (নিমজ্জিত) হ'য়ে থাকে। সেগুলির জাগরণ আর হয় না। ব্যক্তিত্বও খাটো হ'য়ে থাকে। এত মানুষ এখানে আসে কিন্তু সজাগ ও চৌকস মানুষ খুব কম দেখি। এটা হয়, তার কারণ, বহু healthy faculty (জীবনীয় ক্ষমতা)-র কোন play (অনুশীলন) হয় না তাদের জীবনে। বংশানুক্রমে এইভাবে চললে অনেক সদ্‌গুণের atrophy (ক্ষয়) হ'তে থাকে। তাই এমন পরিবেশ ও শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর ফেলা লাগে মানুষকে যা'তে প্রত্যেকে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব চৌকস হ'য়ে ওঠে। ঋত্বিক্‌-দেরও চাই well-adjusted varied interest and experience (সুনিয়ন্ত্রিত বহু বিষয়ক অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা) তা'তে মানুষের পরিচালনা ও সেবা এই দুই কাজেই সুবিধা হবে তাদের।

একটি ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—ঠাকুর! আমার মস্ত দোষ—আলসেমি কিছুতে ত্যাগ করতে পারি না। কোন কাজ করব মনে করলেও সে কাজে হাত দিতে পারি না তাড়াতাড়ি, আর হাত দিলেও কাজে এত গড়িমসি করি যে সহজে হ'য়ে ওঠে না। তাই কোন দায়িত্ব নিয়ে বজায় রাখতে পারি না। মানুষের কাছে কথা শুনতে হয়। জিনিসটা খারাপ তা' বুঝি, কিন্তু এড়াতে পারি না। মনে-মনে অনেক সংকল্প করি, কিন্তু ঠিক রাখতে পারি না। এ অবস্থায় আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর তুই সকালে উঠিস ক'টার সময়?

উক্ত ভাই সাতটার পর।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোর পাঁচটায় ওঠার অভ্যাস কর। তখন ঘুম যদি না ভাঙ্গে, বাড়ীতে আর কাউকে ডেকে দিতে বলবি। আর, ডাকলে উঠে পড়বিই। আর, ব'লে দিবি 'আমি যদি না উঠতে চাই, আমাকে জোর ক'রে উঠিয়ে দেবে।' এইভাবে সকালে ওঠার অভ্যাস কর্। সকালে উঠে নিজের বিছানাটা নিজে তুলবি, নিজের ঘরখানা নিজে ঝাড় দিবি, মাকে এক কলসি জল এনে দিবি, এইরকম সংসারের আরো পাঁচটা কাজ করবি, যা'তে শরীর খাটাতে হয়। তাছাড়া দিনের মধ্যে ২।৩ ঘণ্টা কোন কর্ম্মঠ লোকের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে একযোগে কাজ করবি। এটা যদি বেগারখাটা হিসাবে খাটিস, তা'ও ভাল। আর তুই ইষ্টভৃতি করিস তো?

উক্ত ভাই হাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কীভাবে করিস?

উক্ত ভাই—বাড়ী থেকে নিয়ে করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-ভাবে করবি না এখন থেকে। নিজে কিছু-না-কিছু উপায় ক'রে, তা' দিয়ে করবি। যেদিন তা' পারবি না, সেদিন অগত্যা ভিক্ষা ক'রে করবি, কিন্তু বাড়ী থেকে নিবি না। বুঝিস না তো, এক-একটা দোষ পুষে রাখায় কত ক্ষতি! ওতে জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হ'য়ে যেতে পারে। বিপদের সময় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হয়তো দ্রুত পালিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু তোমার যেমন অভ্যাস, তুমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার প্রয়োজন বুঝলেও তো তা' পারবা না। ঢিলেমি ক'রে জায়গায় ব'সেই হয়তো বিপদ ডেকে আনবা মাথার উপর। কত রকমের সংকট মানুষের জীবনে আসে, তার কি ঠিক আছে? কিন্তু জীবনীয় সদ্‌গুণগুলি যদি বজায় থাকে, তবে তার সাহায্যে মানুষ সব সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ঐ সদ্‌গুণগুলি যদি আগে থেকে অভ্যাস ও চরিত্রগত না থাকে এবং তার উল্টো চলনে মানুষ যদি অভ্যস্ত হয়, তবে প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করলেও অভ্যস্ত চলন বদলাতে পারে না। বদভ্যাসগুলি ভূতের মতো ঠেসে ধ'রে ঘাড় মটকে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ভঙ্গীতে কথাগুলি যেন বাস্তব চিত্র নিয়ে ফুটে উঠল এবং ভাইটিও শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেইটে লক্ষ্য ক'রে বললেন—এখন থেকে হুঁশিয়ার যদি হও, ভাবনার কিছু নেই। যেমন বললাম ঐভাবে চলতে শুরু করে দাও—এই এখন থেকেই।

ভাইটি বললেন—আচ্ছা।

পূর্ণদা (বিশ্বাস)—বহু পরিবারের ইতিহাস যা শুনি তা' ভয়াবহ। পরিবারের কর্ত্তা যিনি, যাঁর অসাধারণ কষ্ট, শ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের ফলে সংসারটা দাঁড়িয়েছে, প্রায় বাড়ীতে দেখা যায়, তাঁর বৃদ্ধবয়সে বাড়ীর অন্য সবাই তাঁর যথোচিত সমাদর কমই ক'রে থাকেন। একটা সাধারণ কৃতজ্ঞতাবোধ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। নানাভাবে তাঁরা মর্ম্মপীড়া পান সংসারের লোকের কাছ থেকে। অনেকে আমার কাছে বলতে-বলতে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে ফেলেন। বয়োবৃদ্ধ কর্ত্তাব্যক্তির অবজ্ঞা যেন সমাজে সংক্রামক ব্যাধির মতো পেয়ে বসেছে। আমি দীক্ষিত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত তো বহু পরিবারে যেয়ে থাকি। কোথাও এর অভাব নেই। তবে সৎসঙ্গী পরিবারগুলিতে সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধের প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায় এই একটা শুভ লক্ষণ, কিন্তু তা'ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত না, আপনার কথা স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধার মকশ করার চেষ্টা করে মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর মকশ যে করে, এইটুকুও ভাল।..................গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ছাড়া কেউ কি কখনও বড় হ'তে পারে? বয়োবৃদ্ধ যাঁরা, তাঁদের

উপযুক্ত সেবাযত্ন করা, শ্রদ্ধা করা একান্ত দরকার। পিতামাতা বা তত্তুল্য যাঁরা, তাঁরা হলেন জীবন্ত গৃহদেবতা। এই জীবন্ত দেবতার পূজায় যদি ত্রুটি হয়, তাহ'লে অন্য দেবতার প্রসাদ লাভ করা যায় না। ইষ্টের প্রসন্নতা উৎপাদন করতে চায় যে, তার উচিত—ইষ্টানুগ সেবা ও সদ্ব্যবহারে পিতা-মাতাকেও প্রসন্ন করতে চেষ্টা করা। অনেক বাড়ীতে আগে ছেলেয় দীক্ষা নেয়, দীক্ষা নেবার পর তার চাল-চলন দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পরে বাপ-মা দীক্ষা নেন। এরকমটা হয়। কা'রও জীবনে সত্যিকার শ্রদ্ধাভক্তির জাগরণ হ'লে, তার রকমই বদলে যায়। তাকে দেখে যে কত লোকের উপকার হয়, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। তাই পিতামাতারও তাঁদের গুরুজনের প্রতি ও শ্রেয়ের প্রতি সক্রিয় শ্রদ্ধা নিয়ে চলা চাই। ঐ দৃষ্টান্ত যদি না দেখে পিতামাতার জীবনে, তাহ'লে তাঁদের কাছ থেকে যত যা'ই পাক না কেন, তাঁরা যত যা'ই করুন না কেন ছেলেপেলের জন্য, শ্রেয়ানুরাগের বীজ কিন্তু উপ্ত হয় না তাদের অন্তরে। পিতামাতা যেমন বিলোল স্নেহ নিয়ে তাদের পানে ছুটেছিলেন, তাঁদের সেই দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হ'য়ে তারাও পিতামাতাকে উপেক্ষা ক'রে স্নেহাস্পদদের পিছনে-পিছনে ছুটে বেড়ায়। ঐ একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে পুরুষ-পরম্পরায়। তাই আমার মনে হয়, স্নেহ খুব ভাল জিনিস হ'লেও, স্নেহের সঙ্গে যদি শ্রেয়শ্রদ্ধার অনুশীলন না থাকে, তাহ'লে তা' কা'রও কোন প্রকৃত উপকারে আসে না।

প্রফুল্ল—ঠাকুর! ক্ষিতিনাথবাবু (ঘোষ) 'জীবন ও মরণ' ব'লে একটা বই লিখেছেন। সেই বইয়ের ভিতর তিনি আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত অনন্ত জীব ও জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সত্যিই কি এ-সবের অস্তিত্ব আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকা বিচিত্র কী? আমরা আর কতটুকু জানি? তবে যা'ই থাক, তার সঙ্গে বাস্তব যোগসূত্র রচিত হ'তে পারে কীভাবে তাই দেখতে হবে। সেটা এমন ধরণের হওয়া চাই, যা'তে মানুষের সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না থাকে। তোমার একটা subjective experience (আত্মগত অভিজ্ঞতা) যদি আর-একজনের উপর চাপাতে চাও, তাহ'লে সে তা' গ্রহণ করতেও পারে আবার না-ও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঐ জিনিসটারই যদি একটা সর্ব্বজনবোধগ্রাহ্য রূপ দিতে পার, তাহ'লে আর মানুষের সংশয় থাকে না। সেইজন্য আমি গোপালকে ব'লেছিলাম এই বিষয়ে গবেষণা করতে। আর সুশীলদা যে-সব জাতিস্মরের খবর এনেছে, সেগুলি খুব আশাপ্রদ ব্যাপার। স্মৃতিবাহী চেতনালাভের কৌশলটা যদি মানুষের হাতে এসে যায়, তাহ'লে মানুষকে আর পায় কে? (মহাস্ফূর্ত্তিসহকারে হাতে তুড়ি দিয়ে) তখন তো মার দিয়া কেল্লা!